উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

দূরশিক্ষা অধিকার

স্নাতকোত্তর বাংলা

চতুর্থ সেমেস্টার

আবশ্যিক পত্র – ৪০২

রবীন্দ্রনাথের গদ্যসাহিত্য

পর্যায় – ক

UNIVERSITY OF NORTH BENGAL

Postal Address:

The Registrar,

University of North Bengal,

Raja Rammohunpur,

P.O.-N.B.U., Dist-Darjeeling,

West Bengal, Pin-734013,

India.

Phone: (O) +91 0353-2776331/2699008

Fax: (0353) 2776313, 2699001

Email: regnbu@sancharnet.in ; regnbu@nbu.ac.in

Wesbsite: www.nbu.ac.in

First Published in 2019

All rights reserved. No Part of this book may be reproduced or transmitted, in any form or by any means, without permission in writing from University of North Bengal. Any person who does any unauthorised act in relation to this book may be liable to criminal prosecution and civil claims for damages.

This book is meant for educational and learning purpose. The authors of the book has/have taken all reasonable care to ensure that the contents of the book do not violate any existing copyright or other intellectual property rights of any person in any manner whatsoever. In the even the Authors has/ have been unable to track any source and if any copyright has been inadvertently infringed, please notify the publisher in writing for corrective action.

FOREWORD

The Self Learning Material (SLM) is written with the aim of providing simple and organized study content to all the learners. The SLMs are prepared on the framework of being mutually cohesive, internally consistent and structured as per the university's syllabi. It is a humble attempt to give glimpses of the various approaches and dimensions to the topic of study and to kindle the learner's interest to the subject

We have tried to put together information from various sources into this book that has been written in an engaging style with interesting and relevant examples. It introduces you to the insights of subject concepts and theories and presents them in a way that is easy to understand and comprehend.

We always believe in continuous improvement and would periodically update the content in the very interest of the learners. It may be added that despite enormous efforts and coordination, there is every possibility for some omission or inadequacy in few areas or topics, which would definitely be rectified in future.

We hope you enjoy learning from this book and the experience truly enrich your learning and help you to advance in your career and future endeavours.

পর্যায়ভিত্তিক আলোচনা

পর্যায় – ক

একক ১ - চোখের বালি : দেশ-কাল প্রেক্ষিত

একক ২ - চোখের বালি : লেখক ও গ্রন্থপরিচয়

একক ৩ - চোখের বালি : সার্বিক বিশ্লেষণ

একক ৪ - চোখের বালি : আঙ্গিক বিচার

একক ৫ - জীবনস্মৃতি : রচনা প্রসঙ্গে নানা কথা

একক ৬ - রবীন্দ্র জীবন পর্বের নানান অভিজ্ঞতার পরিচয়

একক ৭ - জীবনস্মৃতি : অভিনব ভাবনায় জীবনকথা

পর্যায় – খ

একক ৮ - রক্তকরবী : দেশ-কাল প্রেক্ষিত

একক ৯ - রক্তকরবী : লেখক ও গ্রন্থপরিচয়

একক ১০ - রক্তকরবী : সার্বিক পর্যালোচনা

একক ১১ - রক্তকরবী : আঙ্গিক বিচার

একক ১২ - রবীন্দ্র প্রবন্ধ : শকুন্তলা ও রাজসিংহ

একক ১৩ - রবীন্দ্র প্রবন্ধ : কালান্তর ও সভ্যতার সংকট

একক ১৪ - রবীন্দ্র প্রবন্ধ : মানুষের ধর্ম-১ ও অন্তর বাহির

আবশ্যিকপত্র – ৪০২ রবীন্দ্রনাথের গদ্যসাহিত্য

একক ১

চোখের বালি : দেশ-কাল প্রেক্ষিত - উদ্দেশ্য , ঊনবিংশ-বিংশ শতকের সন্ধিক্ষণে রাজনৈতিক পরিস্থিতি , ঊনবিংশ-বিংশ শতকের সন্ধিক্ষণে সামাজিক পরিস্থিতি , ঊনবিংশ-বিংশ শতকের সন্ধিক্ষণে সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি।

একক ২

চোখের বালি : লেখক ও গ্রন্থপরিচয়- চোখের বালি উপন্যাসের প্রাসঙ্গিক তথ্য , চোখের বালি উপন্যাসের কাহিনী পরিচয় , চোখের বালি উপন্যাস প্রসঙ্গে সমকালীন প্রতিক্রিয়া , চোখের বালি উপন্যাস প্রসঙ্গে সমালোচকদের অভিমত।

একক ৩

চোখের বালি : সার্বিক বিশ্লেষণ - নামকরণ প্রসঙ্গ , চোখের বালির শ্রেণি বিচার , চরিত্র বিচার প্রসঙ্গ , চোখের বালির মনস্তাত্ত্বিকতা , চোখের বালির ট্র্যাজেডি ভাবনা।

একক ৪

চোখের বালি : আঙ্গিক বিচার – উদ্দেশ্য , চোখের বালি : প্লট নির্মাণ , চোখের বালি : ভাষা প্রসঙ্গ , চোখের বালি : উপমা ও চিত্রকল্পের প্রয়োগ

একক ৫

জীবনস্মৃতি : রচনা প্রসঙ্গে নানা কথা - জীবনস্মৃতি রচনার উৎসের অনুসন্ধান , জীবনস্মৃতির খসড়া ও পাণ্ডুলিপি প্রসঙ্গ ,

বিভিন্ন চিঠিপত্রে জীবনস্মৃতি রচনার প্রসঙ্গ , জীবনস্মৃতির ভূমিকা প্রসঙ্গ , জীবনস্মৃতি প্রকাশনা প্রসঙ্গ

একক ৬

রবীন্দ্র জীবন পর্বের নানান অভিজ্ঞতার পরিচয় - শিক্ষাজীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা , বাল্য জীবনের অভিজ্ঞতা , পিতার সান্নিধ্য ও বাহির যাত্রা , কাব্যচর্চার সূচনা , বিভিন্ন গ্রন্থ প্রকাশ , সংগীত চর্চার সূচনা , স্বাদেশিকতা প্রসঙ্গ

একক ৭

জীবনস্মৃতি : অভিনব ভাবনায় জীবনকথা - জীবনস্মৃতি : ভাবনার অভিনবত্ব , ভাষার কারুকার্যতা , শৈলী ভাবনায় অভিনবত্ব।

একক: ১। চোখের বালি : দেশ-কাল প্রেক্ষিত

বিন্যাসক্রম

১.১। উদ্দেশ্য

১.২। ঊনবিংশ-বিংশ শতকের সন্ধিক্ষণে রাজনৈতিক পরিস্থিতি

১.৩। ঊনবিংশ-বিংশ শতকের সন্ধিক্ষণে সামাজিক পরিস্থিতি

১.৪। ঊনবিংশ-বিংশ শতকের সন্ধিক্ষণে সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি

১.৫। অনুশীলনী

১.৬। গ্রন্থপঞ্জি

১.১। উদ্দেশ্য

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা সাহিত্যে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। আর তা পাকাপাকি ভাবে সূচিত হল ১৮৬৫ সালে প্রকাশিত 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসের প্রকাশ-সূত্রে। এরপর থেকে বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' (১৮৭২) পত্রিকা সম্পাদনার পাশাপাশি নিয়মিত ভাবে উপন্যাস রচনা এবং প্রকাশ করেছেন। বঙ্কিম-পর্বের মধ্যেই সাহিত্য সম্ভার নিয়ে বাংলা সাহিত্যের প্রাঙ্গণে হাজির হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কবিতা চর্চার পাশাপাশি সাহিত্যের অন্যান্য শাখাতেও অনায়াস যাতায়াত দেখা গেল তাঁর। তাই কাব্যনাট্য, গীতিনাট্য-এর পাশাপাশি সম্ভবত বঙ্কিমচন্দ্রের পথ অনুসরণ করেই ঐতিহাসিক কাহিনি বৃত্ত অবলম্বণ করে উপন্যাস রচনা শুরু করলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রদর্শিত পথ বলার কারণ রবীন্দ্রনাথ প্রথম নরেন্দ্র - করুণার প্রেম কাহিনি নিয়ে 'করুণা' নামক একখানি সামাজিক উপন্যাস রচনা শুরু করেছিলেন। কিন্তু কিছুকাল ধারাবাহিক রচনা ও প্রকাশের পর অসমাপ্ত রেখেই 'করুণা' উপন্যাসটি প্রকাশ বন্ধ করে দেন এবং

উপন্যাসটি আর কোনদিনই সমাপ্ত করেননি। এরপর কিছুদিন উপন্যাস রচনায় হাত দেননি কবি রবীন্দ্রনাথ। আবার উপন্যাস যখন রচনা শুরু করলেন তখন আর সামাজিক কাহিনি বৃত্ত নয়, ইতিহাসের কাহিনি অবলম্বন করলেন যার ফল স্বরূপ - বারভূঁইঞার অন্যতম প্রতাপাদিত্যের কাহিনি অবলম্বনে ১৮৮৩ সালে প্রকাশিত হল 'বৌ ঠাকুরাণীর হাট' এবং ত্রিপুরার রাজ-পরিবারের কাহিনি নিয়ে ১৮৮৭ সালে প্রকাশিত হল 'রাজর্ষি' উপন্যাস।

দুখানি উপন্যাস রচনার পর রবীন্দ্রনাথ একান্ত ভাবেই কাব্যচর্চার দিকে মন দেন। তবে কবিতার পাশাপাশি এই সময়কালে তিনি ছোটগল্প রচনায় অধিক আগ্রহী হয়ে পড়েন। 'হিতবাদী' পত্রিকায় নিয়মিতভাবে গল্প প্রকাশ করেন। আর শতাব্দীর শেষ হয়ে গেলে রবীন্দ্রনাথকে পুনরায় নতুন ভূমিকায় দেখা গেল। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' নতুন রূপে, নতুন কলেবরে রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনায় প্রকাশিত হল। আর এই পত্রিকাতেই প্রকাশিত হল রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' উপন্যাস। আলোচ্য এককের মূল উদ্দেশ্য হল 'চোখের বালি' রচনাপর্বে বাংলাদেশ ও বাংলা সাহিত্যে অবস্থান সবদিক থেকে কেমন ছিল।

১.২। ঊনবিংশ-বিংশ শতকের সন্ধিক্ষণে রাজনৈতিক পরিস্থিতি

১৮৮৫ সালের শেষপ্রান্তে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন বসে বোম্বাই শহরে। এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন কলকাতার খ্যাতনামা ব্যারিস্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । আর এই অধিবেশনেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় প্রতি বছর কোন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির সভাপতিত্বে ভারতের কোন না কোন শহরে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন আহবান করা হবে। লক্ষ করলে দেখা যায়, এই অধিবেশনে বাংলার প্রতিনিধি সংখ্যা খুব কম ছিল। কারণ এই সময় কলকাতায় জাতীয় সম্মেলনের অধিবেশন চলছিল। উমেশচন্দ্র তাঁর ভাষণে কংগ্রেসের চারটি মুখ্য উদ্দেশ্যের কথা ঘোষণা করেছিলেন - প্রথমত, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে যাঁরা দেশ সেবায় ব্রতী, তাঁদের মধ্যে পরিচয় ও সৌহাদ্যের মাধ্যমে জাতি, ধর্ম, প্রাদেশিকতার সংকীর্ণতা দূর করে জাতীয় ঐক্যের পথ প্রশস্ত করা;

দ্বিতীয়ত, শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে আলাপ-আলোচনার দ্বারা সামাজিক সংস্কার ও অন্যান্য সমস্যার সমাধানের উপায় নির্ধারণ এবং তৃতীয়ত, রাজনৈতিক অগ্রগতির জন্য আগামী বছরের কর্মসূচি গ্রহণ। ব্রিটিশ সরকার এবং ইংল্যাণ্ডের জনমত ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অনুকূল ছিল না। তাই ইংল্যাণ্ডের 'টাইমস্' পত্রিকার মন্তব্য ছিল- "কংগ্রেসের দাবি পূরণের অর্থ ভারতকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দিয়ে আমাদের দেশে ফিরে আসা। কিন্তু কয়েকজন বাক্য বাগীশের কথায় আমরা ভারত ছাড়ব না।"

অন্যদিকে ভারতীয় ভাবনা অনুসারে 'ইন্ডিয়ান মিরর' পত্রিকায় মত প্রকাশিত হয় – ভারতীয় জনগণের জাতীয় অগ্রতির ইতিহাসে ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের ২৮শে ডিসেম্বর তারিখটি স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে; ভারতের ভবিষ্যৎ সংসদের (parliament) বীজ এই অধিবেশনেই প্রবিষ্ট হয়; এই তারিখ থেকে আমরা ভারতের ভবিষ্যৎ জাতীয় অগ্রগতির সূচনা বলে চিহিত করতে পারি। 'হিন্দু প্রেট্রিয়ট' কাগজেও জাতীয় কংগ্রেসের মাধ্যমে ভারতের জাতীয় ঐক্যবন্ধনের সম্ভবনা উজ্জ্বল বলে অভিহিত করা হয়। ১৮৮৬ সালে মাদ্রাজে কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন বসে। এখানে হিউম সাহেবের অনুরোধে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সদলবলে জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করেন। এইভাবে অধিবেশনের মাধ্যমে কংগ্রেসের কার্যকলাপে অগ্রগতি ঘটে। ১৯০৫ সাল পর্যন্ত কংগ্রেসের কার্যকলাপ দুটি প্রধান পদ্ধতি অবলম্বনে পরিচালিত হয় তা হল -

১) সরকারের কার্যকলাপ ও প্রচলিত নীতির সমালোচনা করা এবং

২) প্রয়োজনীয় সংস্কারের দাবি উত্থাপন করা।

১৮৮৫ -১৮৮৭ সময় কালের মধ্যে জাতীয় কংগ্রেসে সাধারণ মানুষের সংযোগ ছিল-না। উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মচারী, ধনী ব্যবসায়ী ও জমিদার কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন। ১৮৯৬ সালের নাগপুরে ভূবুক্ষ মানুষের আক্রমণের লক্ষ্য ছিল জমিদার ও মহাজন যেখানে কংগ্রেসের নেতা। তবে ১৮৮৫ থেকে ১৯০৫ সালের জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্ব মূলত নরমপন্থী নামে কথিত। এই নরমপন্থী মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না অনেক কংগ্রেস নেতা। যে কারণে বিপিনচন্দ্র পাল অভিমত প্রকাশ করেন - কংগ্রেস পরিচালিত নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে ভারতীয়দের নৈতিক ও রাজনৈতিক উন্নয়ণ সম্ভব নয়। তবে কংগ্রেস

নেতৃবর্গ সরকারের কাছে তাদের বিভিন্ন দাবিদাওয়া আদায় করতে ব্যর্থ হলেও ১৮৮৫ থেকে ১৯০৫ সালের মধ্যে ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জাতীয় চেতনা সঞ্চারে কংগ্রেসের ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না।

ভারতীয় রাজনীতি 'আর্যবান্ধব সমাজ' প্রতিষ্ঠা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কেননা বিপ্লবী আদর্শ প্রচারের কেন্দ্র হিসেবে উক্ত বিপ্লবী সংস্থাটি গঠিত হয়। এই সমাজের লক্ষ্য ছিল সশস্ত্র বিপ্লবের দ্বারা ব্রিটিশকে বিতাড়িত করা। তবে প্রথমদিকে ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে আর্যবান্ধব সমাজ ভারতীয় সেনাদের মধ্যে বিপ্লবী আদর্শ প্রচারে ব্যর্থ হয়। তবে অনতিকালের মধ্যেই পাঞ্জাবের নেতা লালা লাজপৎ রাই ও পরমানন্দের সঙ্গে আর্যবান্ধব-সমাজের ঘনিষ্ট যোগাযোগ স্থাপিত হয়। আর ১৯০১ সালের পর আর্যবান্ধব-সমাজের সঙ্গে বাংলার বিপ্লবীদের যোগাযোগ গড়ে ওঠে। এই ভাবে সর্বভারতীয় রাজনীতিতে আর্যবান্ধব-সমাজের সূত্র মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব ও বাংলার বিপ্লবীদের পারস্পরিক যোগাযোগ সূত্র কার্যকরী হয়। এরপূর্বে বাংলায় প্রথম মিত্র ওরফে পি. মিত্রের তত্বাবধানে সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের প্রয়াস দেখা যায়। ১৯০১ সালের পূর্বে বাংলায় বার বার বিপ্লবী সংস্থা গঠনে ব্যর্থতা দেখা যায়। এর অল্পকার পরেই সতীশচন্দ্র বসু কর্তৃক স্থাপিত 'অনুশীলন সমিতি' বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে বিশেষ ভাবে জড়িত। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য ‘অনুশীলন সমিতি' নামটি বঙ্কিমচন্দ্রের ‘আনন্দমঠ’ উপন্যাস থেকে গৃহিত হয়েছে।

সতীশচন্দ্র বসু ও অন্যান্যদের অনুরোধে ব্যারিস্টার পি. মিত্র (প্রমথ মিত্র) অনুশীলন সমিতির সভাপতি ও সর্বাধিনায়ক হিসেবে নিযুক্ত হন। ‘অনুশীলন সমিতি’ বাংলার যুবসম্প্রদায়কে ব্যায়াম চর্চার প্রশিক্ষণের পাশাপাশি প্রকাশ্যে ও গোপনে বিপ্লবী আদর্শ প্রচারে ব্রতী হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ বাংলার যুবসম্প্রদায়ের মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। সরকারী কাগজপত্রে ভারতের বিপ্লবী-আন্দোলনকে সন্ত্রাসবাদী ও অরাজকবাদী বলে অভিহিত করা হয়েছে। কিন্তু বিপ্লবের মধ্যে কিছু সন্ত্রাসবাদ থাকলেও বিপ্লবীরা কখনো অরাজকতার পক্ষপাতী ছিল না। এ সময়ে বাংলার বিপ্লবী অন্দোলনের সঙ্গে অরবিন্দ ঘোষের সংযোগ ঘটে। তিনিই বরোদা থেকে যতীন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় নামে এক তরুণ বিপ্লবীকে বাংলায় প্রেরণ করেন। যতীন্দ্রনাথ অনুশীলন সমিতির সঙ্গে

যোগাযোগসূত্রকে প্রসারিত করেণ। ১৯০১ সাল থেকে যতীন্দ্রনাথ এবং অরবিন্দ ঘোষের ভাই বারীন্দ্র ঘোষ অনুশীলন সমিতির কলকাতা সহ বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন শাখা স্থাপন করে বিপ্লবের পথ প্রশস্ত করেন। তবে ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই আন্দোলন তেমন জোরদার হয়ে ওঠেনি। এ সময় সাহিত্যের মধ্য দিয়ে বাংলার তরুণ বিপ্লবীদের উৎসাহিত করার জন্য বারীন্দ্র ঘোষ ১৯০৫ -এ 'ভবানী মন্দির' নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এ ভাবেই বঙ্গভঙ্গের পূর্বে বাংলার বুকে বিপ্লবী আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল যা পরবর্তীকালে পূর্ণাঙ্গ স্বদেশী আন্দোলন রূপে প্রকাশিত হয়েছে।

১.৩। ঊনবিংশ-বিংশ শতকের সন্ধিক্ষণে সামাজিক পরিস্থিতি

১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে সিরাজদৌল্লার পরাজয়ের সঙ্গে পলাশির প্রান্তরেই নবাবি আমলের অবসান ঘটেছে এবং বাংলা সমাজ ইতিহাস পরিবর্তনের ইঙ্গিত ধ্বনিত হয়েছে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের সঙ্গেই। আর বাংলাদেশের বাংলা সমাজ ব্যবস্থার চেহারাটা অনেকখানি পালটে গেল ১৭১৩ এ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর। শহর কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকা জুড়ে নতুন একটা মধ্যবিত্ত সমাজ গড়ে উঠল। এতে দেখা গেল নতুন গজিয়ে ওঠা জমিদার, ইংরেজ বণিকদের বেনিয়ান মুৎসুদ্দি-দালাল ও ফড়েদের। তাই নবাবি আমলের অবসানের পর কলকাতা শহরকে কেন্দ্র করে যে নতুন সমাজ গড়ে উঠতে আরম্ভ করেছিল তা রুচি ও সংস্কৃতির দিক থেকে ছিল আনেক মোটা দাগের। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁর 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' গ্রন্থে নতুন গড়ে ওঠা সমাজের একটা সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন।

বাংলা উপন্যাস রচনার সূচনালগ্নে বঙ্কিমচন্দ্র ঐতিহাসিক কাহিনি অবলম্বন করলেও অল্পকালের মধ্যেই সামাজিক কাহিনি অবলম্বন করেছেন। তাঁর সমকালের বাংলাদেশের সমাজ ও পরিবারের জীবন চিত্রের উপলব্ধি করা যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগের সামাজিক ইতিহাস বিচার ও বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় সে সময়ের বাঙালির প্রগাতিশীল চিন্তাভাবনা ও রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণের পরিচয় মেলে। বঙ্কিমচন্দ্র অনেকটা সমাজ গঠনের

দায়িত্ব নিয়েই সাহিত্যচচায় ব্রতী হয়েছিলেন। তাঁর তরুণ বয়সের অন্তর জিজ্ঞাসা ‘এ জীবন লইয়া কি করিব?’ -এর উত্তর খুঁজতে সারাজীবন কেটে গেছে। বঙ্কিম যুগের অবসানে সূচিত হয়েছে রবীন্দ্রযুগ। আর তখন বাংলাদেশের সামাজিক পরিস্থিতিরও অনেক বদল ঘটতে দেখা গেছে। গ্রাম বাংলায় শিক্ষিত সাধারণ মানুধ শহরমুখী হয়ে উঠেছে একান্তভাবে। তাই দেখ যায় শহর কলকাতায় উচ্চবিত্ত বাঙালির নাগরিক পরিবেশের পাশাপাশি চাকুরীজীবি মধ্যবিত্ত বাঙালির আনাগোনা । গ্রামের পরিবেশ ছেড়ে শহর জীবনের সুবিধাগুলি পুরোমাত্রায় ভোগ করে নেওয়ার প্রবণতা দেখা গেল মানুষের মধ্যে।

সমাজ সংস্কারের প্রশ্নে দেখা যায় রামমোহন রায় সতীদাহ প্রথা রদের জন্য অনেক চেষ্টার পর সফল হয়েছিলেন। ১৮২৯ সালে আইন করে ‘সতীদাহ’ রদ করা হয়। পুনরায় বিদ্যাসাগরকে দেখা যায় সমাজ সংস্কারের তাগিদেই ‘বিধবা বিবাহ’ এবং ‘বাল্য বিবাহ’ বন্ধের জন্য প্রয়াস নিতে। ১৮৫৬ সালে আইন সম্মত করা হল ‘বিধবা বিবাহ’। কিন্তু সমাজের গভীরে সমস্যা তা তখনও দুরীভূত হয়নি। কেননা বিধবা নারীকে বিবাহ করার মতো ঔদার্য সমাজে দেখা গেল। আবার অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিধবা বিবাহকে সমর্থন জানাতে পারেননি। এই দলে বঙ্কিমচন্দ্রও ছিলেন। সম্ভবত একারনেই তাঁর ‘বিষবৃক্ষ’ উপন্যাসে বিধবা কুন্দনন্দিনীর বিবাহ দেখা গেলেও দাম্পত্য জীবন দেখা গেল না। বরং কুন্দনন্দিনী আত্মহত্যা করে জীবন বিসর্জন দিয়েছে। এতে যেন বিধবা বিবাহের সামাজিক কুফলের দিকটাই উন্মোচিত হয়। আরও একটা বিষয় লক্ষ্য করার মত, তা হল বিধবা কুন্দের কোন মতামতের জায়গা ছিল না। কিন্তু ধীরে ধীরে সমাজ ভাবনার পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। সেখানে নগর জীবনে পুরুষের পাশাপাশি নারীও শিক্ষার আলো পেয়েছে। তাই নারী ও সমাজে ব্যক্তি হিসেবে স্বতন্ত্র মূল্য দাবি করে। এজন্য কুন্দনন্দিনী নিজের অবস্থান সম্পর্কে অনভিজ্ঞ ও নিরব হলেও ‘চোখের বালি’ উপন্যাসের বিনোদিনী নারীর ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যে সমুজ্জ্বল। একই সঙ্গে সামাজিক ও মনস্তাত্বিক দাবিতে সরব বিনোদিনী। এই দাবি সামাজিক পরিস্থিতিতে বিধবা নারীও যে

তার অবস্থান সম্পর্কে সচেতন থেকে নিজের দাবি ঘোষণা করতে পারে তা বিনোদিনী চরিত্র থেকে স্পষ্ট হয়েছে।

ঊনিশ শতকের শেষভাগে নগরকেন্দ্রিক সভ্যতাতে নারীর সামাজিক দাবি অনেকখানি স্বীকৃত। সেখানে বিধবা বিনোদিনী কারও দয়া নয়, নিজের অধিকার বোধ থেকেই দাবি জানিয়েছে। অন্যদিকে মহেন্দ্রও সম্ভবত বিধবা বিবাহের কথা মাথায় রেখেই দুই চন্দ্র সেবিতের ন্যায় জীবন অতিবাহিত করার কথা ভেবেছে। যদিও সমাজে তখন আইনগত ভাবে বিধবা বিবাহ চালু, কিন্তু সামাজিক ভাবে এর প্রচলন দেখা যায় নি। আর একটি বিষয়, সমাজিক বন্ধনে শিথিলতা না থাকলেও যৌথ পরিবার অপেক্ষা একক পরিবারের দিকেই ঝোঁক দেখা যায়। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ লগ্নে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের ‘চোখের বালি’ উপন্যাসেও দেখা যায় মূলত রাজলক্ষ্মীর পরিবার। সেখানে মহেন্দ্রের কাকিমা অন্নপূর্ণার জীবন অনেকটা আশ্রিতের ন্যায়, প্রায় কোন ভূমিকা নেই বললেই চলে। তাই বলা যায়, এখানে যৌথ পরিবার আভাসিত হলেও, মূলত একক পরিবারই আলোকিত হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায় সামাজিক পরিস্থিতির বদলে একক পরিবারই আলোকিত হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায় সামাজিক পরিস্থিতির বদলে একক পরিবারে পারস্পরিক বন্ধন-নির্ভরতা খুব গভীর ছিল এবং সেখানে পারস্পরিক সংযোগ অন্য মানুষের অবস্থান তাদের তেমন ছাপ ফেলতে পারত না।

১.৪। ঊনবিংশ-বিংশ শতকের সন্ধিক্ষণে সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে যখন ‘বণিকের মানদন্ড রাজদন্ড’ রূপে দেখা গেল তখন থেকে বাংলার সংস্কৃতিরও পরিবর্তন বিশেষ ভাবে সূচিত হল। নবাবদের অপরিণামদর্শিতার কারণে খুব সহজেই রাজদন্ড হস্তান্তরিত হয়েছিল। তাই এই সময়কাল থেকেই (১৭৫৭) বাংলাতেই ভারতবর্ষের দীর্ঘ উপনিবেশিক পরাধীনতার সূত্রপাত হয়েছিল। এমন রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের ইতিহাস যখন সংঘটিত হচ্ছিল তখন সম্ভবত সমাজের চেহারাটা ছিল তিন শ্রেণিতে বিভক্ত। এর মধ্যে প্রথম শ্রেণি- দরিদ্র কৃষক ও

শ্রমজীবি মানুষ, যাদের অনেকের জমিজমা নেই, কারো সামান্য আছে তাও ঋণের দায়ে জমিদারের সেরেস্তায় বাঁধা পড়ে আছে। দ্বিতীয় শ্রেণির মানুষেরা হল - মধ্যবিত্ত। সামান্য আয়ের জোগাড় হয় জমিজমা চাষ করে, তাতেই সারা বছরের গ্রাসাচ্ছাদন চলে। তবে এদের জমির মালিক নিজেরাই। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণির সীমারেখাটি বিস্তৃত এবং এরা জীবনযাপন বিঘ্নবিহীন রাখতে চায়। তাই যারা তাদের ভরসা দেবে তাদেরই আনুগত্য মেনে নিতে প্রস্তুত। আর সর্ব শেষ হল বা তৃতীয় শ্রেণি হল বিত্তবাণ মানুষ। এদের মধ্যে এক শ্রেণি হল রাজা ও রাজপরিবারভুক্ত নারী পুরুষ, অন্য শ্রেণি হল রাজার অমাত্য বর্গ। এই সমাজিক পরিকাঠামোতেই রাজনৈতিক উপনিবেশিক শাসন চলেছে। সময়ের অগ্রগতিতে সামাজিক পরিস্থিতির পাশাপাশি সাংস্কৃতিক পরিবেশের বদল ঘটেছে।

আমাদের আলোচ্য বিষয় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বাংলার সাংস্কৃতির পরিবেশ। একথা বলতে গেলে স্মরণে আসে ঊপনিবেশিক, পরাধীন ভারতে অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে সমাজ ও সংস্কৃতি সুস্থ জীবন চর্যা থেকে অনেকটা বিচ্যুত হয়েছিল। আর এর ফল স্বরূপ সুষ্ঠ জীবনের অঙ্গ হিসেবে সুসাহিত্য অথবা গভীর মাত্রার সাহিত্য-চর্চা হয়নি। সাময়িক পরিস্থিতিতে কিংবা ইংরেজ শাসকের পদলেহী কিছু বাঙালি হঠাৎ অর্থবান হয়ে পড়ে তাদের মোটা রুচির চাহিদা থেকে যা চেয়েছে তাতে সুস্থ জীবন সংস্কৃতির প্রকাশ সম্ভব হয়নি। এজন্য সাময়িক চটকদার সাহিত্য হিসেবে দেখা গেল কবিগান, টপ্পা, সখিসংবাদ, খেয়র প্রভৃতি চর্চা। এরপর একশো বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। সাহিত্য এসবের দুঃস্বপ্নময় পরিস্থিতি কাটিয়ে সুস্থ সমাজ ও জীবনের প্রকাশে অন্যতম ভূমিকা নিয়েছে। রামমোহন, বিদ্যাসাগর প্রমুখ ব্যক্তিত্ব উপযুক্ত প্রবন্ধাদি রচনা ও যথাযথভাবে আইনানুগ বিবেচনা নির্ভর পরিস্থিতি যথার্থ সংস্কারকের ভূমিকা পালন করেছেন। সংস্কৃতি চর্চার পটভূমি পরিবর্তিত হয়েছে। এমন সামাজিক পরিকাঠামোর বদলের ক্ষণে বঙ্কিমচন্দ্র উপযুক্ত সাহিত্য চর্চার মধ্য দিয়ে সুষ্ঠ সমাজ গঠনের আর এক ভূমিকা পালন করেছেন।

পাশ্চাত্য সভ্যতার গভীর সান্নিধ্য ও প্রবল অভিঘাতে বাঙালির উনিশ শতকীয় জাগরণে একধরনের দোটানা ও জটিলতা লক্ষ করা যায়। ইংরেজ শাসক ওপনিবেশিক স্বার্থরক্ষাতেই ভারতে শিল্পায়ণ ও বাণিজ্য প্রসারে আগ্রহী হয়েছিল। তবে এই শিল্পায়নের

প্রভাবে যত তাড়াতাড়ি মধ্যযুগীয় সংস্কৃতির অবসান ঘটতে পারত বাস্তবে তা সংঘটিত হয়নি। আর অন্যদিকে বাঙালি মধ্যবিত্ত মানসে দেখা দিয়েছিল স্বার্থের দোটানা। তাতে একদিকে একান্ত ব্যক্তিগত স্বার্থ বা নিজের তাৎক্ষণিক স্বার্থ, অন্যদিকে দেশ ও জাতির স্বার্থ - যাকে বলা হয় বৃহত্তরস্বার্থ। এভাবেই ধীরে ধীরে মধ্যবিত্তের চিত্তজগতে স্বার্থের বিরোধী টানাপোড়েনের অবসান ঘটেছে ক্ষুদ্র ব্যক্তি স্বার্থ সমগ্র জাতির বৃহত্তর স্বার্থে পরিবর্তিত হয়েছে। যেখান থেকে জাত হয়েছিল জাতীয়তাবাদ। উনিশ শতকের শেষ ভাগে সমাজ সংস্কারক শিবনাথশাস্ত্রী কয়েকটি উপন্যাসে সমগ্র জাতির মনে স্বদেশীচেতনা সঞ্চারে মধ্যবিত্ত শ্রেণির অগ্রণী ভূমিকা তুলে ধরেছেন। এরপরেই মধুসূদন ও হেমচন্দ্রের কাব্যে জাতীয়তাবাদী চেতনা প্রকাশিত হয়েছে। আবার নবীণচন্দ্র সেন তাঁর ত্রয়ী কাব্যে ভারতীয় ঐতিহ্য-মহত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন। এ সময়েই বঙ্কিমচন্দ্র ‘দেবী চৌধুরাণী’ বা ‘আনন্দমঠ’ উপন্যাসে জাতীয়তাবাদের স্বরূপ তুলে ধরেছেন। আবার বিভিন্ন সমাজিক উপন্যাসে সমাজ-সংস্কৃতির মূল কাঠামো ও স্বরূপ উদ্ভাসিত করেছেন।

ইংরেজ ঔপনিবেশিকতার প্রভাবে জমিদারি ও বাবু সংস্কৃতির বিশেষ প্রকাশ ঘটেছিল বাংলাদেশে । আর জমিদারি প্রথা বিলোপের আগে পর্যন্ত বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির উচ্চতম কোটি ছিল মূলত জমিদার শ্রেণির মানুষদের নিয়ে গঠিত। তবে এই জমিদাররা মোগল আমলের বা আগের ন্যায় সামন্তধরনের জমিদার ছিলেন না। আবার অন্যদিকে মধ্যবিত্ত শ্রেণির বড় একটা অংশ জমিজমার সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে সরকারের বেতনভূক কর্মচারী কিংবা বৃত্তিজীবী হয়ে পড়েছিল। এ সময়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষেরা জীবন ও জীবিকার টানে গ্রাম ছেড়ে শহরমুখী হতে শুরু করেছিল। এত সব সত্ত্বেও জমিদারতন্ত্র সম্পূর্ণ ভাবে বিলোপ সাধন হয়নি। এমনই ক্ষয়িষ্ণু জমিদারি সংস্কৃতির স্বরূপ দেখা যায় রবীন্দ্রনাথ কিংবা শরৎচন্দ্রের উপন্যাসেও । আলোচ্য ‘চোখের বালি’ উপন্যাসেও সংস্কৃতির যে রুপ ফুটে উঠেছে তাতে শিক্ষা, সংস্কার ও জমিদারির মিলিত রুপের প্রকাশ ঘটেছে।

১.৫। অনুশীলনী

১) উনিশ ও বিশ শতকের সন্ধিক্ষণে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিষয়ে ধারণা দিন।

২) উনবিংশ শতাব্দী শেষ ভাগে কলকাতা ও শহর-কেন্দ্রিক সমাজের রূপরেখা পরিস্ফুট করন।

৩) উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বাংলার গ্রামীণ সমাজের স্বরূপ তুলে ধরুন।

৪) বিশ শতকের সূচনা লগ্ন পর্যন্ত বাংলার পারিবারিক জীবন কাঠামোর পরিচয় দিন।

৫) বাংলার সংস্কৃতির চর্চার কেমন ভাবে উনবিংশ শতাব্দীতে বিবর্তিত হয়েছে তার পরিচয় দিন।

১.৬। গ্রন্থপঞ্জি

১) আচার্য স্মরণ - রবীন্দ্র উপন্যাসের প্রাসঙ্গিক জিজ্ঞাসা।

২) ঘোষ জ্যোতির্ময় - রবীন্দ্র উপন্যাসের প্রথম পর্যায়।

৩) দাস অমরেশ - রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস : নবমূল্যায়ন।

৪) দাস সজনীকান্ত - রবীন্দ্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য।

৫) দে সত্যব্রত - রবীন্দ্র উপন্যাস সসীক্ষা (১ম খণ্ড)।

৬) দেবনাথ ধীরেন্দ্র - ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ।

৭) বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীকুমার - বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা।

৮) বন্দোপাধ্যায় সুনীলকুমার – উপন্যাসশিল্পী রবীন্দ্রনাথ।

৯) বসু বুদ্ধদেব - রবীন্দ্রনাথ : কথাসাহিত্য।

১০) মজুমদার অর্চনা - রবীন্দ্র উপন্যাস পরিক্রমা।

একক: ২। চোখের বালি : লেখক ও গ্রন্থপরিচয়

বিন্যাসক্রম

২.১। চোখের বালি উপন্যাসের প্রাসঙ্গিক তথ্য

২.২। চোখের বালি উপন্যাসের কাহিনী পরিচয়

২.৩। চোখের বালি উপন্যাস প্রসঙ্গে সমকালীন প্রতিক্রিয়া

২.৪। চোখের বালি উপন্যাস প্রসঙ্গে সমালোচকদের অভিমত

২.৫। অনুশীলনী

২.৬। গ্রন্থপঞ্জি

২.১। চোখের বালি উপন্যাসের প্রাসঙ্গিক তথ্য

বাংলা উপন্যাসে বঙ্কিম যুগেই রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব ঘটেছিল। কিন্তু তখন উপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথকে দেখা যায়নি। তাই 'বৌ ঠাকুরাণীর হাট' ও 'রাজর্ষি' - পর পর দুখানি উপন্যাস রচনার পর দীর্ঘ চোদ্দ বছর কোনো উপন্যাস রচনায় হাত দেননি। কিন্তু কথাসাহিত্যের চর্চা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন বলা যাবে না। তাই 'রাজর্ষি' উপন্যাস রচনার পর থেকেই নিয়মিত ভাবে ছোটগল্প রচনা করেছেন এবং বিভিন্ন পত্রিকায় তা প্রকাশিত হয়েছে। ছোটগল্প রচনার মধ্য দিয়েই জীবন সত্যের গভীর প্রকাশ ঘটিয়েছেন। পূর্ববর্তী দুখানি উপন্যাস ইতিহাসিক উপন্যাসের আদর্শে রচিত। কিন্তু ইতিহাসের বিচিত্র ও বর্ণবহুল শোভাযাত্রা রবীন্দ্রনাথের কবি মনকে সেরকম প্রবল ভাবে কখনো আকর্ষণ করেনি। তাই 'বৌঠাকুরাণীর হাট' উপন্যাসের রাজা প্রতাপাদিত্যের রুদ্র ও ভীষণ মূর্তি অপেক্ষা বসন্ত রায়ের আনন্দ করা ও আনন্দ দানের বিন্যাস এবং বিভার সরলতা পাঠক মনকে অধিক আকৃষ্ট করে। আর প্রতাপাদিত্য যেন ঠিক জীবন্ত ঐতিহাসিক মানুষ নন,

সংসারের নির্মম আততায়ীর ক্রূরতা নিয়ে যেন সুখ-শান্তির গলা টিপে ধরে। অন্যদিকে ‘রাজর্ষি’ উপন্যাসে ইতিহাসের বৈচিত্র্য ও প্রাণচঞ্চলতা নয়, ইতিহাসে জনশূন্য নিস্তব্ধ প্রান্তরে রাজর্ষির সিংহাসন স্থাপিত হয়েছে। এই দুখানি উপন্যাস রচনার পরই গল্প ও কবিতা রচনার অবসরে উপন্যাসের নতুন ভাবনা হয়তো তাঁর মনে দানা বাধতে শুরু করেছিল। তারই প্রতিফলন ঘটেছে ‘বিনোদিনী’ নামক গল্পের খসড়াতে।

‘বিনোদিনী’ নাম নিয়ে গল্পের খসড়া প্রস্তুতি কালেই অন্যতম একটি গল্প রচনা করেছেন নাম 'নষ্টনীড়'। যে গল্পের মধ্যে বিচিত্র জীবন কাহিনির ও জীবন-বেদনার রূপ তুলে ধরেছেন। যে গল্পের কাহিনি-ভাগে অমল- চারুলতার ভালো লাগার বোধ আলাদা মাত্রা এনে দেয়। জমিদারী পরিদর্শনের কাজে রবীন্দ্রনাথকে বাংলাদেশের পদ্মাতীরবর্তী শিলাইদহ, পতিসর, সাজাদপুর, কলিগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলে ঘুরে বেড়াতে হয়। এ সময়েই তিনি পল্লী গ্রামের বিচিত্র নরনারী এবং তাদের জীবনের সুখ দুঃখ আনন্দ কোলাহলময় জীবনের নিবিড় সান্নিধ্য লাভ করেন। সেই বাস্তব অভিজ্ঞতাকে সম্বল করে কবি যেন জীবন রহস্যের গভীরে ডুব দিয়েছিলেন। তার পরিপ্রেক্ষিতেই তার ছোটগল্প গুলিতে বাংলাদেশের পল্লি প্রকৃতি ও নরনারী বিশিষ্ট স্থান পেয়েছে। মানব মনের গভীরে ডুব দিয়ে কবি যেন গোপন তথ্য ও তত্ত্বের সন্ধান পেয়েছেন। সেই মনলোকের তথ্য ও তত্ত্ব নিয়েই নতুন ধরনের কাহিনি বিন্যাসের উপন্যাসই হল ‘চোখের বালি’।

জমিদারি পরিদর্শন ও রক্ষার কাজে শিলাইদহে বাসা বাঁধলেও রবীন্দ্রনাথকে কলকাতায় নানা কাজেই যেতে হয়। কলকাতার যুব সমাজের অনেক কাজ রবীন্দ্রনাথকে না হলে চলে না। যেমন ১৩০৬ বঙ্গাব্দের শেষ ভাবে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গন্ডগোল মেটাতে তাঁকে কলকাতা আসতে হয়েছে। এর মধ্যে সংসারের নানা বিধ চাহিদা আছে। সাহিত্য রসিক পাঠকের চাহিদা জোগানোর তাগাদা আছে। চিঠিপত্রের আদান প্রদান আছে। যেমন এ সময়েই বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্রকে বিলাতে লিখেছেন - “তোমার কাছে জ্ঞানের পন্থা ভিক্ষা করিতেছি আর কোনো পথ ভারতবর্ষের পথ নহে - তপস্যার পথ, সাধিনার পথ আমাদের। আমরা জগৎকে অনেক জিনিস দান করিয়াছি, কিন্তু সে কথা কাহারো মনে নাই - আর একবার আমাদিগকে গুরুর বেদীতে আরোহণ করিতে হইবে, মহিলে মাথা

তুলিবার আর কোনো উপায় নাই।” এমন কাজের চাপের মধ্যে নতুন চাপ এসেছে রবীন্দ্রনাথের উপর। বঙ্কিমচন্দ্রের ‘বঙ্গদর্শন’ (১৮৭২) পত্রিকা নবপর্যায়ে (১৯০১ খ্রিষ্টাব্দে) প্রকাশিত হল। সম্পাদক হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শৈলেশচন্দ্র মজুমদার ‘মজুমদার এজেন্সি’ নাম দিয়ে কলকাতায় একটি গ্রন্থ প্রকাশালয় খুলেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের বহু বই এখান থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রকাশনালয়কে কেন্দ্র করে সাহিত্যের একটি আলোচনা সভা ও নিয়মিত বসে। এ সময় নতুন উদ্যমে পত্রিকা সম্পাদনার পাশাপাশি নতুন লেখার দিকেও মনোনিবেশ করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর ‘রবীন্দ্র জীবন কথা' গ্রন্থে লিখেছেন - “নূতন পত্রিকার দায়িত্ব পড়লেই কবির মন সজাগ ও লেখনী সচল হয়, এটা আমরা পূর্বেও দেখেছি। নূতন বঙ্গদর্শন পত্রিকায় প্রবন্ধ কবিতা তো প্রকাশিত হচ্ছেই, নূতন সাহিত্যসৃস্টি হল উপন্যাস – ‘চোখের বালি'। কিছুকাল পূর্বে ‘বিনোদিনী’ নামে একটা গল্পের খসড়া করে রেখেছিলেন; বঙ্গদর্শন পত্রিকার চাহিদায় সেটাকে কেন্দ্র করেই ‘চোখের বালি’ লিখতে শুরু করলেন।”

‘নষ্টনীড়’ ‘ভারতী’ পত্রিকায় প্রকাশিত হলে সেটা প্রথম দিকে অনেকের কাছে উপন্যাস বলে প্রতিভাত হয়। কিন্তু 'নষ্টনীড়’ উপন্যাস নয় বড়ো গল্প। এর অল্পকালের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ চোখের বালি উপন্যাস রচনা শুরু করেন। বঙ্কিমচন্দ্র ‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে ‘বিষবৃক্ষ’ উপন্যাস প্রকাশের সঙ্গে নবপর্যায়ের ‘বঙ্গদর্শনে' ‘চোখের বালি’ বাংলা সাহিত্যে যুগান্তকারী কাহিনি। মনোবিশ্লেষণমূলক উপন্যাসের সূত্রপাত হল এখানেই।

এক দিন বঙ্কিমচন্দ্রের ‘বঙ্গদর্শনে’ ‘বিষবৃক্ষ’ উপন্যাস বাঙালি পাঠককে এমনি করেই উদভ্রান্ত করে আবির্ভূত হয়েছিল। এই উপন্যাসের গঠন ও বিষয় বৈচিত্র্যের দিক থেকে আকস্মিকতা নিয়েই নতুন ধারার সূচনা করেছিল। ‘চোখের বালি’ তারই সাক্ষ্য বহন করে।

‘বঙ্গদর্শন’ নবপর্যায়ে বাংলা উপন্যাসের নতুন ধারার পূর্ণ পরিণতি ঘটেছে ‘প্রবাসী’ পত্রিকায় ‘গোরা’ উপন্যাস প্রকাশের মধ্য দিয়ে। ‘চোখের বালি’ উপন্যাসে মনস্তত্ত্বের

বিশ্লেষণই প্রাধান্য পেয়েছে, ঘটনা প্রবাহ মূলত ক্ষীণ। মানব মনের সমস্যা বিশ্লেষণ এমন গভীর ভারে এর পূর্বে উপন্যাসে দেখা যায় নি। ১৩০৭ বঙ্গাব্দের গোড়ার দিকে রবীন্দ্রনাথ 'বিনোদিনী' নাম দিয়ে একটি লেখা খাতার মধ্যে খসড়া অবস্থায় পড়েছিল। এ বঙ্গাব্দের শেষ ভাগে লেখক স্বয়ং লেখাটিকে ঘষে মেজে প্রকাশ যোগ্য করে তোলেন। কিন্তু পত্রিকায় টুকরো টুকরো করে লেখকের প্রকাশের ইচ্ছা ছিল না। এ প্রসঙ্গে প্রিয়নাথ সেন মহাশয়কে একটি চিঠি লিখেছেন - "খণ্ড খণ্ড করে এরকম গল্প বেরলে জিনিসটা অসমান হয়ে পড়ে । সব জায়গা তো সমান সরস ও কৌতুকাবহ হতেই পারে না - সুতরাং মাঝে মাঝে বিরুদ্ধ সমালোচনা শুনে হতাশ হতোদ্বম হতে হবেই। এরকম বই সবটা একসঙ্গে না পড়লে উত্তরোত্তর বিকাশ এবং ঘটনায়মান পরিণাম পাঠকের মনে দৃঢ় করে বসে না। এ গল্পে ঘটনাবাহুল্য একেবারেই নেই, সেইজন্যে এটা ক্রমশ প্রকাশের যোগ্য নয় - কিন্তু মাসিক পত্রিকার করাল কবল থেকে একে বাঁচাতে পারব এমন আশা করি না।" লক্ষ করলে দেখা যায় সমকালের অন্যতম দুটি পত্রিকা 'ভারতী' এবং 'বঙ্গদর্শন' উভয়েই রচনাটির উপর দৃষ্টি দিয়েছিল; শেষ পর্যন্ত নবপর্যায়ের 'বঙ্গদর্শনের' নতুন টানে সেখানেই দিতে হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' বাংলা সাহিত্যের নবপর্যায়ের প্রথম উপন্যাস। জীবনের বিচিত্র মাত্রা শিল্প- সাহিত্যের বিভিন্ন আধারে কোনো না কোনো একটির মধ্যে প্রতিফলিত হয়। সেখানে গীতিকবিতা আর উপন্যাসের জীবন-আলম্বন প্রায় বিপরীতে অবস্থান করে। তবে রবীন্দ্রনাথের ন্যায় বিরল প্রতিভার শিল্পী ব্যক্তি-চেতনা মন্থনজাত জীবন-অনুভবের সারাৎসারটুকু অনায়সেই উপন্যাসেই উপন্যাসের প্রধান উপজীত করে তুলতে পারেন। এমনই এক পরিস্থিতিতেই যখন একদিক ছোটগল্প রচনায় মশগুল, তখনই প্রকাশিত হচ্ছে 'নৈবেদ্য'র কবিতা এবং সেই সময়ই উপন্যাসেরও খসড়া প্রস্তুতি চলছে। নতুন ভাবপ্রকরণ সম্বল করে নতুন যুগের সূচনায় নতুন জীবন লক্ষণ উদ্ভাসিত করতে চান বাংলা উপন্যাসে - তেমনই ভাবনা নিয়েই খসড়া প্রস্তুতির শুরু। রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র থেকে জানা যায় ১৩০৬ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসের আগেই 'বিনোদিনী' নামের গল্পের খসড়াটি শুরু হয়ে গিয়েছিল এবং ১৩০৭ বঙ্গাব্দের শ্রাবণের শেষেও তা অসমাপ্ত আকারেই

পড়েছিল। আর নবপর্যায়ের ‘বঙ্গদর্শনে’র সম্পাদনার ভার গ্রহণ করার পরই রবীন্দ্রনাথ পূর্বের খণ্ড খণ্ড করে বার করার অনিচ্ছা সত্তেও ‘বিনোদিনী’ কাহিনীর নাম পরিবর্তিত করে ‘চোখের বালি’ রেখে ১৩০৮ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যা থেকে ১৩০৯ বঙ্গাব্দের কার্তিক সংখ্যা পর্যন্ত ধারাবাহিক প্রকাশ করেন এবং ১৩০৯ বঙ্গাব্দেই ‘চোখের বালি’ প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

২.২। চোখের বালি উপন্যাসের কাহিনী পরিচয়

‘রবীন্দ্র-সৃষ্টি সমীক্ষা’ (২য় খণ্ড) গ্রন্থে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পঞ্চদশ অধ্যায়ে ‘চোখের বালি’ উপন্যাস প্রসঙ্গে আলোচনার শুরুতেই লেখেছেন ‘চোখের বালি’ উপন্যাসের নিখুঁত আদর্শে লেখা ও তাহারই অন্ত:প্রকৃতির পরিচয়বাহী রবীন্দ্রনাথের প্রথম পূর্ণাঙ্গ, মানব-হৃদয় জটিলতার আখ্যানধর্মী ইতিহাস। কবি ও ভাবুক রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস সাধনার খণ্ডিত ও অসম্পূর্ণ প্রয়াস হইতে এখানেই তাঁহার ঔপন্যাসিক সত্তার সুস্পষ্ট ও পূর্ণ বিকশিত অভিব্যক্তি।” একথা যথার্থ বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে যে জীবনসত্যের প্রকাশ ঘটেছিল সংবৃতরূপে ও প্রমাণানিরপেক্ষ আভাস-ইঙ্গিতে, রবীন্দ্রনাথ তারই সুক্ষ্মতম বিশ্লেষণে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ তুলে ধরেছেন উপন্যাসের পাতায়। মানব জীবনের হৃদয়-দ্বন্দ্বের রূপ দেখিয়েছেন আবরণ উন্মোচন করে। বিংশ শতাব্দীর সূচনা-বিন্দুতে ‘নষ্টরনীড়' গল্পে মানব হৃদয়ের জটিল, দূরূহ রূপের প্রকাশ দেখানোর যে পরীক্ষা শুরু করেছিলেন, ‘চোখের বালি’ উপন্যাসে সেই সমস্যার মুখোমুখি হতে পারে এবং যে পরিস্থিটি জট পাকিয়ে যায় হৃদয়ের টানাপোড়েন। এই ভাবনাগুলি মাথায় রেখেই ‘চোখের বালি’ উপন্যাসের কাহিনি ভাব সংক্ষেপে উপস্থাপিত করা যায়।

রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসের কাহিনি-ভাগ বা গল্পাংশ সম্পর্কে কেমন ভাবে ভেবেছেন তা উপন্যাসের সূচনা-অংশ পাঠ করলেই বোঝা ঘায়। নবপর্যায়ের ‘বঙ্গদর্শনের’ মাসিক চাহিদা মেটানো তাগিদ একদিকে, অন্যদিকে ছোটগল্পের উল্কাবৃষ্টির পর নতুন ফরমাসে নতুন কিছু রচনার আন্তর তাগিদ লেখককে তাড়া করছে। এমন এক মানসিক পরিস্থিতিতে বিনোদিনী নামে এক বিধবা নারীর জীবনের পরিণতি দেখানোর অভূতপূর্ব প্রয়াসে কাহিনি নির্মাণের প্রচেষ্টা করেছেন। এই নতুন প্রক্রিয়ার রচনা সম্পর্কে লেখকের নিজস্ব ভাবনা

ছিল- "......গল্পের আবদার যখন এড়াতে পারলুম না তখন নামতে হল মনের সংসারের সেই কারখানা-ঘরে যেখানে আগুনের জুলুনি হাতুড়ির পিটুনি থেকে দৃঢ় ধাতুর মূর্তি জেগে উঠতে থাকে। মানব-বিধাতার এই নির্মম সৃষ্টি প্রক্রিয়ার বিবরণ তার পূর্বে গল্প অবলম্বন করে বাংলা ভাষায় আর প্রকাশ পায়নি।"

এমন অভিনব উপন্যাসের কাহিনি পরিকল্পনা নিয়ে লেখকের নিজস্ব ভাবনা 'চোখের বালি' উপন্যাসে বিশিষ্ট রূপ পেয়েছে। উপন্যাসের কাহিনি ভাগের বিবর্তনের মধ্যে কারখানা ঘরের সেই নির্মাণের ও প্রতিনির্মাণের প্রক্রিয়া উপলব্ধি করা গেছে।

'চোখের বালি' উপনাসের সমগ্র কাহিনি-ভাগ মোট ৫৫ টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। একদিকে রাজলক্ষ্মীর মাতৃত্বের অহংকার ও অভিমান, অন্যদিকে বিনোদিনীর নারীত্বের অভিমান ও ঈর্ষা। এই দুইয়ের মাঝে মহেন্দ্রের অবস্থান টাল খাওয়া। উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদেই নারীর কথা উপস্থাপিত হয়েছে মহেন্দ্রের কাছে। রাজলক্ষ্মীর বাল্যসখী বিনোদিনীর মাতা হরিমতি মহেন্দ্রের হাতে বিনোদিনীকে সঁপে দিতে চায়। তাই মহেন্দ্র কাছে রাজলক্ষ্মীর প্রস্তাব- "বাবা মহিন, গরীবের মেয়েটিকে উদ্ধার করিতে হইবে। শুনি যাছি মেয়েটি বড়ো সুন্দরী, আবার মেমের কাছে পড়াশুনাও করিয়াছে তোদের আজকালকার পছন্দের সঙ্গে মিলিবে।" মহেন্দ্র সযত্নে মায়ের প্রস্তাব পশ্চাতের গাধাবোটের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে সেই বিহারীও বিনোদিনীকে বিয়ে করার কথা ভাবতে পারেনি। ইতিমধ্যে বিনোদিনীর বিবাহ হয়েছে এবং বিধবা হয়েছে। অন্যদিকে রাজলক্ষ্মী পুনরায় মহেন্দ্রের কাছে পুত্রের বিবাহ না দিলে কেমন সামাজিক নিন্দা হয় তা জানিয়েছে। কিন্তু মাতৃত্বের অহংকার স্পষ্ট হয়েছে বিধবা জা অন্নপূর্ণার যুক্তিপূর্ণ কথায়। এখানে আপাতত রণে ভঙ্গ দিলেও প্রথম পরিচ্ছেদেই অন্নপূর্ণার বোনঝি আশার বিবাহ প্রসঙ্গে মহেন্দ্র কাকিমার সঙ্গে আলোচনা করেছে। বিহারীর সঙ্গে আশার বিবাহ দিতে উদ্যোগী মহেন্দ্র।

উপন্যাসে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে দেখা যায় মহেন্দ্র বিহারীকে আশার সঙ্গে বিবাহ দেওয়ার জন্য উদ্যোগী হয়েছে এবং বিহারী এক কথায় রাজি হলেও কন্যা দেখার বিষয়টি ভাবতে বলেছে। সে প্রস্তাবে বিহারী প্রথম রাজি না হলে পরে রাজি হলে মহেন্দ্র বিশেষ উৎসাহে রেশমের জামা ও ঢাকাই ধুতি পরিধান করে বিহারীকে সঙ্গে নিয়ে কন্যা দেখতে বার

হয়েছে। পিতৃমাতৃহীনা আশা থাকে শ্যামবাজারের ধনী জেঠা অনকূলবাবুর আশ্রয়ে। সেখানে বিশেষ খাতিরের সঙ্গে ও আদরের সঙ্গে আপ্যায়িত হয়েছে মহেন্দ্র ও বিহারী। বিহারী আশালতাকে দেখে খুশি হয়েছে এবং বিবাহের জন্য মানসিক প্রস্তুত, কিন্তু মহেন্দ্রর অন্তরের সুপ্ত ইচ্ছা উঁকি মেরেছে। অন্যদিকে রাজলক্ষ্মীর অভিমানী মাতৃহৃদয় পুত্রের আচরণ মানতে পরেনি। তৃতীয় পরিচ্ছেদে দেখা যায় মহেন্দ্র সরাসরি বিহারীকে মিথ্যা করে জানিয়েছে কাকিমা অন্নপূণার ইচ্ছাতেই সে আশালতাকে বিয়ে করতে চায়। কিন্তু রাজলক্ষ্মীর আচরণে অন্নপূর্ণা জানিয়েছে মহেন্দ্র নয়, বিহারীর সঙ্গে আশার বিবাহ হলেই তিনি নিশ্চিন্ত হতে পারেন। অন্যদিকে মহেন্দ্র একরোখা আশার সঙ্গে বিবাহ হবে না জেনে অভিমানে বাড়ি ত্যাগ করে মেস বাড়িতে আশ্রয় করেছে। এখানে মাতা রাজলক্ষ্মীর পুত্র মহেন্দ্র প্রসঙ্গে গর্বিত উক্তি শোনা যায় - "তুমি তাহাকে জান না। যে যাহা চায়, না পাইলে যাহা-খুশি করিতে পারে। তোমার বোনঝির সঙ্গে যেমন করিয়া হউক, তার...." অন্নপূর্ণাকে একথা বলেই ভরসা নয়, বিহারীকেও আশা থেকে নিরস্ত করেছে। বিহারীকে আহত হৃদয়ে সরে গেছে, আশা-মহেন্দ্রের বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে। মহেন্দ্র বিবাহিতা বধূকে একদিনও জ্যাঠার ঘরে রাখতে রাজি নয়।

উপন্যাসের ৪র্থ ও ৫ম পরিচ্ছেদ জুড়ে আশা কে নিয়ে রাজলক্ষ্মীর গৃহস্থালি কাজ শেখানো অভূতপূর্ব প্রয়াস, অন্যদিকে তা দেখে মহেন্দ্র মাত্রাতিরিক্ত গাত্রদাহ এবং কাকিমার কাছে নালিশ। এতে রাজলক্ষ্মী আশাকে সংসারে কাজ শেখানো থেকে মুক্তি দিলেও মনের কাঁটা দূর হল না। তাই মহেন্দ্রের উপর অভিমান করে থাকতে পারলেন না, কিন্তু দুপুর বেলার দাম্পত্যলীলা দেখে তাঁর চক্ষু নত হয়ে গেল। অনেক যত্নে মহেন্দ্র আশাকে লেখাপড়া শেখাতে শুরু করল, আশাও সেই পাঠগ্রহণে আগ্রহী হল। আশা-মহেন্দের দাম্পত্য জীবনে হঠাৎই হাজির হয় দাম্পত্য-সুখে হিংসা করে। সরলা আশা তাই বিশ্বাস করেছে। ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদে দেখা গেল মহেন্দ্রের ফেল সংবাদের পর অনপূর্ণা সংসারের দাহন সহ্য করতে না পেরে স্বেচ্ছায় দূরে সরে রইলেন। এদিকে মহেন্দ্র-আশার অবস্থা দেখে রাজলক্ষ্মী অন্নপূর্ণার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে সংসার শ্রোতে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছে এবং তীব্র অভিমান বশত গ্রামের বাড়ি বারাসতে চলে যেতে চেয়েছে। আশা ছিল মহেন্দ্র বাধা দেবে

রাজলক্ষ্মীর যাবার ব্যাপারে, কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল বাধা দূরে থাক, নিজে পৌছে দিতেও পারবে না। অগত্যা বিহারী পৌঁছে দিতে চাইলে তা সরল ভাবে গ্রহণ করতে পারে না মহেন্দ্র। ৭ম পরিচ্ছেদে রাজলক্ষ্মীকে দেখা যায় বারাসতে, বিনোদিনীর সেবা পরিতৃপ্ত। দীর্ঘায়িত সপ্তম পরিচ্ছেদে বিনোদিনীর কিঞ্চিৎ পরিচয় স্পষ্ট হয়েছে। মহেন্দ্র চিঠি দিয়েছে কিন্তু তাতে মায়ের প্রসঙ্গ অল্প ছিল, দাম্পত্য জীবনের কথাতেই ছিল ভরপুর। বিনোদিনীর বৈধব্য জীবনে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল সেই চিঠি। উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে -

"চিঠির মধ্যে বিনোদিনী কী রস পাইল, তাহা বিনোদিনীই জানে। কিন্তু তাহা কৌতুকরস নহে। বার বার করিয়া পড়িতে পড়িতে তাহার দুই চক্ষু মধ্যাহ্নের বালুকার মতো জ্বলিতে লাগিল, তাহার নিঃশ্বাস মরুভূমির বাতাসের মতো উত্তপ্ত হইয়া উঠিল।"

উপন্যাসের ৮ম পরিচ্ছেদে দুজনের দাম্পত্যে আশা শঙ্কিত হয়েই মহেন্দ্রকে তাড়া লাগিয়েছে মাকে ফিরিয়ে আনবার জন্য। আর ৯ম পরিচ্ছেদে দেখা গেল মহেন্দ্র সঙ্গে দেখা করতে এসে বিহারী মাকে ফিরিয়ে আনার কথাই প্রকারান্তরে জানিয়েছে। ১০ম পরিচ্ছেদে দেখা গেল রাজলক্ষ্মী সংসারে ফিরে এসেছেন এবং সঙ্গে এসেছে বিনোদিনী। আশা ও বিনোদিনীর মধ্যে সখ্য হল - গঙ্গাজল কিংবা বকুলফুল নয়, তাদের সম্পর্কের নাম হল 'চোখের বালি'। ১১শ পরিচ্ছেদের শুরুতেই বিনোদিনীর উপস্থিতি সম্পর্কে বলা হয়েছে - "আশার পক্ষে সঙ্গিনীর বড়ো দরকার হইয়াছিল। ভালোবাসার উৎসব ও কেবলমাত্র দুটি লোকের ছারা সম্পন্ন হয় না সুখালাপের মিষ্টান্ন বিতরণের জন্য বাজে লোকের দরকার হয়।" অন্যদিকে বিনোদিনীর মানসিক অবস্থা সম্পর্কে এখানেই ঘোষিত হয়েছে - "ক্ষুধিতহৃদয়া করিতে লাগিল। তাহার মস্তিষ্ক মাতিয় শরীরের রক্ত জ্বলিয়া উঠিল।" ধীরে ধীরে বিনোদিনী সরলা আশাকে সম্পূর্ণ ভাবে পরিচালিত করেছে। অন্যদিকে ১২শ পরিচ্ছেদে দেখা গেল মহেন্দ্র মাকে ডেকে জানিয়েছে পরের ঘরের যুবতি বিধবাকে সংসারে স্থান দেওয়ায় যে কোনো সময় কোন সংকট ঘটতে পারে। কিন্তু রাজলক্ষ্মী স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন বিনোদিনীকে তিনি পরভাবেন না, কেননা সে তাদেরই বিপিনের বউ। এখানেই বিহারীর কথাতে দ্বিতীয় বিষবৃক্ষ (বঙ্কিমচন্দ্র) কথাটি উল্লেখিত হথেছে। বিনোদিনী সব বুঝে আশার কাছে থেকে নিজেকে সংকুচিত ভাবে গুটিয়ে

নিয়েছে। আশার সাধাসাধিতে আমল না দেওয়ায় আশার মাথায় ফন্দি জাগার কথা ১৩শ পরিচ্ছেদে উল্লেখিত হয়েছে। কেননা তখনো পর্যন্ত বিনোদিনী মহেন্দ্রের সামনে বার হয়নি। আশার প্রচেষ্টায় শেষ পর্যন্ত মহেন্দ্র এবং বিনোদিনীর সাক্ষাৎ ঘটেছে।

আশা বিনোদিনী সম্পর্কে মহেন্দ্র ভাবনা জানার জন্য উৎসুক মন নিয়েই মতামত জানতে চেয়েছে। মহেন্দ্রে সংক্ষিপ্ত উত্তর তার ভাল লাগেনি। বিনোদিনীকে নিয়ে দাম্পত্য আলাপের মাঝখানে হাজির হয়েছে বিহারী । আবার ১৪শ পরিচ্ছেদেই আশার মতলবেই ঘুমন্ত বিনোদিনীর ফটো তোলার প্রয়াস নিয়েছে মহেন্দ্র। আশা –বিনোদিনীর সখিত্বের যুগলবন্দী ছবি উঠল। ১৫শ পরিচ্ছেদের শুরুতে লেখক বিনেদিনীর উস্কানিতে দাম্পত্য কেমন জমেছে তা জানিয়ে দেন কৌশলী ভাষায় - "বাহির হইতে নাড়া পাইলে ছাই-চাপা আগুন আবার জ্বলিয়া উঠে। নবদম্পতির প্রেমের উৎসাহ যেটুকু ম্লান হইতেছিল, তৃতীয় পক্ষের ঘা খাইয়া সেটুকু আবার জাগিয়া উঠিল।" ক্রমে বিনোদিনী- আশা-মহেন্দ্র এই তিনজনের সভা জমে উঠল। আর মহেন্দ্র সংসার জীবনের সর্বত্রই বিনোদিনীর সেবাহস্ত অনুভব করতে লাগল। বিহারী পূর্বের মতো আদর অনুভব করে না মহেন্দ্রের বাড়িতে। তবুও ১৬শ পরিচ্ছেদে বিহারীর ভাবনা- "আর দূরে থাকিলে চলিবে না, যেমন করিয়া হউক, ইহাদের মাঝখানে আমাকেও একটা স্থান লইতে হইবে। ইহাদের কেহই আমাকে চাহিবে না, তবু আমাকে থাকিতে হইবে।" তাই মহেন্দ্র প্রসঙ্গে বিনোদিনীর কাছে বিহারীর আবেদন -_ "বিনোদ-বোঠান, এই ছেলেটিকে ইহার মা মাটি করিয়াছে, বন্ধু মাটি করির ছে স্তর মাটি করিতেছে তুমিও সেই দলে ভিড়িয়া একটা নূতন পথ দেখাইয়ো না দোহাই তোমার।" বিনোদিনীকে একথা বলেই ক্ষান্ত হয়নি বিহারী, মহেন্দ্রকেও বিনোদিনী সম্পর্কে সতর্ক বার্তা জানিয়েছে।

উপন্যাসের সপ্তদশ পরিচ্ছেদে এসে দেখা গেল পূর্বের ভারাক্রান্ত পরিবেশকে হাল্কা করতে সকলে মিলে দমদমের বাগান বাড়িতে চড়িভাতির প্রস্তাব করেছে মহেন্দ্র । আশা উৎসাহিত হলেও বিনোদিনী রাজি হয়নি। অত:পর বিহারীর যাওয়া পরিপ্রেক্ষিতে বিনোদিনী চড়িভাতিতে যেতে রাজি হয়েছে। কিন্তু বিষয়টি মহেন্দ্রের ভাল লাগেনি তার মনে ঈর্ষা জেগেছে। সম্ভবত এই কারণেই মহেন্দ্র চড়িভাতির আনন্দানুষ্ঠানে সাবলীল হতে

পারেনি। কিন্তু এখানেই একান্ত প্রাকৃতিক শারদীয় নির্মল পরিবেশে বিহারী বিনোদিনীর যথার্থ পরিচয় উপলব্ধি করেছে। এদিকে মহেন্দ্রের ঈর্ষা গৃহত্যাগী করিয়ে বাসাতে আশ্রয় করিয়েছে। বিনোদিনীকেও মহেন্দ্র আবস্থান প্রসঙ্গে ভাবতে হয়েছে- ‘‘ব্যাপারখানা কী! অভিমান, না রাগ, না ভয়? আমাকে দেখাইতে চান, আমাকে কেয়ার করেন না? বাসায় গিয়া থাকিবেন? দেখি কতদিন থাকিতে পারেন?’’ (১৮ পরিচ্ছেদ) কিন্তু এখানেই বিনোদিনীর নারীত্বের অভিমান জেগেছে মহেন্দ্র কিংবা বিহারী তাকেই কেহই যথার্থ গুরুত্ব দেয়নি। প্রতিকূল ভাগ্য বশত বিনোদিনীকে সংগ্রামে লিপ্ত হয়েও বিহারীকে আশা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত করতে হয়েছে। মহেন্দ্র এমতাবস্থায় আশার হাতে লেখা পত্র পেলেও বুঝতে পেরেছে ভাষা কার! মহেন্দ্রের অন্তর্জগৎ মাতাল হয়ে উঠলেও নিজেকে সংযত করার চেষ্টা করেছে। পরের পর চিঠি এসেছে নানান আবেদন-নিবেদনে ভরপুর এবং সবশেষে মহেন্দ্র যখন ঘরে ফেরার একরকম সিদ্ধান্ত নিয়েছে চিঠিগুলি ছিঁড়ে ফেলার জন্য। এদিকে বিনোদিনীও 'মহেন্দ্রবাবু' সম্বোধন করেছে খুব সংযত ভাবে। এখানে উপন্যাসের ২২শ পরিচ্ছেদেই মহেন্দ্রের হৃদয় ব্যাকুল ভাবে বিনোদিনীকে কাছে পেতে চেয়েছে। সরলা আশা হৃদয়ের খেলা বুঝতে অক্ষম। কিন্তু বিহারীর কিছুটা বুঝে কিছুটা না বুঝেও বিনোদিনীকে মহেন্দ্রে সংসারে 'থাকার জন্য অনুরোধ করেছে। লোক নিন্দা উপেক্ষা করেই বিনোদিনীকে থাকতে হবে। অথচ পুনরায় মহেন্দ্র বিনোদিনীকে কিছু না জানিয়ে কোথায় চলে গেল।

মহেন্দ্র কাশীতে কাকিমার কাছে কিছুদিন কাটিয়ে কলেজ কামাই যাওয়ার অজুহাতে গৃহে প্রত্যাবর্তন করল। এদিকে আশা মাসিমার সঙ্গে কাশী যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করল। রাজলক্ষ্মীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও মহেন্দ্র আশাকে নিয়ে কাশী যাবার মনস্থির করেছে। মাঝখানে বিহারীর কথার মহেন্দ্র অশালীন ভাবেই প্রতিক্রিয়া করেছে। উপন্যাসে উল্লেখিত হয়েছে - ‘‘মহেন্দ্র গর্জন করিয়া উঠিল, বিহারী, তোমার মনের ভিতর যে কথাটা আছে তাহা স্পষ্ট করিয়াই বলো। আমার সঙ্গে অসরলতা করিবার কোনো দরকার দেখি না। আমি জানি, তুমি মনে মনে সন্দেহ করিয়াছ, আমি বিনোদিনীকে ভালোবাসি। মিথ্যা কথা । আমি বাসি না। আমাকে রক্ষা করিবার জন্য তোমাকে পাহারা দিয়া বেড়াইতে হইবে না।

তুমি এখন নিজেকে রক্ষা করো। যদি সরল বন্ধুত্ব তোমার মনে থাকিত, তবে বহুদিন আগে তুমি আমার কাছে মনের কথা বলিতে এবং নিজেকে বন্ধুর অন্ত:পুর হইতে বহুদূরে লইয়া যাইতে। আমি তোমার মুখের সামনে স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি, তুমি আশাকে ভালোবাসিয়াছ।”

বিহারী আহত হৃদয় ও মন নিয়ে কোনো ক্রমে মহেন্দ্রের বাড়ি থেকে বিদায় নিয়েছে। কিন্তু বিনোদিনীর কাশী যাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ মহেন্দ্রের কাছে ভাবনার অতীত। অন্যদিকে ‘বিনোদিনীকে ভালবাসি না’ উচ্চারণ মহেন্দ্রের চিন্তলোকে আলোড়ন তুলেছে। ২৪ পরিচ্ছেদের শুরুতেই তা জানা যায়। বিনেদিনী বিহারীর উদ্দেশে পত্র পাঠিয়েও তার সদুত্তর পায়নি। আর বিহারী মহেন্দ্রের বাড়িতে এসেও বৌঠান কাশী যায়নি শুনেই মত পরিবর্তন করে অন্দর মহলে প্রবেশ না করে ফিরে এসেছে এবং সেই রাত্রেই পশ্চিমে চলে গেছে। তাই বিনোদিনীর চিঠি বিহারী পায়নি, তা ফেরৎ এসেছে এবং মহেন্দ্র তা নিয়ে বিনোদিনীকে খোঁচা মারতে ছাড়েনি। আর চিঠি খোল দেখে বিহারীকে ভুল বুঝে বিনোদিনীর সর্বাঙ্গ রাগে কম্পিত হয়েছে। ২৫ পরিচ্ছেদে, আশা মহেন্দ্রের কথোপকথনে কাশী ও অন্নপূর্ণার প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত আশার কাশী যাওয়া স্থির হলে বিনোদিনীকে সংসার ও স্বামীর দায়ভার দিয়েছে।

উপন্যাসের ২৬ সংখ্যক পরিচ্ছেদে দেখা যায়, আশাকে কাশী পাঠিয়ে মহেন্দ্র বিনোদিনীর সঙ্গে প্রগাঢ় হওয়ার বাসনায় অধীর । এদিকে বিনোদিনী ধরা দেয় না। আর রাজলক্ষ্মী পুত্রের অবস্থা দেখে বিনোদিনীকেই মহেন্দ্রের ঘরে পরিচর্যার জন্য পাঠিয়েছে। ধীরে ধীরে মহেন্দ্র-বিনোদিনীর সম্পর্ক সহজ এবং অভিমানের পর্যায়ে ঠেকল। এর মধ্যে মহেন্দ্র শান্ত হৃদয়ে আশার উদ্দেশ্যে চিঠি লিখেও ছিঁড়ে ফেলেছে। কাশীতে আশা মাসির কাছে প্রাণ ভরে বিনেদিনীর প্রশংসা করেছে। হঠাৎই সেখানে বিহারীকে দেখে হতচকিত হয়ে দ্বার রুদ্ধ করেছে। আর বিহারী আপাদমস্তক বিদ্যুতের আঘাতে চকিত হয়ে তার প্রিয় কাকিমার কাছে বিদায় নিয়েছে। আর সেদিনই সব জানিয়ে ফিরে যাবার আর্জি জানিয়ে আশা মহেন্দ্রকে পত্র লিখেছে।

নানা ভাবনায় মহেন্দ্রের চিত্তলোক গভীর ভাবে আলোড়িত। বিনোদিনীকে সে কাছের করে পায়নি। কলেজ থেকে বিনোদিনীর নিবিষ্ট চিত্তে 'বিষবৃক্ষ' পাঠ মহেন্দ্রকে উতলা করেছে। সে বিনোদিনীর পা চেপে ধরেছে, হঠাৎ সেখানে বিহারীর আবির্ভাব তাদের হতচকিত করেছে। মহেন্দ্র খোঁচা মারলেও নিরুত্তর থেকেছে। বিনোদিনী প্রতিবাদ জানিয়েছে এবং বিহারীর ঘৃণাভরে প্রত্যাখানে রক্তাক্ত হয়েছে। তবুও বিহারীকেই মনে স্থান দিয়েছে। ২৯ পরিচ্ছেদে মহেন্দ্র যেন মধুর ভাবনায় মশগুল। উপন্যাসের ভাষায় বর্ণিত হয়েছে - "প্রেম এতদিন নেপথ্যের আড়ালে লুকাইয়া বসিয়া ছিল, আজ সে সম্মুখে আসিয়া পর্দা উঠাইয়া দিয়াছে। জগৎ সংসারের উপর হইতে আবরণ উঠিয়া গেছে। প্রতিদিনের পৃথিবীর সমস্ত তুচ্ছতা আজ অন্তহিত হইল।" বিনোদিনীকে নিয়ে মনে মনে রচনা করা মহেন্দ্রের স্বপ্নের জাল তাকে অনেক দূরের কল্পলোকে পৌঁছে দিয়েছে। তবে দীর্ঘায়িত ২৯ পরিচ্ছেদে মহেন্দ্রের ভাবনা রাজ্যে বিহারীর আগমন ও ভোজনে নিমন্ত্রণ অস্থিরতা সৃষ্টি করেছে। বিহারী মহেন্দ্রের আচরণে ব্যথিত হলেও পরিস্কার ভাবে জানতে চেয়েছে তাদের দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বের অবসান ঘটল কিনা।

পরের পরিচ্ছেদ পুনরায় আশা ও অন্নপূণার কাশীর জীবন যাপনের কথা উল্লেখিত হয়েছে। অবশেষে আশা জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেছে। আশা ও বিনোদিনীর কিছু কথার পরই পুরনায় মিলন হল। মহেন্দ্রকে দেখে আশা মনে মনে ব্যথা অনুভব করেছে। মহেন্দ্র কিছু কুশল সংবাদের পর নীরব হয়ে গেল। মহেন্দ্র মনে মনে বিনোদিনীর উপস্থিতির প্রহর গুণে শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়ে শয্যা গ্রহণ করেছে। সেইসঙ্গে আশা প্রসঙ্গে এক ধরনের অপরাধবোধ অন্তরে জেগেছিল যা তাকে আশার সঙ্গে স্বাভাবিক মেশায় বাধা সৃষ্টি করেছে। কিন্তু আশা নিজেই মহেন্দ্রের সেই সংকট দূর করে দিয়েছে। আশা সরলা বলেই সংসারের বিপদের আগমন ধ্বনি শুনতে পায়নি। তাই সংসার অনভিজ্ঞ আশা ভাবতেও পারেনি বিনোদিনীকে মহেন্দ্র ভালোবাসতে পারে। তবে মহেন্দ্র আচরণে আশা নানারকম ভেবেছে এমনকি বিহারীর কাশীতে আগমণ প্রসঙ্গও। অন্যদিকে মহেন্দ্র চুপিচুপি বিনোদিনীর কাছে উপস্থিত হয়ে মাকে দেখে ফিরতে হয়েছে বিনোদিনীর বজ্রাগ্নি নিক্ষেপিত দৃষ্টিবাণ নিয়ে।

৩৩ পরিচ্ছেদে বিনোদিনী তার জীবনের পরিণতি স্পর্কে স্পষ্ট ভাবে মহেন্দ্রকে পত্র মাধ্যমে জানিয়েছে। বুঝিয়েছে, জগতে তার সত্যিকারের ভালোবাসার কিংবা ভালোবাসা পাবার স্থান নেই। সেই চিঠি আশার হাতে পড়ায়, বিশ্বাসের দুর্গে ফাটল ধরেছে। তারই রেশ প্রবাহিত পরবর্তা পরিচ্ছেদেও রাজলক্ষ্মী বিনোদিনীর সঙ্গে ভালোভাবে কথা বলেননি। রাজলক্ষ্মী সরাসরি বিনোদিনীকে "মায়াবিনী" বলে তিরস্কৃত করেছেন। এমন পরিস্থিতিতে মহেন্দ্র বিনোদিনীকে জোরপূর্বক আলিঙ্গন করেছে এবং জানিয়ে দিয়েছে - "তোমার ঘৃণাও আমাকে ফিরাইতে পারিবে না, আমি তোমাকে লইয়া যাইবই, এবং যেমন করিয়াই হউক, তুমি আমাকে ভালোবাসিবেই"। ৩৫ পরিচ্ছেদে বিহারীর কাছে বিনোদিনী ভৎর্সিত হয়েও আশ্রয় প্রার্থী। 'মন্দকে ভালোবাসিয়া একটুখানি মন্দ হও' আবেদন বিহারীকে কিছুটা শিথিল করে দিয়েছে। তবে বিনোদিনী স্থান দেওয়া নয়, পথ নির্দেশ করেছে বিহারী। এদিকে মহেন্দ্র বাড়ি ফিরে উদভ্রান্ত হয়ে বিনোদিনীকে খুঁজেছে এবং না পেয়ে হতাশ হয়ে মহানগরীর কল-কোলাহল মুখর পথে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

অন্যদিকে ৩৭ পরিচ্ছেদে বিহারী নিজেকে নিয়ে বিশেষ ভাবে ভেবেছে। বিনোদিনীকে দেশের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে এসেছে। কিন্তু অন্ধকার নির্জন ছাদে থাকতে না পেরে তাড়াতাড়ি মনকে পরিবর্তিত করতে দীপালোকিত ঘরে ঢুকছে। এমন সময় বিনোদিনীর সন্ধানে উপস্থিত হয়েছে মহেন্দ্র। মহেন্দ্র পতনের মুখে দাঁড়িয়ে বিহারীকে পুনরায় আশাকে নিয়ে কুৎসিত আক্রমণ করে বিদায় নিয়েছে। এদিকে বিনোদিনী গ্রাম্য লোকলজ্জা উপেক্ষা করেই বিহারীর উদ্দেশে পত্র লিখেছে। কিন্তু বিহারীর কাছে থেকে কোনো উত্তর না পেয়ে শঙ্কিত ও রাগান্বিত হয়েছে। এমন সময় সেখানে উল্কার মতো হাজির হয়েছে মহেন্দ্র। পাড়ার চন্ডীমন্ডপে আলোচনা হয়েছে বিনোদিনীর ন্যায় ভ্রষ্টা নারীকে কোনোভাবেই গ্রামে রাখা চলবে না। এদিকে বিনোদিনীর বিহারীর চিঠির প্রতীক্ষার অপমান হল এবং শেষপর্যন্ত বিনোদিনী মহেন্দ্রের সঙ্গে গ্রাম ত্যাগ করেছে।

উপন্যাসের ৪২ সংখ্যক পরিচ্ছেদে দেখা যায় রাজলক্ষ্মী ধারণা পোষণ করেছেন আশার আচরণ ও স্বভাব-দোষের কারণেই মহেন্দ্র গৃহত্যাগ করেছে। আর আশা নত মস্তকে সেই ভৎর্সনা শিরোধার্য করে কেঁদে আকুল হয়েছে। মহেন্দ্রের তখনও আগমন ঘটেছে - কিন্তু

তা ছিল একান্ত ভাবেই প্রাণহীন। যদি রাজলক্ষ্মীর মনে জেগেছে হয়তো পড়িতেই থাকবে এবং বউমার সঙ্গে সব বিবাদের অবসান হয়ে গেছে। অসুস্থ রাজলক্ষ্মী মহেন্দ্রকে নিজের ঘরে যেতে বললেও সে ইতস্তত করলে আশা জানিয়ে দিয়েছে রাত্রে মায়ের ঘরেই থাকার কথা। মহেন্দ্র আশার মধ্যে নতুন বধূ রূপের সন্ধান পেয়েছে। যে আশা স্বামীর কাছে ভিক্ষা প্রার্থিনী নয়, নিজের অধিকারের মধ্যে নিজে অধিষ্ঠিত। এদিকে সন্ধ্যাকালে রোগের কষ্টের সময় রাজলক্ষ্মী বিহারীর খোঁজ করেছে। আশার স্মরণে এসে বিহারীর যত্ন করার কথা। রাজলক্ষ্মীর বিশ্বাস দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে ধ্বনিত হয়েছে বিহারী তাঁর অসুখের খবর পেলে না এসে থাকতে পারবে না। মহেন্দ্র জানিয়েছে - বিহারী পশ্চিমে চলে গেছে।

৪৫ সংখ্যক পরিচ্ছেদে দেখা গেল মহেন্দ্র বিহারীর সন্ধানে এসে বিহারীকে না পেয়ে বিনোদিনীর বাসায় উপস্থিত হয়েছে। এখানে মহেন্দ্র ভাবনালোকের কিছু কথা বিশ্লোষিত হয়েছে। বিনোদিনীর সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে মহেন্দ্র বেমালুম বিহারীর গতিবিধির কথা অস্বীকার করেছে। এমনকি বিনোদিনী বিহারী সম্পর্কে প্রশংসা বাক্য উচ্চারণ করলে মহেন্দ্র নিজের সম্পর্কে রোষ গর্জিতস্বরে জানিয়ে দিয়েছে - "আমাকে যদি পশু বলিয়াই স্থির করিয়া থাক, তবে হিংস্র পশু বলিয়াই জানিয়ো। আমি একেবারে আঘাত করিতে জানিনা, এতবড়ো কাপুরুষ নই।" এরপরই পশ্চিমে যাবার সিদ্ধান্ত স্থির হয়েছে এবং বিহারীর প্রসঙ্গ না ওঠায় কিছুটা স্বস্তি পেয়েছে। এদিকে বিহারীর খবরের প্রত্যাশায় মহেন্দ্রের আগমনে প্রতীক্ষা করে সম্পূর্ণ ভাবে হতাশ হয়েছে এবং আশা ওষুধ খাওয়াতে গেলে রাজলক্ষ্মী তা প্রত্যাখ্যান করেছেন।

মহেন্দ্রের গাড়ি ফিরে এসে কোচম্যানের কাছে জানা গেছে মহেন্দ্র বিহারীর বাড়ি হয়ে পটল ডাঙার বাসায় গিয়েছে। উপর দেওয়া হয়েছে তা আশা জানিয়েছে। আর শারীরিক অসুস্থতার দোহাই দিয়ে পশ্চিমে বেড়াতে যাবার কথা লিখেছে। আর শারীরিক অসুস্থতার দোহাই দিয়ে পশ্চিমে বেড়াতে যাবার কথা লিখেছে। এদিকে রাজলক্ষ্মী অসুস্থ শরীরে সারাদিন উপবাসে থেকে অবসন্ন হয়ে পড়েছে। আর বিমূঢ় আশা চোখের জল মুছতে মুছতে মাসিমা অন্নপূর্ণাকে চিঠি লিখেছে। অন্নপূর্ণা কাশী থেকে খবর নিয়েছে। ৪৭

পরিচ্ছেদের শেষে দেখা যায়, অন্নপূর্ণা গঙ্গার ধারে বাগান বাড়িতে বিহারীর সঙ্গে দেখা করতে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

৪৮ পরিচ্ছেদের দেখা গেল গঙ্গার ধারে বাগান বাড়িতে যে সংকল নিয়ে এসেছিল সেখানে কাজের সুখ, রস কিংবা সৌন্দর্য কোনোটাই নেই। সে উপলব্ধি করেছে বিনোদিনীর সোনার কাঠির স্পর্শে তার অন্তরের নিশ্চলভাবে সুপ্ত যৌবনের জাগরণ ঘটেছে। অন্নপূর্ণা বিহারীকে কলকাতায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য এসেছেন এবং সংবাদ দিয়েছেন বিনোদিনীকে নিয়ে মহেন্দ্র পশ্চিমে পালিয়েছে। এ সংবাদ বিহারীর কাছে ছিল বিনা মেঘে বজ্রপাতের ন্যায়। তার ভাবনা - “মায়াবিনী বিনোদিনী কি সেদিনকার সন্ধ্যাবেলায় আমাকে লইয়া খেলা করিয়া গেল। তাহার ভালোবাসার আত্মসমর্পণ সমস্ত ছলনা ! সে তাহার গ্রাম ত্যাগ করিয়া নিলজ্জর্ভাবে মহেন্দ্র সঙ্গে একাকিনী পশ্চিমে চলিয়া গেল। ঠিক তাহাকে এবং ধিক আমাকে যে - আমি মূঢ়, তাহাকে এক মুহূর্তের জন্যও বিশ্বাস করিয়াছিলাম।” এরমধ্যে বিহারী আশার অবস্থা নিয়ে ভাবতে ভাবতে মহেন্দ্রের বাড়িতে এসেছে। আশার সংকোচহীন বাক্যালাপে বিহারী বিস্মিত। রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে সাক্ষাতে মা ও সন্তানের দু:খভাবনার বিনিময় ঘটেছে। খাওয়া দাওয়া সেরে বিহারী আশার সঙ্গে রাজলক্ষ্মীর পথ্য ও ঔষধ সম্বন্ধে আলোচনা করেছে, এবং অন্নপূর্ণাকে কথা দিয়েছে - “মহেন্দ্রকে আমি উদ্ধার করিব।”

উপন্যাসের ৫০ পরিচ্ছেদে মহেন্দ্রের সঙ্গে থাকলেও বিনোদিনীর পরিবর্তনের স্বরূপ স্পষ্ট হয়েছে। পশ্চিমে ঘুরে বেড়ানোর প্রস্তাব আরামের পক্ষে ব্যাঘাত বলে মহেন্দ্র মনে মনে বিরক্ত হয়েছে। এলাহাবাদে একজায়গায় কাচের বাক্সে বিহারী নামাঙ্কিত পত্র দেখে বিনোদিনী সেখানেই (এলাহাবাদ) থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বিহারীর বাসাবাড়িতে উঠেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের কাছে খোঁজ করে বিহারীর আসার সংবাদ জানতে পেরেছে। মহেন্দ্রের কাছে বিনোদিনী স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে - সে বিহারীর জন্যই পশ্চিমে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বিমূঢ় ও বিভ্রান্ত মহেন্দ্র শেষ পর্যন্ত পরাস্ত নায়ক। বিধ্বস্ত মহেন্দ্রের ভাবনা - “আজই বাড়ি ফিরিয়া যাইব; বিনোদিনী যেখানেই থাকিতে চাহে, সেইখানেই তাহাকে রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া আমি মুক্ত হইব।” মহেন্দ্র যখন বিনোদিনীর কাছে প্রত্যাখাত, তখন

বিহারীর আগমন ঘটেছে এলাহাবাদে। প্রথমত ফিরতে চাইলেও বিনোদিনী আন্তরিক নিবেদনে শেষ পর্যন্ত বিহারী বিনোদিনীকে বিবাহ করার প্রস্তাব জানিয়েছে। বিনোদিনী করজোড়ে সেই প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে বিহারীকে নিরস্ত করছে।

৫৬ সংখ্যক পরিচ্ছেদে দেখা যায় মহেন্দ্র বিনোদিনীকে নিয়ে বিহারী কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেছে। মহেন্দ্র বাড়ি ফিরে স্বাভাবিক হতে পারেনি, অপরাধবোধ তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। রাজলক্ষ্মী মহেন্দ্রকে ক্ষমা করেছেন। একদিকে বিহারী ও মহেন্দ্র; অন্যদিকে আশা ও বিনোদিনীর পুনর্মিলন ঘটেছে। তবে শেষপর্যন্ত বিহারীর দার্শনিক উচ্চারণ শোনা গেছে ধীরে ধীরে জীবনের অনেক ভাঙচুর সারিয়ে নিতে হবে। আর বিনোদিনী অন্নপূর্ণার সঙ্গে কাশী যাত্রা করেছে সেখানেই উপন্যাসের কাহিনির পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

২.৩। চোখের বালি উপন্যাস প্রসঙ্গে সমকালীন প্রতিক্রিয়া

শতাব্দীর পরিবর্তনের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে ‘নৈবেদ্য’ কাব্যে ৬৪ সংখ্যক কবিতায় কবি ঘোষণা করেছিলেন 'শতাব্দীর সূর্ধ আজি অস্ত গেল রক্ত মেঘ মাঝে’। এ সময় সাহিত্য ভাবনার মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ অভিনবত্বের সন্ধান করেছেন। যেকারণে কালের ব্যবধানের দিক থেকে ‘নৈরেদ্য’ ও ‘ক্ষণিকা’ দীর্ঘ সময় ব্যবধানে রচিত নয়, অথচ দুই কাব্যে সুরের পার্থক্য সুস্পষ্ট। তিনি যেন সৌন্দর্যসন্ধানী হয়েও সুন্দরের অতলে অবস্থিত সত্যের উপলব্ধির কথা বলেছেন যাকে মনের গভীরে আত্মস্থ করতে হয়। আর সত্যকে আরো জীবন্তভাব না বাস্তব ভাবে প্রকাশ করা যায় মানুষের মধ্য দিয়ে। সত্যকে আবিষ্কারের জন্য অন্তরলোকে চলে বিচার এবং বাইরের জগতে চলে সংগ্রাম। এবং এই বিচার ও সংগ্রাম কেবল আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়, জটিল জীবনপ্রবাহে নরনারীর মিলনের মধ্যে। যেখানে সমাজ ও সংসারে নিত্যজীবনে তাদের গমাগমন, সেখানে আধ্যাত্মিক সংগ্রাম একমাত্র সংস্যা নয়, দেহের কামনা বিশ্লেষিত হয় সাহিত্যে। প্রাক বিংশ শতাব্দীর সন্ধিলগ্নে রবীন্দ্রনাথ ছোটগল্প গুলির মধ্যে মানুষের জীবনের বিচিত্র ঘাতপ্রতিঘাত ও ছোট খাটো সমস্যার গভীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করেছেন। কিন্তু উপন্যাসের দীর্ঘ আখ্যানে সত্যকে সমগ্র ভাবে ও বিচিত্র ভাবে দেখতে গিয়ে অসংখ্য বন্ধনের মাঝে মানুষের নতুন রূপের

সন্ধান পেয়েছেন। তাই বলা হয়, নবপর্যায়ের বঙ্গদর্শনে উপন্যাসের নবতম ধারার সংযোজন ঘটিয়ে সাহিত্যের নতুন বিশ্লেষণ দেখিয়েছেন।

একদিকে ‘ভারতী’ পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে ‘নষ্টনীড়’ গল্পের প্রকাশ, অন্যদিকে নবপর্যায়ের বঙ্গদর্শন-এ ‘চোখের বালি’ উপন্যাসের ধারাবাহিক প্রকাশ রবীন্দ্রকথা সাহিত্যে অভিনবত্বের সুচনা করেছে। এর পনেরো বছর আগে রবীন্দ্রনাথ যে উপন্যাস লিখেছেন তা একইসঙ্গে বাঙালি পাঠক ও রবীন্দ্রনাথের কাছে বঙ্কিমচন্দ্র ও রমেশচন্দ্রে আদর্শের অনুসরণ। কিন্তু ‘চোখের বালি’ উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ বাংলা-উপন্যাস রচনার চিরাচরিত পথ ত্যাগ করে নতুন ধারার সূচনা করেছন। উপন্যাস প্রসঙ্গে ‘রবীন্দ্রসাগর সঙ্গমে’ গ্রন্থে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ‘চোখের বালি’ সম্পর্কে লিখেছেন - আধুনিক উপন্যাসের সূত্রপাত হল এই গ্রন্থ থেকে। এই সূত্র ধরেই সম্ভবত রবীন্দ্র জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন- “চোখের বালি উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে যে একটি নূতন ধারা বহন করিয়া আনিয়াছিল তাহা আজ সর্ববাদী সম্মত। লেখকও স্বয়ং ইহার বৈশিষ্ট্য যে আবিষ্কার করিতে পারেন নাই, তাহা নহে। ঘটনার ঘাত - প্রতিঘাত অপেক্ষা মনের দ্বন্দ্ব-লীলা নিবিড় হইয়াছে। এতবড় উপন্যাসে চরিত্র সংখ্যা অল্পই মহেন্দ্র আশা বিনোদিনী সমগ্র গ্রন্থখানি জুড়িয়া আছে; রাজলক্ষ্মী অন্নপূর্ণা প্রভৃতি ক্ষীণভাবে সংলগ্ন। এই কয়টিমাত্র চরিত্রের মধ্যেই সংগ্রাম চলিয়াছে অহর্নিশি।” কিংবা আরও বলেছেন – “.........একথা স্বীকার করিতে হইবে যে বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষ ও কৃষ্ণকান্তের উইল বাংলা সাহিত্যে সামাজিক সমস্যা ও নরনারীর যৌনদ্বন্দ্বের পথিকৃৎ। রবীন্দ্রনাথের দ্বারা তাহা আরো সূক্ষ্ম ও জটিল রূপ লইল।”

সাধারণ ভাবে বলা হয়, হিন্দু সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের যোগাযোগ নিরবচ্ছিন্ন নয়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজ ও জাতের মধ্যে তাদের জীবন কঠোর সামাজিক শাসনে নিয়ন্ত্রিত, সেখানে নরনারীর অবাধ মেলামেশার সুযোগ একেবারেই সংকীর্ণ। আর তখনও পর্যন্ত আইন পাস হলেও সমাজে বিধবা বিবাহের ঠিক চল্ হয়নি। বাল্য-বিবাহের কারণে সম্ভবত যুবতি বিধবার সংখ্যাধিক্য ছিল সমাজে এবং সাহিত্যেও বঙ্কিম প্রমুখ লেখকগণ বিবাহ-বহির্ভূত প্রেমের পাত্রী হিসেবে বিধবা নারীকেই ব্যবহার করেছেন - রবীন্দ্রনাথের ‘চোখের

বালি'তে বিনোদিনী বঙ্কিমচন্দ্রে কুন্দনন্দিনী ও রোহিণীর ন্যায় বাল্যবিধবা। এরপরই রবীন্দ্রনাথ আর একটু এগিয়ে 'নৌকাডুবি' এবং 'গোরা' উপন্যাসে অবিবাহিতা ব্রাহ্ম কুমারীর সঙ্গে অব্রাহ্ম যুবকের প্রেমের অবতরণা করে নবতর সামাজিক ও ধর্মীয় সমালোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। এ বিষয়টির কারণে অনেকের কাছে তিনি নিন্দাভাজন হয়েছে তাঁদের মতে এ ধরনের আলোচনা সমাজের পক্ষে হানিকর। অনেকের মতে অবশ্য রবীন্দ্রনাথ শুরু করেও সাহসের সঙ্গে মীমাংসা করতে পারেননি। যেমন 'চোখের বালি' উপন্যাসেও বিহারী ও বিনোদিনীর প্রেমকে চরম পরিণতিতে উত্তীর্ণ করতে পারেন নি।

একই সময় কালে রচিত 'নষ্টনীড়' গল্প এবং 'চোখের বালি' উপন্যাস। তবে নষ্টনীড়ে যে যৌনসমস্যার প্রথম বিশ্লেষণ সূচিত হয়েছিল চোখের বালি উপন্যাসে তারই আর এক রূপ দেখা যায়। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্র জীবনীকার প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন- "সমাজের প্রাচীন সংস্কার ও হিন্দু পরিবারের বহু চিরাচরিত আত্মীয়সম্বন্ধের মধ্যে যৌন সমস্যা কিভাবে নরনারীর সহজ ও স্বাভাবিক জীবনে জটিলতা আনয়ন করিতে পারে তাহা 'নষ্টনীড়' রচিত হইবার পূর্বে বাংলা সাহিত্যে অন্য কোনো লেখক দেখাইতে সাহসী হন নাই। সনাতন সংস্কারের বিরুদ্ধে ব্যক্তিহৃদয়ের বিদ্রোহের প্রথম ঘোষণা হইল 'চোখের বালি'তে।" সম্ভবত এই রচনার মধ্যে প্রেমের প্রচলিত যে সংজ্ঞাগুলি আছে, সেরকম লৌকিক সংজ্ঞার প্রেমকে দেখানো যাবে না।

বাংলা উপন্যাসের নতুন ধারা প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গেলে 'চোখের বালি'র পাশাপাশি 'নৌকাডুবি' এবং 'গোরা' উপন্যাসের কথা ও বলা হয়। এই তিনটি উপন্যাসের মধ্যে আশ্চর্যরকমের মিলের সঙ্গে অমিল বৈশিষ্ট্যের অসাধারণ মেলবন্ধন ঘটেছে। এমনকি অতুলনীয়ভাবেই তিনটি উপন্যাসেই নায়ক নায়িকাদের যৌন আকাঙ্ক্ষা প্রকাশিত হয়েছে। 'চোখের বালি'তে যৌন সম্বন্ধের ঘাত প্রতিঘাত ও সংঘাত জনিত সংস্যার পরিণতিতে বিহারী ও বিনোদিনীর মধ্যে ব্যবধান রচিত হয়েছে। কুন্দনন্দিনীর ন্যায় বিধবাবিবাহের জটিল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়নি। আর নৌকাডুবিতে যৌন সম্বন্ধের অন্য এক সমস্যা প্রস্ফুটিত হয়েছে। সেখানে রমেশের প্রতি ব্রাহ্ম কুমারী হেমনলিনীর প্রেম গভীর, যৌনাকাঙ্ক্ষা

স্বাভাবিক, অথচ অত্যন্ত সংযত। আর তিনখানি উপন্যাসে এক সঙ্গে আলোচনা করতে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন- "রবীন্দ্রনাথ চোখের বালি ও নৌকাডুবি তে যে সমস্যা উত্থাপন করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশ প্রেমে সম্বন্ধীয় ও সামাজিক। এইখানে সমস্যা সমূহের বিশ্লেষণ আছে মাত্র, কিন্তু সমস্যার যথার্থ আলোচনা নাই। 'গোরা'র মধ্যে যে সব বিষয় আলোচিত হইয়াছে, তাহা প্রধানত সামজিক রাজনৈতিক ও ধমীয়।" অর্থাৎ উপন্যাসের নতুন ধারায় চোখের বালি, নৌকাডুবি যেমন বিশেষ স্তরকে চিহ্নিত করে, গোরাও তেমন ভারতীয় হিন্দুত্বের ঐতিহ্যে স্বতন্ত্র ধারার পরিচয় বহন করে।

২.৪। চোখের বালি উপন্যাস প্রসঙ্গে সমালোচকদের অভিমত

'চোখের বালি' উপন্যাস সম্পর্কে আলোচনা ও অভিমতের প্রকাশ আন্তহীন। তবে বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসে 'চোখের বালি' সম্পর্কে অভিনবত্ব সকলেই সহমত পোষণ করেছেন। রবীন্দ্র জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও সেই ভাবনা নিয়েই 'রবীন্দ্রজীবনী' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে 'উপন্যাসের নূতন ধারা' শিরোনাম অধ্যায়ে লিখেছেন- "চোখের বালি উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে যে একটি নূতন ধারা বহন করিয়া আনিয়াছিলেন তাহা আজ সর্ববাদী সম্মত। লেখকও স্বয়ং ইহার বৈশিষ্ট্য যে আবিষ্কার করিতে পারেন নাই, তাহা নহে। ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত অপেক্ষা মনের দ্বন্দ্ব লীলা নিবিড় হইয়াছে।"

ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' গ্রন্থে 'নৌকাডুবি' (১৯০৬) আলোচনা করবার পর 'চোখের বালি' (১৯০৩) উপন্যাসের আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন - "চোখের বালি (১৯০৩) উপন্যাস 'নৌকাডুবি'র পূর্ববর্তী হইলেও, রবীন্দ্রনাথ ইহাতে 'নৌকাডুবি' অপেক্ষা অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছেন। এখানে ঘটনাবিন্যাস ও চিরিত্র বিশ্লেষণে লেখক অনন্যপূর্ব গভীরতা ও কৌশল দেখাইয়াছেন। 'নৌকাডুবি'র সরল-সহজ, একটানা প্রবাহের সহিত তুলনায় এখানে পদে পদে সংঘাত ও গভীর ঘূণাবর্তের সৃষ্টি হইয়াছে - সমস্ত পরিবর্তনের শ্রোত চরিত্রগত গভীর উৎস হইতেই প্রবাহিত হইয়াছে। মহেন্দ্র, বিনোদিনী, বিহারী ও আশা এই চারিজনে মিলিয়া তাহাদের চারিদিকে

যে প্রবল ঘূর্ণিবায়ুর সৃষ্টি করিয়াছে তাহার মধ্যে প্রত্যেকেরই চরিত্রগত বিশেষত্ব একটি বিশেষ রকমের গতিবেগ আনিয়া দিয়াছে। ইহাদের পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধটি অত্যন্ত বিচিত্র ও জটিল এবং সেই সমস্ত অবস্থার ব্যাপক পর্যালোচনা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার”।

অন্যদিকে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ‘রবীন্দ্র সৃষ্টি সমীক্ষা’ গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের পঞ্চদশ অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথের ‘চোখের বালি' উপন্যাসের আলোচনা করতে গিয়ে শুরুতেই লিখেছেন - “চোখের বালি উপন্যাসের নিখুঁত আদর্শে লেখা ও তাহারই অন্ত:প্রকৃতির পরিচয়বাহী রবীন্দ্রনাথের প্রথম সম্পূর্ণাঙ্গ, মানবহৃদয় জটিলতার আখ্যানধর্মী ইতিহাস। কবি ও ভাবুক রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস সাধনার খন্ডিত ও অসম্পূর্ণ প্রয়াস হইতে এখানেই তাঁহার ঔপন্যাসিক সত্তার সুস্পষ্ট ও পূর্ণবিকশিত অভিব্যক্তি। এই উপন্যাসেই তাঁহার অনুকরণাত্মক শিক্ষানবিশি যুগের অবসান ও তাঁহার জীবন সমীক্ষার স্বকীয়তার ও শিল্পরীতির আত্মঘোষণা।”

ড. সুকুমার সেন মহাশয় তাঁর ‘বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস’ গ্রন্থের ৪র্থ খণ্ডে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন - “ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের অপেক্ষা মনের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার আবর্ত ও তাহার পরিণতির গুরুত্ব আধুনিক উপন্যাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য। চোখের বালিতে পাত্রপাত্রীর দ্বন্দ্ব অবলম্বনে ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ও বিকাশ স্বাভাবিক ও সুনিপুণ ভাবে চিত্রিত। তাই ইহা বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রথম আধুনিক উপন্যাস। ‘চোখের বালি'র প্লট বয়নের সূক্ষ্ম চাতুর্য আর কোন বাঙ্গালা উপন্যাসে অতিক্রান্ত নয়।” কিংবা ‘চোখের বালি’ উপন্যাসে শিল্পী-সুলভ গঠন কারুকার্য প্রসঙ্গে বলেছেন- “চোখের বালির সূক্ষ্ম কৌশল ও জটিল কারুকর্ম নিখুঁত বলা চলে।”

ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে 'চোখের বালি' সম্পর্কে মূল্যায়ন করেছেন- “চোখের বালি-তে মনোবিশ্লেষণের বৈপ্লবিক নূতনত্ব সঞ্চারিত হল। বাংলা উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের ‘কৃষ্ণকান্তের উইলে’র পর বড়োরকমের পালাবদল হল ‘চোখের বালি' তে। বাল্যবিধবা বিনোদিনীর চিত্তে পুরুষের প্রতি দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষার জাগরণ এবং তার মানসিক পরিবর্তণের টানাপোড়েন এই উপন্যাসের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য”।

সাম্প্রতিক কালে ড. ক্ষেত্র গুপ্ত মহাশয় 'বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে 'চোখের বালি' উপন্যাসের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে লিখেছেন - "চোখের বালি উপন্যাসের আলোচনায় সবচেয়ে আগে যে প্রশ্নটি সামনে আসে তা হল - নৈতিকতার। সামাজিক বিধিনিষেধ লঙ্ঘন করে চিত্তের কামনা বাসনাকে বল্গাহীন করে দেওয়ার এই সমস্যাটিকে লেখক কতটা বাস্তব ভাবে এবং মানসিক সহৃদয়তা নিয়ে লিখেছেন তাই বিচার্য।"

অন্যদিকে ক্ষেত্র গুপ্ত মহাশয় 'চোখের বালি' উপন্যাসে পরিণতি প্রসঙ্গে বলেছেন- "রবীন্দ্রনাথ শান্ত সংযত পরিবার-জীবনের আদর্শকে একটা তত্ত্ব সদৃশ মর্যাদা দিতে চাইতেন। মানুষের প্রবৃত্তি অতিস্ফীত হয়ে যখন সব সংঘম, কর্তব্য-বুদ্ধি, ধর্ম চেতনাকে আঘাত করে, তখন সে আপনাকে আপনি পীড়িত করে। সেই অকল্যাণী অভিশপ্ত প্রবৃত্তি নিজের এবং সংসারের বিপর্যয় ঘটায়। লেখক কল্যাণের দ্বারা অকল্যাণকে, সংযম ও সামাঞ্জস্যের দ্বারা অতিচারী বাসনাকে প্রশমিত করার মধ্যে প্রাচীন ভারতীয় মহিমার প্রকাশ বার বার দেখেছেন। 'চোখের বালি' উপন্যাসের উপসংহার নির্মাণে সে-ভাবনা পুরোপুরি সরিয়ে রাখতে পারেন নি। ট্রাজেডির দাহকে শান্তি-বর্ষণে প্রশমিত করেছেন।" এবং এর সঙ্গেই মত প্রকাশ করেছেন – "..... একথা স্বীকার করতেই হবে যে, চোখের বালির মহেন্দ্র-বিনোদিনীর মতো কামনাবিদ্ধ এবং সংসার দগ্ধ মানুষ রবীন্দ্র উপন্যাসে আগে দেখিনি।"

২.৫। অনুশীলনী

১) বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব-লগ্নটির বিশদ পরিচয় দিন।

২) রবীন্দ্র-পূর্ব বাংলা কথা সাহিত্যের মূল কাহিনি-ভাবনার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।

৩) ঊনবিংশ শতাব্দীর ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথের বিশেষত্ব কী - আলোচনা করুন।

৪) দীর্ঘসময় প্রায় পনেরো বছর উপন্যাস রচনা থেকে রবীন্দ্রনাথ বিরত ছিলেন - কথা সাহিত্যের চর্চা কি বন্ধ ছিল? - এই পর্বের রবীন্দ্রচর্চার প্রতি আলোকপাত করুন।

মন্তব্য

৫) ‘চোখের বালি’ উপন্যাসের রচনার খসড়া, প্রকাশ প্রভৃতি সম্পর্কে তথ্য সহ আপনার মতামত দিন।

৬) ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।

৭) ‘চোখের বালি’ উপন্যাসের কাহিনিভাগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করুন।

৮) রবীন্দ্রনাথের ‘চোখের বালি’ উপন্যাস নিয়ে সমকালে কেমন্ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল - সে বিষয়ের উপর আলোকপাত করুন।

৯) ‘চোখের বালি’ উপন্যাস নিয়ে সমালোচকেরা যে যে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন তা নিজের ভাষায় লিখুন।

২.৬। গ্রন্থপঞ্জি

১) আচার্য স্মরণ - রবীন্দ্র উপন্যাসের প্রাসঙ্গিক জিজ্ঞাসা।

২) ঘোষ জ্যোতির্ময় - রবীন্দ্র উপন্যাসের প্রথম পর্যায়।

৩) দাস অমরেশ - রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস : নবমূল্যায়ন।

৪) দাস সজনীকান্ত - রবীন্দ্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য।

৫) দে সত্যব্রত - রবীন্দ্র উপন্যাস সসীক্ষা (১ম খণ্ড)।

৬) দেবনাথ ধীরেন্দ্র - ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ।

৭) বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীকুমার - বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা।

৮) বন্দোপাধ্যায় সুনীলকুমার – উপন্যাসশিল্পী রবীন্দ্রনাথ।

৯) বসু বুদ্ধদেব - রবীন্দ্রনাথ : কথাসাহিত্য।

১০) মজুমদার অর্চনা - রবীন্দ্র উপন্যাস পরিক্রমা।

একক: ৩। চোখের বালি : সার্বিক বিশ্লেষণ

বিন্যাসক্রম

৩.১। নামকরণ প্রসঙ্গ

৩.২। চোখের বালির শ্রেণি বিচার

৩.৩। চরিত্র বিচার প্রসঙ্গ

৩.৪। চোখের বালির মনস্তাত্ত্বিকতা

৩.৫। চোখের বালির ট্র্যাজেডি ভাবনা

৩.৬। অনুশীলনী

৩.৭। গ্রন্থপঞ্জি

৩.১। নামকরণ প্রসঙ্গ

নামকরণ বিষয়টি সাহিত্যে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ একটি ব্যাপার। কেননা পাঠক বা নাটকের ক্ষেত্রে দর্শকের কাছে প্রথমত শিরোনাম একটি অনুভূতির সঞ্চার ঘটায়। তবে মোটের উপর বিশ্লেষণে দেখা যায় গড়পরতা রচনাকর্মে কোথাও মূল কাহিনি, কোথায় কেন্দ্রীয় চরিত্র অথবা নায়ক বা নায়িকা, কোথাও বা মূল ঘটনা নামকরণে প্রাধান্য পেয়ে থাকে। অর্থাৎ চরিত্র অথবা ঘটনাভিত্তিক নামকরণ-ই বিশেষভাবে প্রচলিত। যেমন রবীন্দ্রনাথের ‘নৌকাডুবি’ যদি ঘটনা ভিত্তিক নামকরণ হয়, তবে ‘গোরা’ (১৯১০) চরিত্র ভিত্তিক নামকরণ । কিন্তু ‘ঘরে-বাইরে’ কিংবা ‘যোগাযোগ’ (১৯২৯) উপন্যাসের নামকরণের ক্ষেত্রে একটা অন্তর-রহস্যের ছোঁয়া আছে। আর ‘চোখের বালি’ উপন্যাসে যে সংঘাত ক্ষুব্ধ অন্তর্জীবনের ইতিহাস মনস্তাত্বিক কৌশলে লিপিবদ্ধ হয়েছে। সেখানে প্রেম-

মনস্তত্ত্বের জটিলতার সূত্রেই উপন্যাসের শিরোনামটি কেন্দ্রীয় ভাবনার সুরের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

উপন্যাসের কাহিনি সূত্রে আশা-বিনোদিনীর সম্পর্কের আনুষ্ঠানিকতা প্রসঙ্গে জানা যায় আশাই সম্পর্ক পাতানোর প্রস্তাব দিয়েছে, কেননা আশার বিশেষ গরজ ছিল। কিন্তু বিনোদিনীই বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছে এবং সেকারণে সাধারণ সই পাতানোর পরিবর্তে 'চোখের বালি' এরকম ব্যতিক্রমী নামে সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। উপন্যাসের উক্ত সম্পর্কের বন্ধনে যুক্ত দু'জন নারীর মধ্যে একজন সরলা বালিকা ও অন্যজন সংসারের সর্বগুণশালিনী জাদুকরীর ন্যায়। বিনোদিনীর প্রখর ব্যক্তিত্ব ও সংসার-গৃহকর্মের নৈপুণ্যের কাছে আশা সবসময়ে একধরনের হীনম্মন্যতায় ভুগেছে। আর ঔপন্যাসিক যেন এই অসম সখ্যের প্রকৃতি সম্পর্কে সমগ্র উপন্যাসে একবারও বিস্মৃত হননি। তবে আশার মনে কখনো কখনো সামান্য সন্দেহ জাগলেও একেবারের জন্য মনে বিশ্বাস জাগেনি বিনোদিনীর দ্বারা সংসারে সর্বনাশ ঘটতে পারে।

চোখের বালি শব্দটির মধ্যে একটা গভীর ব্যঙ্গধর্মী বিপ্রতীপতা আছে, কেননা চোখে বহিরাগত বালুকণা তীব্র অস্বস্তিকর যন্ত্রণার সঙ্গে দর্শন ক্রিয়াতে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। তাই সাধারণভাবে চোখে বালি পড়ার ব্যাপারটাকে কেউ অভ্যর্থনাসূচক ঘটনা বলে মনে করতে পারে না। বিষয়টির গুরুত্বের দিক অনুধাবন করে বলা যেতে পারে, বিনোদিনী সম্পর্কের নামকরণ নির্বাচন করতে গিয়ে অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও ধী-শক্তির পরিচয় দিয়েছে। সরলা আশার পক্ষে সম্পর্কের নামকরণের ইঙ্গিত উপলব্ধি করা সম্ভব ছিল না। তবে সম্ভবত বিনোদিনীর দিক থেকে একটা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেওয়া হল মহেন্দ্র-আশার দাম্পত্য প্রণয়ের কাছে। তাকে অকিঞ্চিৎকর বলে দূরে সরিয়ে রাখা যাবে না। কিংবা এও হতে পারে, অসহায় গ্রাম্য বিধবাকে আশ্রয় দিয়ে করুণা করলেও সহানুভূতি জানালেই আত্মসচেতন বিধবার সামাজিক পুনর্বাসন হয় না এমন কিছু সবাইকে বুঝিয়ে ছেড়েছে বিনোদিনী । যেখানে তীব্রতম মানবীয় ঈর্ষার বিশেষ উপমা হিসেবে 'চোখের বালি' শিরোনাম বাংলা প্রবাদ-প্রবচনে স্থায়ী আসন লাভ করতে পারে। ঈর্ষার পরিপ্রেক্ষিতে দাম্পত্য প্রণয়ে গদগত আশা প্রথম থেকেই বিনোদিণী আসার পূর্বেই আশা- মহেন্দ্রের দাম্পত্যের পরিচয়

পেয়েছে, আশার প্রতি একবুক ঈর্ষা নিয়েই কলকাতার বাড়িতে এসেছে। অন্যদিকে বিনোদিনীও ঘটনার পরম্পরায় আশার জীবনে ধীরে ধীরে চোখের বালিতে পরিণত হয়েছে।

কাহিনিগত বিশ্লেষণে উপন্যাসে আশা ও বিনোদিনীর সম্পর্কের একটা ধারাবাহিক রূপরেখা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ১০ম পরিচ্ছেদে তাদের সম্পর্কের আনুষ্ঠানিকতা যাত্রা শুরু এবং উপন্যাসের ৩৩ সংখ্যক পরিচ্ছেদে তাদের বিনোদিনী কলকাতায় এসেছিল। বিনোদিনীর সুপ্ত ঈর্ষার গূঢ় ইঙ্গিত সই পাতানোর নামের মধ্যে স্পাষ্ট। সরলা আশা যদি তা উপলব্ধি করতে না পারে, তার দায় যেন বিনোদিনীর নয়। আশার সুখের ঘরকন্নার বিনোদিনী ঈর্ষাদগ্ধ হয়েও নিপুণ অভিনয়ে আশার গলা জড়িয়ে জানতে চায় - "ভাই চোখের বালি, বলো না ভাই, কাল তোমাদের কী কথা হইল ভাই..." (১১ পরিচ্ছেদ)। তার অন্তরলোকের ভাবনা প্রসঙ্গে উপন্যাসে উল্লেখিত হয়েছে" এ ঘরকে আমি রাজার রাজত্ব, এ স্বামীকে যে আমি পায়ের দাস করিয়া রাখিতে পারিতাম। তখন কি এ-ঘরের এই দশা, এ-মানুষের এই ছিরি থাকিত। আমার জায়গায় কিনা এই কচি খুকি, এই খেলার পুতুল।" এখানেই বিনোদিনীর আচরণ ও ভাবনার মধ্যে সম্পর্ক রক্ষার কপটতা ও দ্বি-চারিতার ভূমিকা স্পষ্ট হয়ে যায়। চোখের বালির ব্যঞ্জনা যেন এখানে পাঠকের জানা হয়ে গেল। আশাকে সে শত্রু বলেই মনে করেছে চিরকাল। উপন্যাসের অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত আশা-র আশ্রয় ভেঙে দিয়েছে বলে বিনোদিনীর এক বিন্দু অনুশোচনা নেই।

উপন্যাসের নাম 'চোখের বালি', অথচ রবীন্দ্রনাথ তাঁর গল্পকে ধারা দিয়ে দারুণ করে তোলার জন্য মায়ের ঈর্ষাকেই দায়ী করেছেন। কিন্তু একথা স্পষ্ট অন্তরের ঈর্ষা মন্থন করে বিনোদিনী কেমন নির্বিকার করে আশার গলা ধরে সর্বনাশের ক্রিয়া কৌশল চালিয়ে যেতে পারে, সেখানে নির্দ্বিধায় ব্লা যায়, মায়ের ঈর্ষা নয়, বিনোদিনীর ঈর্ষা-ই কাহিনিকে সচলতা দিয়েছে। ১৯সংখ্যক পরিচ্ছেদেও বিনোদিনীর ঈর্ষা ধ্বনিত হয়েছে – "শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রবাবু আশাকে বিবাহ করিবেন, সেইজন্য অদৃষ্টের তাড়নায় বিনোদিনীকে বারাসতের বর্বর বানারের সহিত বনবাসিনী হইতে হইবে। শ্রীযুক্ত বিহারীবাবু সরলা আশার চোখের জল দেখিতে পারেন না। সেইজন্য বিনোদিনীকে তাহার আঁচলের প্রান্ত তুলিয়া সর্বদা

প্রস্তুত থাকিতে হইবে। একবার এই মহেন্দ্রকে, এই বিহারীকে, বিনোদিনী তাহার পশ্চাতের ছায়ার সহিত ধুলায় লুণ্ঠিত করিয়া বুঝাইতে চায়, আশাই বা কে আর বিনোদিনীই বা কে।” তখনো পর্যন্ত আশা-বিনোদিনীর সম্পর্ক সাবলীলতার সুত্রেই আবদ্ধ। ২৫ সংখ্যক পরিচ্ছেদে গিয়ে দেখা যাচ্ছে আশার কাশী যাত্রার সময় সম্পর্কের বকের সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে। এরপর সাতটি পরিচ্ছেদে দেখা গেল, কাশী থেকে প্রত্যাবর্তন করে আশা বুঝতে পেরেছে তার দাম্পত্য জীবনের ভিত্ নড়বড়ে হয়ে গেছে। এখানে আশা-বিনোদিনীর সম্পর্কের আনুষ্ঠানিকতার সমাপ্তি ঘটেছে। তাদের সম্পর্ক প্রকৃতই চোখের বালিতে পর্যবসিত হয়েছে। এখানেই মহেন্দ্রকে লেখা বিনোদিনীর পত্র পাঠ করে আশা সবদিকে অন্ধকার দেখেছে। মাছকে ডাঙায় তুললে যেমন খাবি খায়, আশার বুকের ভিতরটা তেমন সর্বনাশের বাজনায় মেতে উঠেছে।

উপন্যাসের অন্তিম ভাগে দেখায়, মহেন্দ্র বিনোদিনী দীর্ঘদিনের পশ্চিমযাত্রার অধ্যায় কাটিয়ে সংসারের আশ্রয়ে ফিরে এসেছে। বিহারী সেখানে অনেক ভাঙচুর সারিয়ে নেবার কথা বললেও, কিংবা মাসীমা-অন্নপূর্ণার উপদেশ সত্বেও আশা বিনোদিনী সম্বন্ধে নিষ্কন্টক হতে পারেনি। রাজলক্ষ্মীর সেবায় দুজনে একসঙ্গে কাজ করলেও,

আশা হৃষ্টচিত্তে বিনোদিনীকে মানতে পারেনি। বিনোদিনীকে দেখলেই আশার সমস্ত চিত্ত পীড়িত হয়েছে এবং তারকাছে কোনোরকম সেবা গ্রহণ করা অসম্ভব হয়ে উঠেছে। এ থেকে অনুভব করা যেতে পারে আশার হৃদয়ের ক্ষতের পরিস্থিতি, বিহারীর কথায় বোধ হয় এমন হৃদয়ের ভাঙচুর সারানো সম্ভব ছিল না। মহেন্দ্র-বিনোদিনীর সম্পর্ককে কেন্দ্র করে রাজলক্ষ্মীর মনও বিনোদিনী থেকে একদা বিমুখ হয়েছিল এবং রাজলক্ষ্মী বিনোদিনীকে সরাসরি মায়াবিনী বলে উল্লেখ করেছেন। রাজলক্ষ্মীর ঈর্যাকাতরতা তখন সংসারে তিরোহিত। অন্যদিকে বিনোদিনীর দগদগে ঈর্ষা তখন উন্মত্ত রূপ ধরে সংসারে সকল সুখ-আনন্দে ছোবল মারতে উদ্যত। এমত পরিস্থিতিতে বিনোদিনীর বিষ-নিশ্বাস থেকে সংসারের সাম্য বজায় রাখা সম্ভব ছিল না। যদিও বিনোদিনী মহেন্দ্রকে আশার কাছে অক্ষত ফিরিয়ে দিয়েছে, অন্তত লেখকের বর্ণনা থেকে তা স্পষ্ট। ‘চোখের বালি’ সম্পর্কে সই-ই পাতিয়েছিল আশার সঙ্গে। তখন ঈর্ষা সুপ্ত ছিল তার অন্তরে । আর শেষে

আশার মিলনের দিনের আচরণেও মর্মে মর্মে উপলব্ধি করি বিনোদিণী কেমন ভাবে আশার জীবনে 'চোখের বালি'তে পরিণত হয়েছে। যেখানে বিনোদিনী শব্দটি আশার কাছে চোখের বালি অর্থেই প্রযোজ্য হয়েছে। উপন্যাসের নামকরণে এই আনুষ্ঠানিক সখিত্বের নামকরণ যেমন অর্থবহ এবং ব্যঞ্জনাবাহী হয়েছে, অন্য শিরোনামে এমনটি হত না।

৩.২। চোখের বালির শ্রেণি বিচার

বাংলা কথাসাহিত্যে সামাজিক উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে পারিবারিক কাহিনির প্রাধান্য দেখা যায়। বাংলা উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র 'বিষবৃক্ষ' (১৮৭৩) এবং 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (১৮৭৫) উপন্যাস-এর সূত্রপাত করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিম-পন্থা অনুসরণ করেই পরিবার জীবনের কাহিনি দাবি মেনে নিয়ে সামাজিক উপন্যাস রচনার প্রয়াস নিয়েছেন। 'চোখের বালি' উপন্যাসে দেখা গেল একটি ছোট নাগরিক পরিবারে স্বল্প কয়েক জনের সদস্য বেষ্টিত মানুষের মধ্যে বাইরের কিছু মানুষের আনাগোনা ও কিছু বহিজীবিন এবং গ্রাম্যজীবনের অনুষঙ্গে বৃহত্তর সমাজগণ্ডী পরিবার এর জীবন-কাহিনির সংযোগ ঘটেছে। একদিকে কলকাতা ধনী পরিবারের একমাত্র সন্তান মহেন্দ্র দেবতা ও মানুষের কাছে সকল প্রকার প্রশ্রয় পেয়ে বড় হওয়াত জীবনের সংযম শিক্ষা একেবারেই হয়নি। অন্যদিকে তারই কলেজের সহপাঠী ও অভিন্ন হৃদয় বন্ধু বিহারী প্রথম থেকেই সংযমি ও বিনরী শিক্ষিত যুবক। মহেন্দ্রের মা রাজলক্ষ্মী এবং কাকিমা অন্নপূর্ণা ও মহেন্দ্র পাশাপাশি বিহারীকে স্নেহ করেন। এমনও মনে হয়, বিহারী যেন এ পরিবারের একজন সদস্য। সকল ক্ষেত্রেই মহেন্দ্রের পরই বিহারীকে ভাবা হয়েছে। এমন বিবাহের ক্ষেত্রেও বিনোদিনীকে কিংবা আশালতার ক্ষেত্রেও মহেন্দ্র বিবাহ করতে রাজি না হওয়ায় বিহারীর কাছে প্রস্তার দেওয়া হয়েছে। বিনোদিনীর ক্ষেত্রে বিহারী প্রস্তাব নাকচ করলেও কাকিমা অন্নপূর্ণার বোনঝি আশাকে না দেখেও বিহারী বিবাহে সম্মত হয়েছে। কিন্তু স্রষ্টার পরিকল্পনা অনুসারেই মহেন্দ্র আশাকে বিয়ে করেছে এবং বিহারী এমন বঞ্চনাকে নীরবে মেনে নিয়েছে।

পরিবারের ক্ষুদ্র গণ্ডীতে একমাত্র পুত্রই ছিল বিধবা মায়ের একমাত্র অবলম্বন এবং ভরসাস্থল। কিন্তু বিবাহের পর তেমন ভাবে আর পুত্রের উপর অধিকারবোধ বজায়

রাখতে পারছেন না। একে তো অন্নপূর্ণাকে মহেন্দ্র শ্রদ্ধাকরে, তাতে আশা (পুত্রবধূ) অন্নপূর্ণারই বোনঝি। অগত্যা মায়ের অন্তরে জাগ্রত ঈর্ষা কলকাতার নাগরিক সমাজের পরিবার থেকে বারাসতের গ্রাম্য গণ্ডীতে হাজির করে। নাগরিক সমাজ থেকে স্বল্পক্ষণের জন্য পাঠকের দৃষ্টি গেল গ্রাম্য পরিবার ও সমাজে। শহুরে নয়, একেবোরে গ্রাম্য আন্তরিকতায় মৃত বিপিনের বিধবা পত্নী বিনোদিনী গ্রাম্য সম্পর্কে পিসিমা ও মায়ের বাল্যসখি রাজলক্ষ্মীকে সেবায় বিশেষভাবে হৃদয় ভরিয়ে দিল। বিনোদিনীর আগমন ঘটল কলকাতায় নাগরিক সমাজ তথা মহেন্দ্রের পরিবারে । এখানেই 'চোখের বালি' উপন্যাসে বিধবার প্রেম ও তার পরিণাম ধীরে ধীরে কাহিনির কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসে। প্রচলিত সমাজনীতিকে সজোরে আঘাত হানে বিনোদিনীর ভাবনা এবং প্রেম নিবেদনের অভিনব কৌশল।

বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থার কাঠামোতে দেখা যায় বিধবারা সকল রকম ভোগ থেকে বঞ্চিত হবে। তাদের জোর করে সকল আনন্দক দূরে সরিয়ে রাখে অথচ সমাজপতিরাই নানা প্রলোভনে অথবা সমাজ-নিন্দা-অপবাদের ভয় দেখিয়ে ভ্রষ্টতার পথে নিয়ে যায়। অথচ পুরুষটি ভ্রষ্টাচারে বাধ্য করেও নারীকে অপবাদ দিয়ে সমাজচ্যুত করে, কখনো বা বাধ্য করে মৃত্যুকে বরণ করতে। কিন্তু বিনোদিনী ব্যক্তিস্বাতন্ত্রে বিশ্বাসী স্বাধীনচেতা শিক্ষিতা এবং বুদ্ধিমতী বিধবা নারী। আধুনিক সমাজের মধ্যে সেই তথাকথিত সমাজপতি নেই, বরং কলকাতার নাগরিক সমাজে তার চলা আরও স্বাধীন। মহেন্দ্র-বিনোদিনীর প্রণয় খেলায় প্রথমত লুকোচুরি থাকলেও, সে আবরণ ক্রমে সরে গেছে, আশা ও রাজলক্ষ্মীর কাছে কিছুই গোপন থাকেনি। পরিবারের অন্ত:পুরে বেড়ে ওঠা আসমাজিক প্রেম বাড়ির আস্তানা ছেড়ে আশ্রয় নিয়েছে পটলভাঙার বাসাবাড়িতে। সমাজের চোখে বিনোদিনী বৈধব্যকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে উন্মত্ত হয়েছে ভোগের লালসায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কাহিনির বুনোটে বিনোদিনীর শুচিতাকে বজায় রেখেছেন। তথাপি মহেন্দ্র-বিনোদিনীর সম্পর্কের কলুষিতা দূরীভূত হয়না। সরলা আশা তার স্বামী এবং সখি চোখের বালির আচরণে অস্তিত্ব হয়ে অশ্রুপাত করে বিষগ্র চিত্তে। অন্যদিকে মহেন্দ্র-বিনোদিনীর

অবৈধ প্রণযের লীলা পরিবারের ক্ষুদ্রগন্ডী অতিক্রম করে বৃহত্তম সমাজ পরিধিতে প্রবেশ করে।

বিহারীর প্রতি বিনোদিণী হৃদয় সদা উন্মুখ। তাই বিহারীর কথা অনুসরণ করেই বিনোদিনী পটলডাঙার বাসা থেকে বারাসতের গ্রামীণ সমাজে প্রত্যাবর্তন করেছে। বিহারীর প্রত্যাখিত প্রেম নিয়েই বিনোদিনী বারাসতে নির্বাসিত জীবনযাপণ শুরু করেছিল। হয়তো একমসয় বিনোদিণীর উন্মাদনা স্তিমিত হয়ে আসত। কিন্তু হঠাৎ সেই গ্রাম্য পরিবেশে উদ্দাম ঝড় নিয়ে উদভ্রান্ত প্রেমিক মহেন্দ্র উপস্থিত হল। মহেন্দ্র এমন ভাবে আগমন গ্রাম্য পরিবার এবং সমাজ মেনে নিতে পারেনি। মহেন্দ্র-বিনোদিনীর অবৈধ প্রণয় লজ্জাজনক এবং নিন্দার বিষয়। বিশেষভাবে ক্ষুব্ধ গ্রাম্য সমাজ শুধু মহেন্দ্রকেই নয় বিনোদিনীকেও নির্বাসন দিয়েছে। উপন্যাসের ৩৯ সংখ্যক পরিচ্ছেদে দেখা গেল বিনোদিনীর বৃদ্ধা দিদিশাশুড়ী ধিক্কারবাণী শুনিয়েছেন- "মহেন্দ্র তুমি আমাকে চেন না, কিন্তু তুমি আমার পর নও। তোমার মা রাজলক্ষ্মী আমাদের গ্রামেরই মেয়ে, গ্রাম সম্পর্কে আমি তাহার মামী। জিজ্ঞাসা করি, এ তোমার কী রকম ব্যবহার। ঘরে তোমার স্ত্রী আছে, মা আছে, আর তুমি এমন বেহায়া হইয়া, উন্মত্ত হইয়া ফিরিতেছ। ভদ্রসমাজে তুমি মুখ দেখাইবে কী বলিয়া"। এর পরই নির্মমভাবে মহেন্দ্রকে চলে যাবার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

বারাসতের গ্রাম্য সমাজ ও পরিবার থেকে মহেন্দ্র বিদায় নয়, বিতাড়িত হয়েছে - লজ্জিতা বিনোদিনীও বিতাড়িত হয়েছে। কলকাতার নাগরিক সমাজে যেটা নিয়ে কারও মাথাব্যথা নেই, বারাসতের গ্রামে তা চলবে কেন? বিধবার প্রেম নিবেদন প্রসঙ্গে কলকাতার নাগরিক সমাজ উদাসীন হলেও, বারাসতের মানুষের কাছে গর্হিত অপরাধ হিসেবেই বিবেচ্য। সমাজ- গর্হিত নিষিদ্ধ প্রেমের কাহিনিতেই চোখের বালি শেষ হতে পারত। কিন্তু লেখক কৌশলে পারিবারিক গন্ডী থেকে বার হয়ে যাওয়া মানব-মানবীকে পুনরায় সমাজনীতির মানদন্ডে পরিবারে ফিরিয়ে এনেছেন। বিবাহিত যুবক মহেন্দ্রকে যেন তার স্ত্রীর কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার দায় রক্ষিত হয়েছে। চোখের বালির সমগ্র কাহিনিতে শেষপর্যন্তই সংসার তথা পরিবারের আধিপত্য বজায় রাখা হয়েছে। পরিবার ও সমাজের মেল বন্ধনে 'চোখের বালি' হয়ে উঠেছে সামাজিক উপন্যাস।

৩.৩। চরিত্র বিচার প্রসঙ্গ

'চোখের বালি' উপন্যাস রচনাকালে রবীন্দ্রনাথ কথাসাহিত্যের চর্চায় পরিণত শিল্পী, তাঁর জীবনবিষয়ক চিন্তা সুস্পষ্ট। তাই উপন্যাসের পাত্রপাত্রীর হৃদয়ের আলোড়ন পরিবারে তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি করেছে। মানবচরিত্রের দ্বন্দ্বমুখর রূপ 'চোখের বালি' উপন্যাসে রাজলক্ষ্মী, মহেন্দ্র, আশা, বিহারী ও বিনোদিনী কে নিয়োই জটিল আবর্ত রচিত হয়েছে।

রাজলক্ষ্মী :

'চোখের বালি' উপন্যাসের কাহিনি ভাগে যে কয়েকটি চরিত্র প্রধান ভূমিকা পালন করেছে তারা সকলেই জীবন সম্পর্কে বিশেষ অভিজ্ঞ এবং সংসারের জটিলতা সম্বন্ধে সচেতন। মাতৃচরিত্র হিসেবে রাজলক্ষ্মীর ভূমিকা হিসেবে লেখক সচেতন ভাবেই কাহিনি পরিকল্পনা করেছিলেন। এ কারণে উপন্যাসের সূচনাংশে জানিয়েছেন- "বঙ্গদর্শনের নবপর্যায় একদিকে তখন আমার মনকে রাষ্ট্রনৈতিক সমাজনৈতিক চিন্তার আবর্তে টেনে এনেছিল, আর এক দিকে এনেছিল গল্পে, এমন কি কাব্যেও, মানবচরিত্রের কঠিন সংস্পর্শে। অল্পে অল্পে এর শুরু হয়েছিল সাধনার যুগেই, তার পরে সবুজপত্র পসরা জমিয়েছিল। চোখের বালি গল্পকে ভিতর থেকে ধারা দিয়ে দারুণ করে তুলেছে মায়ের ঈর্ষা। এই ঈর্ষা মহেন্দ্র সেই রিপুকে কুৎসিত অবকাশ দিয়েছে যা সহজ অবস্থায় এমন দত নখ বের করত না।" এখানেই স্পষ্ট মায়ের ঈর্ষা উপন্যাসের কাহিনিতে বিশেষ ভূমিকা নেবে। উপন্যাসের শুরুতেই রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে বিনোদিনীর মা হরিমতির কথোপকথন শোনা যায়। আর উপন্যাসে শেষতম পরিচ্ছেদে রাজলক্ষ্মীর মৃত্যুর কথা উল্লেখিত হয়েছে। এরমধ্যে সমগ্র কাহিনিতে রাজলক্ষ্মীর প্রসঙ্গ বার বার এসেছে।

কলকাতার একটি সম্পন্ন গৃহস্থ পরিবারে গৃহকর্ত্রী রাজলক্ষ্মী। স্বামীহীন বৈধব্যজীবনে সন্তান মহেন্দ্র একমাত্র অবলম্বন এবং পরিবারে ক্ষুদ্র গন্ডীতে তাঁর স্বাধীনতা ও ইচ্ছাশক্তি নিরঙ্কুশ। তিনি খুব জেদি এবং অধিকারবোধে আচ্ছন্ন নারী। মহেন্দ্রের বল্গাহীন উদ্দাম মনোবৃত্তির বীজ যেন রাজলক্ষ্মীর প্রকৃতির মধ্যে অপেক্ষাকৃত সংযত ভাবে লুকিয়ে রয়েছে।

সংসারের কর্তৃত্বের বিষয়ে তিনি বিশেষ সচেতন। ভারতীয় তথা বাঙালি হিন্দুনারীর অস্থিমজ্জাগত কিছু সংস্কার এবং সংসারের দায়িত্ববোধ তার আত্মদমনের কিছুটা সহায়ক হয়েছে এবং তার সাংসারিক দুর্দমতা কিছুটা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। মহেন্দ্রের তীব্র আত্মাভিমান এবং অধিকার স্পৃহা যেন মায়ের কাছে থেকেই পাওয়া। রাজলক্ষ্মীর আচরণের মধ্যে নারী সুলভ জটিলতা ছিল, যা উপন্যাসের কাহিনিতে ঈর্ষারূপে প্রকটিত হয়েছে। তবে তার চরিত্রে ঈর্ষা জটিলতা থাকলেও, মনস্তাত্ত্বিক অভিনবত্ব তেমন ছিল না। লোকসংসারের মধ্যে নারীচরিত্রের যে সকল আচরণ বৈশিষ্ট্য স্বাভাবিক ভাবেই দেখা যায় তা রাজলক্ষ্মীর মধ্যে ছিল। তার একমাত্র অবলম্বন মহেন্দ্রকে তিনি যথেষ্ট প্রশ্রয় দিয়েছেন। কিন্তু তাতে যে মহেন্দ্র জেদি, দুর্বিনীত ও উচ্ছৃঙ্খাল হয়ে উঠেছিল, তা বুঝতে চাননি রাজলল্্লী। বরং বাধ্য পুত্রের অকপট আনুগত্য নিয়ে তার গর্ববোধ ছিল। তবে প্রাক-বিবাহ পর্বের মহেঞ্ একেবারে পরিবর্তিত হয়ে গেল বিবাহিত জীবনে। কিশোরী স্ত্রী মহেন্দ্র জীবনের নূতন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। স্ত্রীকে নিয়ে সর্বক্ষণের ব্যস্ততায় মহেন্দ্র কলেজের পড়াতে যেমন ছেদ ঘটাল, তেমনি মাতৃ-আনুগত্যবোধেও টান ছিল। এমন পরিস্থিতি পুত্র স্নেহাতুর মা পুত্রের উপর দখল ও সংসারের উপর একাধিপত্য হারানোর ভয়ে সঙ্কুচিত হয়েছেন। তার মনে হল দাম্পত্যের এমন বেহায়াপনা আগে দেখেন নি এবং এরজন্য দায়ী পুত্রবধূ। আহত চিত্তে নি:সঙ্গতায় ভীতিতে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন এবং অভিমানে কলকাতার বাড়ি ছেড়ে জন্মভূমি বারাসতের বাড়িতে চলে গিয়েছেন।

অভিমানী মায়ের প্রত্যাশা ছিল খুব শীঘ্র মহেন্দ্রে কাছ থেকে ব্যাকুল আহবান আসবে। কিন্তু পুত্রের কাছ থেকে প্রত্যাশিত আহ্বান আসেনি। তবে এখানেও রবীন্দ্রনাথ মায়ের বাৎসল্যের অনুভবটি সুন্দর ভাবে উপন্যাসের ৭ম পরিচ্ছেদে তুলে ধরেছেন- "বাছুর যেমন গাভীর স্তনে আঘাত করিয়া দুগ্ধ এবং বাৎসল্যের সঞ্চার করে, মহেন্দ্রের রাগ তেমনি রাজলক্ষ্মীকে আঘাত করিয়া তাহার অবরুদ্ধ বাৎসল্যকে উৎসারিত করিয়া ছিল। তিনি মহেন্দ্রকে ক্ষমা করিলেন।" তাই রাজলক্ষ্মী শেষ পর্যন্ত মহেন্দ্রের সকল ত্রুটিকে ক্ষমার চোখে নিয়ে কলকাতার বাড়িতে প্রত্যাবর্তন করেছেন। তবে একা নন, সঙ্গে নিয়ে এলেন বিধবা সুন্দরী যুবতী বিনোদিনীকে। তিনি যেন অর্ধনিমীলিত চোখে দেখতে

থাকলেন সুন্দরী বিনোদিনীর সংসার-পটুত্ব ও গৃহকর্মের নিপুণতায় মহেন্দ্র-আশার দাম্পত্যের ঘনঘোর ফিকে হচ্ছে। পুত্রের দাম্পত্যকে নির্মম আঘাত করে একেবারে ভেঙে ফেলার মানসিকতা তার ছিল না। রাজলক্ষ্মীর বিচারবোধ অন্ধহীন ঈর্ষায় জর্জরিত ও আচ্ছন্ন ছিল ভেবেছিলেন যুবতী বিনোদিনী তার নির্ধারিত কাজটি সমাধা করেই বারাসতের সমাজ শৃঙ্খলায় ফিরে যাবে। রাজলক্ষ্মীর ভাবনা তার নিজের কাছে যতটা না স্পষ্ট ছিল বিনোদিনীর বুদ্ধিমত্তা তা সহজেই অনুমান করেছিল। তাই রাজলক্ষ্মীর বিচার করতে গিয়ে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন - "রাজলক্ষ্মীর স্বকীয় স্বভাবের উপাদান হইল স্ত্রীজাতি সুলভ ঈর্ষা ও সূক্ষ্ম ও ছদ্মবেশী আঘাতপটুতা। মহেন্দ্রের উপর অধিকার লইয়া পুত্রবধূর প্রতি তাহার অবচেতন মনে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল, তাহা আর একজন নারী - বিনোদিনীর অন্তদৃষ্টির নিকট ধরা পড়িয়াছে।" (রবীন্দ্র সৃষ্টি সমীক্ষা, ২য় খণ্ড)

মাতা রাজলক্ষ্মী বধূর হাতে পুত্রকে ছেড়ে দিয়ে স্বস্তি পাননি। আর বিনোদিনীর নাগপাশ বন্ধনে পুত্রকে পাঠিয়েছিলো ঈর্ষার তীব্রভাবে আচ্ছন্ন হয়ে। দাম্পত্যর ভাঙনে মহেন্দ্র বিনোদিনীর প্রণয় ভিক্ষা প্রার্থনা করে উদভ্রান্ত হয়ে বেড়াতে লাগলে রাজলক্ষ্মীর মাতৃহৃদয় দগ্ধ হয়েছে। পুত্রবধূর প্রতি তীব্র ঈর্ষার ভুল সন্দেহের বশে মেজো জা অন্নপূর্ণাকে কটু বাক্য বলেছেন এবং তার সম্প্রীতির বন্ধনকে অবহেলায় ঠেলে সরিয়ে দিয়েছেন। যার ফলস্বরূপ অন্নপূর্ণা সংসারের আশ্রয় ছেড়ে কাশীবাসিনী হয়েছেন। বিহারীকে সন্দেহ করলেও তার স্বাধীন ব্যক্তিসত্তাকে বিশেষ সুনজরে দেখতে পারেননি রাজলক্ষ্মী। অথচ পুত্রকে সংসারে ফিরিয়ে আনার জন্য সম্পূর্ণভাবে বিহারীর উপর নির্ভর করেছেন। মহেন্দ্রের অবর্তমানে রাজলক্ষ্মী আশার সঙ্গে সন্ধি করেছেন। তবে তাকে চোখে আঙুল দিয়ে বিনোদিনী বুঝিয়ে দিয়েছে রাজলক্ষ্মীর গোপনঈর্ধা কেমন দাত নখ বার করা হিংস্র। ঈর্ষার অভিঘাতে রাজলক্ষ্মীর ক্ষত-বিক্ষত হৃদয় ট্র্যাজেডির পরিণতিতে পৌঁছেছে। তবে শেষপর্যন্ত মৃত্যুর আগে মহেন্দ্রের সংসারে প্রত্যাবর্তন তার অন্তর্দাহকে কিছুটা প্রশমিত করেছে যা তার ট্যাজেডিকে সমাহিত রূপ দিয়েছে। শেষ পর্যন্ত নিজের ভুল বুঝে, অনুশোচনায় লহিত হয়ে তিনি পূর্ণতা পেয়েছেন।

অন্নপূর্ণা :

রবীন্দ্র-উপন্যাসে পূর্ণাঙ্গ মাতৃ চরিত্রের সন্ধান পাওয়া যায় ‘গোরা’ উপন্যাসে। আনন্দময়ীর মাতৃত্ব দেশ-কাল-জাতির উর্ধ্বে দীপ্তিময়। এর পরবর্তী কালে ‘যোগাযোগ’ উপন্যাসে কুমুর মায়ের কথা জানা যায় এবং ‘শেষের কবিতা’ উপন্যাসে মাতৃ রূপে পাওয়া গেল যোগমায়াকে। আর ‘চোখের বালি’ উপন্যাসে মহেন্দ্রের মা রাজলক্ষ্মীর পাশাপাশি মাতৃ-স্নেহের দিক থেকে বাৎসল্যে সম্পূর্ণ মা হলেন মহেন্দ্রের কাকিমা অন্নপূর্ণা। অন্নপূর্ণার ভূমিকা খুব বেশি পরিসর জুড়ে নয় এবং কাহিনিতে বেশি ভূমিকাও নেই। তবুও অন্নপূর্ণা যেন সহযোগী চরিত্র হিসেবে গল্পের অনেক দায় মিটিয়েছেন। সংসারে অন্নপূর্ণা যেন অনেকটা সংকুচিত ও কুণ্ঠিত হয়ে বাস করেন। তবে মহেন্দ্র ও বিহারী দুজনেই তাকে বিশেষ ভাবে শ্রদ্ধা করে। রাজলক্ষ্মী কখনো কখনো অনপূর্ণাকে অকারণে পীড়া দিয়েছেন। নি:সন্তান অন্নপূর্ণা সেই মনোবেদনা সহ্য করেও মহেন্দ্র, বিহারী, রাজলক্ষ্মী সকলের জন্য উৎকণ্ঠিত ও কাতর হয়েছেন। আর মহেন্দ্র-আশার বিবাহের পর আশাকে আগলে রাখাও যেন তার কাজের মধ্যে পড়েছে। একসময় রাজলক্ষ্মী আশা-মহেন্দ্রের নির্লজ্জ দাম্পত্যের জন্য তাকে সরাসরি দোষারোপ করলে অন্নপূর্ণা বিশেষ অস্বস্তিতে পড়েছেন। আর নিজেকে পারিবারিক জটিল পরিস্থিতি থেকে মুক্ত রাখার জন্য কাশীযাত্রা করেছেন স্থায়ীভাবে বসবাস করতে। কিন্তু সেখানেও অন্নপূর্ণার মাতৃহৃদয়ের ব্যাকুলতার পরিচয় উদ্ভাসিত। তাই তার স্নেহস্পর্শ পেতে মহেন্দ্র, আশা এবং বিহারী সকলেই এক এক সময় কাশীতে উপস্থিত হয়েছে। এই ভাবে উপন্যাসে কোনো রকম জটিলতাহীন সরলরৈখিক অবস্থানে অনপূর্ণা চরিত্রের উপস্থাপন ঘটেছে।

বিনোদিনী :

উপন্যাসে শুরুতেই বিনোদিনী প্রসঙ্গ উচ্চারিত হয়েছে মহেন্দ্রের মা রাজলক্ষ্মী ও বিনোদিনীর মা হরিমতির কথোপকথনে। কিন্তু সে কথা সেখানেই থেমে গিয়েছিল, মহেন্দ্র কিংবা বিহারী কেউই বিনোদিনীকে বিবাহে রাজি হয়নি। এরপর বিনোদিনীর বিবাহ হয়েছে, কিন্তু সেই বিবাহিত জীবনের কথা উপন্যাসে স্পষ্ট হরনি। পুত্র ও পুত্রবধূর প্রতি তীব্র অভিমান-ক্ষোভে রাজলক্ষ্মী উপস্থিত তথা ইচ্ছাকৃত নির্বাসিত হয়েছেন জন্মভূমি

বারাসতে। সেখানেই পল্লিগ্রামের ছোটো সংসারের নিপুণ গৃহকর্মের মধ্য দিয়েই দিন কাটে সুন্দরী, বুদ্ধিমতী ও বিধবা যুবতী বিনোদিনীর। বিনোদিনীর আতিথ্য-সেবাপরায়ণতা রাজলক্ষ্মীকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করেছে। রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে আসা মহেন্দ্রের আবাল্য বন্ধু বিহারীও নারীর সেবাপরায়ণ রূপ দেখেছেন। এমন সময় রাজলক্ষ্মীর প্রত্যাশিত আহ্বান না এলেও দাম্পত্য প্রেমের গল্পে ভরপুর মহেন্দ্র চিঠি এসেছে বিহারীর নামে। এই চিঠিই বিনোদিনীকে বিচিত্র জীবন রসের সন্ধান দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ চিঠির প্রসঙ্গটি বর্ণনা করেছেন, "চিঠির মধ্যে কী পাইল বিনোদিনীই জানে। কিন্তু তাহা কৌতুকরস নহে। বার বার করিয়া পড়িতে পড়িতে তাহার দুই চক্ষু বালুকার মতো জ্বলিতে লাগিল, তাহার নিশ্বাস মরুভূমির বাতাসের মতো উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। মহেন্দ্র কেমন, আশা কেমন, মহেন্দ্রআশার প্রণয় কেমন, ইহাই তাহার মনের মধ্যে কেবলই পাক খাইতে লাগিল।" এখানেই রবীন্দ্রনাথ খুব স্পল্প পরিসরে দম্পতির প্রণয়-রূপের কল্পনার মধ্য দিয়ে বিনোদিনীর বঞ্চিত হৃদয়ে গভীর তৃষ্ণার ইঙ্গিত দিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি-কল্পনায় বার বার নারীর দুই রূপ প্রকটিত হয়েছে। যেখানে একজন সংসারে স্নিগ্ধ সান্ত্বনা পরিবেশন করছে, অন্যজন জ্বালাময়ী বিষ উদ্গীরণ করছে। উর্বশী সেই নারীর প্রতীক - যার এক হাতে সুধাপাত্র, অন্য হাতে বিষকুম্ভ। 'চোখের বালি' উপন্যাসের বিনোদিনীর মধ্যেও যেন এমন দুই রূপের সন্ধান মেলে। বিনোদিনীর সেবা পরায়ণা রূপে আকৃষ্ট হন রাজলক্ষ্মী, বিহারীও মুগ্ধ। কিন্তু বিহারীর অনুভবে স্পষ্ট যেন আগুন পবিত্র সন্ধ্যাদীপ জ্বালায়, তাই দাহিকা হয়ে ঘর জ্বালিয়া দিতে পারে। বিনোদিনী চরিত্রের মধ্যে সেই স্ববিরোধের অবস্থান ও আবর্ত দেখা যায়। একদিকে সে সেবাময়ী করুণামরী নারী, অন্য দিকে জীবনের চাওয়া-পাওয়ার হিসেব জ্বলন্ত পিন্ডের ন্যায় সংসারে আগুন জ্বালায়। একারণেই -এ প্রসঙ্গে বিহারীর অনভূতিকে সম্বল করেই বলা যায় - বিনোদিনীর প্রথম রূপ সে কল্যাণমী গৃহলক্ষ্মী; দ্বিতীয়ত চির অতৃপ্ত, বুভুক্ষু নারী, যার ঈর্ষা-বিষ জর্জরিত নি:শ্বাসে সংসারে প্রলয়ের আগুন প্রজ্বলিত হয়।

উপন্যাসের সপ্তম পরিচ্ছেদে রাজলক্ষ্মী জন্মভূমি বারাসতের বাড়িতে পৌছেছিলেন। আর উপন্যাসের দশম পরিচ্ছেদে দেখা গেল রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে কলকাতার বাড়িতে আগত বিনোদিনী মহেন্দ্রের স্ত্রী আশার সঙ্গে 'চোখের বালি' সম্পর্ক পাতিয়েছে।

বিনোদিনী বিবাহিত হলেও অকাল-বিধবা হবার জন্য জীবনে যথার্থ সম্ভোগ-সুখ থেকে বঞ্চিত। এমন কি প্রণয়মন্ত্রে পুরুষকে বশীভূত করার যে লীলা সে সুযোগও তার জীবনে আসেনি। আর মহেন্দ্রের সংসারে উপস্থিত হয়ে বুদ্ধিমতী-বিনোদিনী বুঝেছে মহেন্দ্রকে প্রণয়-পাশে বেঁধে রাখার কোনো ক্ষমতা নেই আশার। আশার কাছে মহেন্দ্র স্বেচ্ছাবন্দী এবং মহেন্দ্রের সেই প্রেমেই আশা গরবিণী। সেখানে প্রেমের লীলা খেলায় বিনোদিনী আশাকে প্রতিযোগিণীও ভাবতে পারে না। সুন্দরী, শিক্ষিতা, গৃহকর্মানিপুণা বিনোদিনী বালবিধবা তার ক্ষেত্রে চলার কিছু সামাজিক বিধি নিষেধ আছে। কিন্তু বিনোদিণী সেই বিধিনিষেধের পরোয়া করে না এবং সহজেই প্রণয়-খেলায় মত্ত হয়ে ওঠে। তবে এখানেও বিনোদিণীর চলা যথেষ্ট সাবধানী। প্রকাশ্যে নয়, মহেন্দ্র প্রথমত উদাসীনতার ভান করে তাকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল। আর বিনোদিনীও বিশেষ চঞ্চলতা দেখায়নি মহেন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য। কেননা তার স্থির বিশ্বাস সংসারে কিছুকাল থাকলেই মহেন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং সংযোগ ঘটবে। আর পরিচয় ও সংযোগের পর প্রকাশ্য ব্যভিচার নয় কিংবা প্রথমেই সামাজিক বিধানের কোপে পড়া নয়, চোরা পথে আনন্দ উপভোগ যেন বিনোদিনী একধরনের খেলা।

এক এক সময় বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের হীরার সঙ্গে বিনোদিনীর তুলনা করা হয়। হীরা তার প্রেমাস্পদকে অন্যাসক্ত দেখে অন্তরের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে দেবেন্দ্র ও কুন্দের বিনাশে উদ্যত হয়েছিল। বাল্যবিধবা হীরা নিজের অবস্থান ও কৃতকর্ম সম্পর্কে সচেতন থেকে নিজের লাগানো আগুনে নিজেই ভস্মীভূত হয়েছে। তবে তার আগে কুন্দের পরিণতিও সুগম করেছে। জীবনের সুষ্ঠু পাওয়া ও সিগ্ধরূপ তার কাছে অধরা ও অজ্ঞান ছিল। আর বিনোদিনী জীবনের সুন্দর রূপের সঙ্গে পরিচিত; শিক্ষিতা, রুচিশীলা এবং হীরার ন্যায় প্রতিহিংসাপরায়ণা নয়। কিন্তু বিনোদিনীর জীবনপিপাসা অতৃপ্ত এবং যে পুরুষের জন্য তার নারী-জীবনের সকল সুখে সে বঞ্চিত তাকে সে একটু বাজিয়ে নেবে।

এমন মানসিকতায় বিনোদিনী ক্রীড়াচ্ছলে প্রণয়-খেলায় মত্ত হয়েছে। কেননা যে সংসারে সে সর্বময় কর্ত্রী হতে পারত, সেখানে সে আশ্রিতা; আর সরলা আশা সেই আসন দখল করেছে। এমন ভাবনা থেকেই তার মনে উত্তেজনা সঞ্চারিত হয়েছে। সেই মনস্তাত্ত্বিক পরিস্থিতিতে বিনোদিনীর ভাবনা - "যে মহেন্দ্র তাহাকে তাহার সমস্ত জীবনের সার্থকতা হইতে ভ্রষ্ট করিয়াছে, যে মহেন্দ্র তাহার মতো স্ত্রী-রত্নকে উপেক্ষা করিয়া আশার মতো ক্ষীণবুদ্ধি দীনপ্রকৃতির বালিকাকে বরণ করিয়াছে, তাহাকে বিনোদিণী ভালবাসে কি বিদ্বেষ করে, তাহাকে কঠিন শাস্তি দিবে না তাহাকে হৃদয় সমর্পণ করিবে, তাহা বিনোদিণী ঠিক করিয়া বুঝিতে পারেননাই। একটা জ্বালা মহেন্দ্র তাহার অন্তরে জ্বালাইয়াছে, তাহা হিংসার না প্রেমের, না দুয়ের মিশ্রণ, বিনোদিনী তাহা ভাবিয়া পায় না; মনে মনে তীব্র হাসি হাসিয়া বলে, কোন নারীর কিআমার মতো এমন দশা হইয়াছে। আমি মরিতে চাই কি মারিতে চাই, তাহা বুঝিতেই পারিলাম না।" এখানে বিনোদিনীর মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের অভূতপূর্ব প্রকাশ ঘটেছে। চরিত্রের মনোলোকের এমন দ্বন্দ্বময় বিশ্লেষণ রবীন্দ্রপূর্ব উপন্যাসে কোথাও দেখা যায়নি।

বিনোদিনী দ্বৈত সত্তাতে বিভক্ত। একারণে তার রুদ্ধ অন্তরের সঠিক গতি সে অনুধাবন করতে পারেনি। বিহারী যেমন তার সম্পর্কে ভেবেছিল - "...এ নারী জঙ্গলে ফেলিয়া রাখিবার নহে। কিন্তু শিখা একভাবে ঘরের প্রদীপ রূপে জ্বলে, আর এক ভাবে ঘরে আগুন ধরাইয়া দেয় ...।" বিনোদিনীর অন্তরের দাহিকাশক্তি নিয়েই বিহারীর মনে সংশয় ছিল। তবু বিনোদিণীর সেবা পরিচর্যা এবং অন্তরের উন্মীলনে কল্যাণী রূপের সন্ধানে বিহারীর মনে হয়েছে – " বিনোদিনী বাহিরে বিলাসিনী যুবতী বটে, কিন্তু তাহার অন্তরে একটি পুজারতা নারী নিরশনে তপস্যা করিতেছে।" নারীর স্বাভাবিক হৃদয়বোধে বিনোদিনীর মধ্যে একধরণের অতৃপ্ত প্রণয় পিপাসা ছিল। তাই খেলার ছলে হলেও নিপুন অভিনয় কলার বিনোদিনী মহেন্দ্রে উপর আধিপত্যের জাল বিস্তার করেছে। এমন সময় বিহারীর ক্রুদ্ধভাবে বিনোদিনীকে মহেন্দ্র প্রসঙ্গে ভুল বোঝা ও অবহেলার প্রত্যাখ্যান বিনোদিনীর অন্তরে করতে গিয়ে ব্যথিত এবং ক্রোধান্বিত হয়ে উঠেছে। উপন্যাসে বিনোদিনীর এই মনোভাবের পরিচয় দিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন- "প্রতিকূল ভাগ্য বশত

বিনোদিনী আপন প্রতিভাকে কোনো পুরুষের চিত্ত ক্ষেত্রে অব্যাহত ভাবে জয়ী করিতে না পারিয়া জ্বলন্ত শক্তিশেল উদ্যত করিয়া সংহার মূর্তি ধরিল।”

মহেন্দ্র গদ গদ কণ্ঠে বিনোদিনীকে প্রেম নিবেদন করেছে এবং বিনোদিনী যাতে মহেন্দ্রকে প্রত্যাখ্যান না করে এমন আবেদন জানিয়েছে। অন্তরের কাঙালিপনাকে স্পষ্ট করেনি বিনোদিনী, মহেন্দ্রকে দূরে সরিয়ে রাখতে চেয়েও কাছে রেখেছে। রাজলক্ষ্মীর শানিত আক্রমণ ক্ষণকালের জন্য বিনোদিনীকে বিমূঢ় করলেও সে স্পষ্ট ভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন ‘মায়াবিনী’ একা বিনোদিনীই নয়। তবে বিনোদিনীর মূল আশ্রয় মহেন্দ্র নয়, বিহারী । অন্যদিকে মহেন্দ্র কৌশল জানতে পারেনি বিনোদিনীর। তাই বিনোদিনীর পত্র বিহারীর বাসা থেকে ফেরৎ এসেছে। বিনোদিনীর প্রেম যেন নতুন ভাবে প্রত্যাঘাত হল। রবীন্দ্রনাথ এই প্রত্যাখানের জ্বালা প্রসঙ্গে লিখেছেন - “ক্রুদ্ধা মধুকরী যাহাকে সম্মুকে পায় তাহাকে দংশন করে, ক্ষুধা বিনোদিনী তেমনি তাহার চারিদিকের সমস্ত সংসারটাকে জ্বালাইবার জন্য প্রস্তুত হইল।” এমন ভাবে মর্মান্তিক প্রত্যাখানের বেদনায় জর্জরিতা বিনোদিনী আত্মবিস্মৃতা হয়ে উন্মত্ত ভাবে মহেন্দ্রকে সঙ্গে পশ্চিমে যাত্রা করেছে। মহেন্দ্রকে আশ্রয় করে বিনোদিণী গৃহ ছাড়লেও মহেন্দ্রের কাছে সম্পূর্ণ ভাবে ধরা দেয়নি এবং বুঝিয়ে দিয়েছে বিনোদিনীর হৃদয় সিংহাসনে অন্যপুরুষ অবস্থান করেছে। এখানে বিনোদিনী নারী-ব্যক্তিত্বের স্বাতন্ত্র্য।

মহেন্দ্র:

‘চোখের বালি’ উপন্যাসের নায়িকা এবং কেন্দ্রীয় চরিত্র যদি বিনোদিনী হয় তবে প্রধান পুরুষ তথা নায়ক চরিত্র অবশ্যই মহেন্দ্র। কলকাতার এক সভ্রান্ত বংশের ধনী সন্তান মহেন্দ্র খুব অল্প বয়সে এম.এ. পাস করে ডাক্তারি পড়ছে। তার আবাল্য বন্ধু বিহারী যেন ঘনিষ্ঠতায় পরিবারিক সদস্য হয়ে উঠেছে। বিধবা মায়ের একমাত্র সম্বল এবং অবলম্বন মহেন্দ্র, বলা যেতে পারে মা রাজলক্ষ্মীর গর্ব মহেন্দ্র। তার চরিত্রের মধ্যে মাতৃ চরিত্রে প্রাধান্যের পরিপ্রেক্ষিত স্বভাবের আত্মকেন্দ্রিকতা বিশেষ ভাবে চোখে পড়ে। তার চরিত্রের প্রধান ত্রুটি সম্পর্কে লেখক প্রথমেই পাঠককে সচেতন করিয়ে দিয়েছেন। মহেন্দ্র জীবনে বিশেষ জটিলতা ও তার সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে বিনোদিনী কলকাতায় আগমনের পর।

মহেন্দ্র ও বিনোদিনীর সম্পর্ককে কেন্দ্র করেই উপন্যাসের কাহিনিতে মনস্তাত্ত্বিক সংকট সৃষ্টি হয়েছে, তেমনি ভাবে মহেন্দ্রের নির্মম গ্লানিময় পরাভব দেখা গেছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে দেখা যায় নায়ক ধনাঢ্য জমিদার নগেন্দ্রনাথের চিত্ত-সংযম ছিল না বলেই কুন্দনন্দিনীকে বিবাহ করেছিল। এর কারণ হয়তো নগেন্দ্রের চিত্ত সংযমের প্রয়োজন হয়নি। অন্যদিকে ‘চোখের বালি'র মহেন্দ্রও নগেন্দ্রের ন্যায় চিত্ত সংযমহীন পুরুষ। প্রাক্ বিবাহ পর্বের মহেন্দ্রের পরিচয় দিতে গিয়ে উপন্যাসে প্রথম পরিচ্ছেদেই উল্লিখিত হয়েছে - “বাল্যকাল হইতে মহেন্দ্র দেবতা ও মানবের কাছে সর্বপ্রকারে প্রশ্রয় পাইয়াছে, এইজন্য তাহার ইচ্ছার বেগ উচ্ছৃঙ্খল। পরের ইচ্ছার চাপ সে সহিতে পারে না। তাহাকে নিজের প্রতিজ্ঞা এবং পরের অনুরোধ একান্ত বাধ্য করিয়া তুলিয়াছে বলিয়াই বিবাহ প্রস্তাবের প্রতি তাহার অকারণ বিতৃষ্ণা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল এবং আসন্নকালে সে একেবারেই বিমুখ হইয়া বসিল।” এ হেন মহেন্দ্র প্রথমে তীব্র আপত্তি ও অমত করাতেই বিহারীর সঙ্গে আশালতার বিবাহের ঠিক হয়েছে। অথচ আশাকে দেখেই মহেন্দ্র বিবাহ করার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠল - যা অসংযমের পরিচায়ক।

মহেন্দ্র-আশার দাম্পত্য সম্পর্কের বাড়াবাড়ি রকমের কার্যকলাপের প্রতি বিরক্ত হয়ে অভিমানাহত রাজলক্ষ্মী বারাসতের গ্রাম্য জীবনে স্বেচ্ছা নির্বাসিত হয়েছিলেন। সেখানে বিনোদিনীর সেবায় তুষ্ট হয়ে এবং ঈর্ষা পোষণ করে তাকে সঙ্গে নিয়েই রাজলক্ষ্মী কলকাতায় প্রত্যাবর্তণ করেছিলেন। মহেন্দ্র গ্রাম্য বিধবা যুবতীকে সংসারের বৃত্তে নিয়ে আসা বিষয়টিকে একেবারেই সমর্থন করেনি। এ সময় বুদ্ধিমতী বিনোদিনী আশার সঙ্গে সহজ সখিত্বের সম্পর্কে নিজের অবস্থান পাকা করেছে। তাই আশার মধ্যস্থতাতেই মহেন্দ্র ও বিনোদিনীর প্রাথমিক পরিচয় পর্ব সমাধা হয়েছে। আর আশার বকলমে পত্র রচনার মধ্য দিয়ে বিনোদিনীর সঙ্গে মহেন্দ্র ধীরে ধীরে আকর্ষণে গভীর হয়েছে। আর মহেন্দ্রের সেই আকর্ষণ স্পষ্ট রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে বিনোদিনীর তত্ত্বাবধানে মহেন্দ্রকে রেখে আশা কাশী চলে যাওয়ার পর। একসময় মহেন্দ্র বিনোদিনীকে সংসারের উপদ্রব বলে ভেবেছিল অথচ মহেন্দ্র বিনোদিনীর প্রতি গভীর ভাবে আগ্রহী ও আসক্ত হয়ে পড়েছে। একারণে ঔপন্যাসিক মহেন্দ্রের মনস্তাত্ত্বিক স্বরূপ সম্পর্কে লিখেছেন- “হৃদয়ের সম্পর্ক

সম্বন্ধে মহেন্দ্রের উচিৎ-অনুচিতের আদর্শ সাধারণের অপেক্ষা কিছু কড়া। পাছে মাতার অধিকার লেশ মাত্র ক্ষুন্ন হয়, এইজন্য ইতিপূর্বে সে বিবাহের প্রসঙ্গমাত্র কানে আনিত না। আজকাল, আশার সহিত সম্বন্ধকে যে এমনভাবে রক্ষা করিতে চায় যে, অন্য স্ত্রীলোকের প্রতি সামান্য কৌতুহলকেও সে মনে মনে স্থান দিতে চায় না। প্রেমের বিষয়ে সে যে বড়ো খুঁত খুঁতে এবং অত্যন্ত খাঁটি, এই লইয়া তাহার মনে একটা গর্ব ছিল। ... সেই মহেন্দ্রের মন আজকাল যখন মাঝে মাঝে অনিবার্য ব্যগ্রতা ও কৌতুহলের সহিত এই অপরিচিতার প্রতি আপনি ধাবিত হইতে থাকিত তখন সে নিজের আদর্শের কাছে যেন খাটো হইয়া পড়িত।" এখানেই মহেন্দ্রের মনোলোকের পরিবর্তনের স্তর পরম্পরাটি স্পষ্ট হয়েছে। মহেন্দ্র এতদিনের ভাবনা থেকে সরে এসেছে বিনোদিনীকে দেখে। বিনোদিনীর প্রতি তার আকর্ষণকে সে কিছুতেই দমন করতে পারেনি।

উপন্যাসের মহেন্দ্র দ্বিধা জড়িত নায়ক। একদিকে জীবনকে উপভোগ করার অদম্য বাসনা, অন্যদিকে ভোগের সামগ্রী হাতের কাছে পেয়েও দ্বিধান্বিত। এমন সময় বিনোদিনী স্পষ্ট করে বলেছে প্রেমাস্পদ বিহারীর অন্বেষণেই সে মহেন্দ্রের সঙ্গে প্রবাসের পথে যাত্রা করেছে। বিনোদিনীর কাছে মহেন্দ্র যেন স্পষ্ট, তার কাছ থেকে কোনো ক্ষতির সম্ভাবনা নেই। মোহভঙ্গে তীব্র আবর্তে মহেন্দ্র বিনোদিনীর কাছে বিদায় প্রার্থনা করেছে এবং ভাঙা-মন নিয়েই সংসার প্রত্যাবর্তন করেছে। হতাশ প্রেমিক মহেন্দ্র মোহমুক্তির পরও অবসাদ কাটিয়ে উঠতে পারেনা। কিন্ত শেষ পর্যন্ত মহেন্দ্রের মোহভঙ্গ ও স্বাভাবিকতায় উত্তরণ চরিত্রটিকে একধরনের বিশ্বাসযোগ্যতা দিয়েছে।

বিহারী :

উপন্যাসে বিহারী চরিত্রের অবস্থান ও পরিণতি সম্পর্কে তার সংসারবোধহীনতা এবং আত্মপ্রকৃতির ছায়ায় আচ্ছন্ন দৃষ্টিকে মর্যাদা দিয়েই ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন - "বিহারী পুন: পুন: আঘাতেও তাহার আত্মভোলা নিরাসক্ত স্বভাবটি হারায় নাই, বরং তাহার আদর্শনিষ্ঠাই তাহার ভবিষ্যৎ জীবনচর্যার চিরন্তন আশ্রয়রূপে কর্মসাধনায় পরিব্যপ্ত হইয়াছে। জীবনকে পূর্বে যে ত্যাগ-বৈরাগ্যের নির্দেশ সে মানিয়া লইয়াছিল, পরবর্তী অভিজ্ঞতা তাহার সেই সহজ প্রবণতাকেই সমর্থিত ও দৃঢ়ীভূত করিয়াছে।" (রবীন্দ্র সৃস্টি

সমীক্ষা ২য় খণ্ড) আদর্শ নিষ্ঠা ও নিরাসক্ত মনের বিশেষ প্রকাশ দেখা গিয়েছে উপন্যাসের প্রথম ভাগেই। কাহিনির আরম্ভেই ঔপন্যাসিক বিহারীর পরিচয় প্রসঙ্গে পাঠককে জানিয়ে দিয়েছেন, “মহেন্দ্র পরমবন্ধু ছিল বিহারী; সে মহেন্দ্রকে দাদা এবং মহেন্দ্রের মাকে মা বলিত। মা তাহাকে স্টীমবোটের পশ্চাতে আবদ্ধ গাধা বোটের মতো মহেন্দ্র একটি আবশ্যক ভারবহ আসবাবের স্বরূপ দেখিতেন ও সেই হিসাবে মমতাও করিতেন।” তার উদারতার পরিচয় পাই আশাকে বিবাহ করতে চাওয়া এবং মহেন্দ্র বিবাহের জন্য উন্মুখ হলে বিবাহের সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসার মধ্য দিয়ে। তবে বিহারীর আত্মাভিমানে আঘাত লেগেছে, তা বোঝা যায় তখন কাকিমা অন্নপূর্ণাকে জানিয়ে দেয় বিবাহের অনুরোধ যেন তাকে আর না করা হয়।

মহেন্দ্র-আশার দাম্পত্য সুখ বিহারীর অন্তরে কোনো ঈর্ষার প্রদাহ সৃষ্টি করেছিল কিনা তা অন্তত লেখকের বর্ণনা থেকে স্পষ্ট হয়নি। তবে মহেন্দ্র এবং তার সঙ্গে হয়তো আশা মনে মনে সন্দেহ জেগেছিল বিহারী তাদের সুখে হিংসা করে। তবে বিহারীর মধ্যে এই লক্ষণ ফুটে ওঠে নি। বরং সতর্ক দৃষ্টিতে মহেন্দ্র বিনোদিনী আশার সম্পর্কের প্রতি লক্ষ রেখে বিহারী বিনোদিনীকে বলেছে - “বিনোদ-বৌঠান, এই ছেলেটিকে ইহার মা মাটি করিয়াছে, বন্ধু মাটি করিয়োছে, স্ত্রী মাটি করিতেছে - তুমিও সেই দলে না ভিড়িয়া একটা নূতন পথ দেখাও - দোহাই তোমার।” বুদ্ধিমতী বিনোদিনী বিহারীর ঈঙ্গিতটুকু বুঝেছে এর সঙ্গে স্পষ্ট হয়েছে আশার প্রতি বিহারীর সংগুপ্ত অনুরাগ কতটা গভীর। তাতে বিহারী মহেন্দ্র, আশা এবং বিনোদিনী - সকলের বিরাগভাজন হয়েই সংসার থেকে কাশীতে কাকিমা অন্নপূণার সাক্ষাৎ করতে গেছে এবং সেখান থেকে বিতাড়িত হয়ে কার্যত দিশাহারা হয়ে গঙ্গার ধারে নির্জন বাসের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

বিহারী স্বভাব-ঔদাসীন্যে কিংবা ঔদার্যে গভীর চাওয়া পাওয়ার প্রাবল্যে বিশ্বাসী নয়। বিশিষ্ট সামাজিকতার দৃষ্টিতে বিধবা যুবতী বিনোদিনীকে সম্মান করে, কিন্তু প্রেয়সী ভাবতে পারে না। অথচ বিনোদিনী মুহূর্তে বিহারীর গলদেশ বেষ্টন করে ওষ্ঠাধার এগিয়ে নিয়ে এসেছে। বিহারী তা চরম ভাবে প্রত্যাখান করলেও তার অন্তরে যৌবনানন্দের যে সূত্রপাত হল, তা থেকে নিজেকে দূরে সরাতে পারেনি। বিহারীর অন্তরের গভীরে যে

যৌবন নিশ্চল ভাবে সুপ্ত হয়েছিল, বিনোদিনীর সোনার কাঠির স্পর্শে তা জেগে উঠেছে। এই অনাস্বাদিত পূর্ব যৌবন জ্বালা বিহারীকে যেমন অস্থির করে তুলেছে, তেমনি আত্মনির্ভর পরিপূর্ণ করে তোলারও সহায়ক হয়েছে। বিনোদিণীর আকুল প্রার্থনা বিহারীর কাছে - "একেবারে পাথরের দেবতার মতো পবিত্র হইয়ো না। মন্দকে ভালবাসিয়া একটুখানি মন্দ হও।" যে বিহারী নিজের মনকে এত গভীরভাবে বিশ্লেষণ করেনি, বিনোদিনীর আকুল আহবানে বিহারীর অন্তর জগতের পরিবর্তন ঘটেছে। পশ্চিমের ক্ষুদ্র কক্ষে বিনোদিনীর প্রতি উদ্দীপ্ত ও উদ্ধত মহেন্দ্রের অমর্যাদাকর আচরণের মুহূর্তে এক লহমায় বিহারীর পৌরুষের জাগরণ ঘটেছে। তাই মহেন্দ্রকে দমন করতে বিহারী বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করেছে - "মহেন্দ্র, বিনোদিনীকে আমি বিবাহ করিব, তোমাকে জানাইলাম, অতএব এখন হইতে সংযত ভাবে কথা কও ।"

আপাত ভাবে মনে হতে পারে বিহারী অন্তর্লোকের গভীর প্রেম আশাকে সংসারের দুর্গে নিষ্কন্টক ও সুরক্ষা করার অন্য কোনো উপায় না দেখে এভাবেই বিনোদিনীকে আশা-মহেন্দ্রর জীবনবৃত্ত থেকে সরিয়ে দিতে চেয়েছে। সেক্ষেত্রে বিনোদিণীকে বিবাহের প্রস্তাব দিয়ে বিনোদিনীকে যে সামাজিক সম্পর্কের বন্ধকে বাঁধতে চেয়েছেন তা নিছক মুখের কথা নয়, এই সম্পর্কের বন্ধনকে কোনো ভাবে নাকচ করার উপায় ছিল না, অথচ বিনোদিনী বিহারীর বিবাহ দেখা গেল না। বিহারী শেষ পর্যন্ত সংসারের হিতকারী বন্ধু রূপেই থেকে গেল। আর বিনোদিনীও তারই আঘাত-চিহ্নকে বিশেষ স্মারক চিহ্ন হিসেবে অঙ্গে গ্রহণ করে কাকিমা অন্নপূর্ণার সঙ্গে এবং আশ্রয় স্থান পেয়েছে কাশীতে। বিহারীর কাছে এই ব্যবস্থা শুধু গ্রহণযোগ্য নয়, অতি উত্তম ব্যবস্থা। সেখানে বিহারী উপন্যাসের কাহিনির শেষ বিন্দু পর্যন্ত অ-নায়ক বা বিকল্প নায়ক-ই থেকে যায়।

আশালতা :

উপন্যাসের তেত্রিশ সংখ্যক পরিচ্ছেদে মহেন্দ্রের এবং প্রেম প্রসঙ্গে নিজের মনোভাবস্পষ্ট করেছেন বিনোদিনী। তাই মহেন্দ্রকে একটি চিঠিতে লিখেছে - "জগতে আমার ভালোবাসিবার এবং ভালোবাসা পাইবার কোন স্থান নাই। তাই আমি খেলা খেলিয়া ভালোবাসার খেদ মিটাইয়া থাকি। যখন তোমার অবসর ছিল, তখন সেই মিথ্যা খেলায়

তুমিও যোগ দিয়াছিলে। কিন্তু খেলার ছুটি কি ফুরায় না। ঘরের মধ্যে তোমার ডাক পড়িয়াছে, এখন আবার খেলার ঘরে উকিঝুঁকি কেন। এখন ধুলা ঝাড়িয়া ঘরে যাও। ... ভালোবাসার তৃষ্ণা আমার হৃদয় হইতে বক্ষ পর্যন্ত শুকাইয়া উঠিয়াছে সে তৃষ্ণা পূরণ করিবার সম্বল তোমার হাতে নাই, সে আমি ভালো করিয়াই দেখিয়াছি।" লক্ষণীয় মহেন্দ্র প্রেম অপটু সরলা বধূর কাছে সহযোগিতা না পেয়ে বিনোদিনীর সান্নিধ্যে সুখী হয়েছিল। তবু শেষ পর্যন্ত যে সরলা আশার কাছেই ফিরে গেছে। সরলতাই আশার অলংকার বা ভূষণ সংসার-চক্রের জটিল আবর্তের মধ্যে বেদনার্ত হয়েও আশা পরিবারের যোগ্য আসনে অধিষ্ঠিত থেকেছে।

কাহিনির শুরুতে জানা গেল অন্নপূর্ণা তার পিতৃমাতৃহীন বোনঝি আশার বিবাহের জন্য বিহারীকে বলেছেন।

বিহারীও সাগ্রহে পাত্রী না দেখেও বিবাহে মত দিয়েছে। জ্যাঠামশায়ের সংসারে পালিতা আশালতার স্বাধীন ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠেনি কোনো ব্যাপারেই। তাই পাত্র নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিহারী বদল হয়ে মহেন্দ্র হলে তার কোনোরকম প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি কারণ সে কাউকেই চেনে না। সংসারের মধ্যে প্রকৃত স্নেহ-বঞ্চিত ভিরু কিশোরী লেখকের অভিপ্রায়ে জায়াসত্তার গন্ডীতে সীমাবদ্ধ স্বাধীন ইচ্ছার অধিকারেও গন্ডী ছাড়াতে পারেনি সে। তবে লক্ষণীয়, এই সংসারের অনভিজ্ঞা বধূর প্রতি সহানুভূতি ও সমবেদনার বাতাবরণ দেখা গেছে রাজলক্ষ্মী ছাড়া অন্যদের মনে। আশার জীবনের সকল পরিস্থিতিতে মাসিমা অন্নপূর্ণার আশীর্বাদ রক্ষাকবচের কাজ করেছে। অন্যদিকে বিহারীও তাকে সর্বদা সতর্ক দৃষ্টিতে সকল বিরুদ্ধ পরিস্থিতিতে রক্ষার প্রয়াস চালিয়েছে। সাধারণ মানবসংসারে বধূর মধ্যে আনুগত্য, স্বামী প্রেম, কর্তব্যবোধ এবং আত্মস্বাতন্ত্য - এই গুণগুলি থাকলেই বিশেষত্ব ফুটে ওঠে। আশার মধ্যে অন্য সকল গুণ থাকলেও আত্মস্বাতন্ত্র্যের চিহ্ন ছিল না, যা তাকে বিপর্যস্ত করেছে। তবে স্বামী ও শীশুড়ি দু-পক্ষকেই সন্তুষ্ট রেখে সংসারের কেন্দ্রবর্তিনী হতে গেলে নারীর যে নমনীয়তা গুণ থাকা দরকার তা আশার মধ্যে যথেষ্ট ছিল। সংসারের জটিলতা সম্পর্কে অনভিজ্ঞা আশা সরল অন্তঃকরণে সংসারের সকলের

প্রতি বিশ্বাস রাখতে গিয়ে ঠকেছে। বিশেষ করে মহেন্দ্রের দিক থেকে এবং বিনোদিনীর দিক থেকে।

মহেন্দ্রের বধূ হিসেবে আশা গভীর প্রেম, বিশ্বাস ও আনুগত্য দিয়েই দাম্পত্য জীবনের সুচনা করেছিল। এই আনুগত্য ছিল স্বামীর প্রতি তথা প্রেমের কাছে, সখিত্বের কাছে এবং সংসারের গুরুজন গৃহকত্রীর কাছে। মহেন্দ্রের মধ্যে কোনোরকম ফাঁকি থাকতে পারে আশা ভাবতে পারেনি। পরিবর্তে তার মনে হয়েছে গুণহীনা আশার প্রতি মহেন্দ্রের অকৃপণ ভালোবাসা যোলআনাই খাঁটি। সেখানে বিনোদিনীকে নিয়ে তার অন্তরে কোনরকম সংশয়ের কালো মেঘ ঘনায়িত হয়নি। আশাকে মধ্যেখানে রেখে বিনোদিনী যে চোরা আনন্দে শিহরিত হচ্ছে তা বুঝতে পারার মতো টনটনে জ্ঞান আশার ছিল না। কিন্তু মহেন্দ্র ও বিনোদিনীর মধ্যে ইঙ্গিতপূর্ণ কথোপকথনে কিংবা আশার বয়ানে পত্র রচনার উৎসাহ থেকেও আশা কিছু আঁচ করতে পারলনা - তা আমাদের আশ্চর্য করে । এমনই এক পরিস্থিতিতেই আশার অকপট বিশ্বাসের সুযোগে মহেন্দ্র-বিনোদিনীর নৈকট্য সূচিত হল। তবে সংসারের জটিল পরিস্থিতিতে সরলা আশা পা ছুড়িরে কাঁদতে বসেনি। নিপুণ প্রেম পটিয়সী বিনোদিনীর আকর্ষণ-মোহে মহেন্দ্র গৃহত্যাগ করলেও আশা পুত্রবিচ্ছেদে কাতর মায়ের কাতরতা দেখে নিজের অন্তর বেদনাকে চেপে রেখে শাশুড়ির সেবা ও পরিচর্যায় নিজেকে নিবিষ্ট করেছে। এই অবসরে শাশুড়ি সেবার ফাঁকে পারিবারিক দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে আশা ক্রমে সপ্রতিভ এবং পরিণত হয়ে উঠেছে। সেখানে বিহারীর সঙ্গে কথা বলতে তার কোনো সংকোচ নেই। বরং বিহারীই তার পরামর্শ করার একমাত্র ভরসাস্থল। সেই কর্তৃত্বের গুণেই মহেন্দ্রকেও দৃঢ় চিত্তে মায়ের ঘরে ঢুকতে নিষেধ করেছে আশা। এই ভাবেই উপন্যাসের শেষবিন্দুতেও আশা সংসারের যথার্থ পরিণত বিত্তের গৃহবধূ। আশা চরিত্রটির বিকাশ সঙ্গত এবং আঘাতের মধ্যে দিয়ে তার পরিণত ব্যক্তিত্বে উত্তরণও বিশ্বাসযোগ্য।

৩.৪। চোখের বালির মনস্তাত্ত্বিকতা

কবি রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্যের চর্চা যেন একটা স্বতন্ত্র ভাবনার পরিচায়ক। রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্য প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন- “কবিতায় আর

উপন্যাসে যে ব্যবধান তাতে বিরোধের আভাস পাওয়া যায়।... তার কারণ শুধু রূপের- form এর - ভিন্নতা নয়; কথাটা এই যে কবিতা লিখতে, এবং আধুনিক অর্থে উপন্যাস লিখতে, দুই আলাদ জাতের মনের প্রয়োজন। পার্থক্যটা খুব সহজ করে বলা যায় এইভাবে যে, কবির মন অন্তর্মুখী আর ঔপন্যাসিকের মন বহির্মুখী ... অবশ্য কোনো মানুষই শুধু অন্তর্মুখী বা শুধু বহির্মুখী হতে পারে না, সকলের মধ্যেই দুয়েরই অংশ মিশ্রিত থাকে, সেই মিশ্রণের মাত্রাভেদেই কেউ পান কবি-স্বভাব, কেউ বা কথকের আর স্বল্পসংখ্যক কেউ কেউ উভয় বিভাগেই আনাগোনা করেন।" (রবীন্দ্রনাথ : কথাসাহিত্য) এখানে 'আধুনিক অর্থে উপন্যাস'-এর ভাবনা সুস্পষ্ট না হলেও বলা যায় বহির্মুখীন ও অন্তর্মুখীন উভয় সত্তার মিলনেই রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসিক সত্তার যথার্থ বিকাশ ঘটেছে। যেখানে তিনি তথ্যগত বাস্তবতার সীমা ছাড়িয়ে মানবচেতনা গহনে আলোকপাত করে মনোজগতের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন। তাঁর 'চোখের বালি' উপন্যাসের আধুনিকতা এখানেই - মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার প্রকাশ।

মানুষের অন্ত:প্রকৃতির দুরূহ জটিল স্বরূপ চোখের বালি উপন্যাসের আখ্যান হয়ে উঠেচে। মানবহৃদয়ের আপাত দৃষ্টিগোচর হীন সূক্ষ সূক্ষ অলিন্দে আলোকরশ্মি ক্ষীণ আভাস ফুটে উঠলে দেখা গেল তার জটিল রূপ। উপন্যাসের কাহিনির প্রথম ভাগে বিহারী মহেন্দ্র বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ, সেখানে আশাকে বিবাহ করা হয়ে সামান্য হলেও তাতে বিচ্ছেদের সুর ধ্বণিত হয়েছিল। অন্যদিকে মহেন্দ্র -আশার দাম্পত্য প্রণয়ের আতিশয্য রাজলক্ষীর পীড়ার কারণ হয়েছে এবং পুত্র ও পুত্রবধূর প্রতি অভিমান নিয়েই রাজলন্ষ্মী বারাসতে উপস্থিত হয়েছেন। এদিক থেকে রাজলক্ষীর মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা অভিমান ক্ষুব্দ হৃদয়ের একধরনের ঈর্ষা থেকে জাত হয়েছে। রাজলক্ষী বারাসতের জীবনে সুন্দরী, বুদ্ধিমতী, কর্মনিপুণা বিধবা বিনোদিনীর সেবা-পরিচর্যায় বিশেষভাবে খুশি হয়েই তাকে কলকাতার বাড়িতে নিয়ে আসার কথা ভেবেছেন। আবার এমন ভাবনীও প্রকাশ করেছন মহেন্দ্রের বৌ হলে বিনোদিনীকে তিনি মাথায় করে রাখতেন। এমন এক দোটানায় বিনোদিনীর কলকাতার নাগরিক জীবনের অধ্যায় শুরু হয়েছে। উপন্যাসের কাহিনিতেও শুরুও হয়েছে মানবহৃদয়ের টানাপোড়েনের নতুন অধ্যায়। হয়তো রাজলক্ষী বিনোদিনীকে মহেন্দ্রের

সামনে উপস্থিত করে আশার বাহুবন্ধন থেকে মহেন্দ্রকে সরিয়ে আনতে চেয়েছেন। অন্যদিকে আশার সঙ্গে বিনোদিনীর সহজভাব জন্মালেও মহেন্দ্র বিনোদিনীর ব্যাপারে একেবারেই উদাসীন থেকেছে। মহেন্দ্র এই অকারণ উদাসিন্য বিনোদিনীর মনে গূঢ় অভিমানের বীজ বপন করেছে এবং যা উপন্যাসের কাহিনি ভাগে ভবিষ্যৎ সমস্যার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে।

বিনোদিণীর মানসলোকে ঝড় বয়ে চলেছে অহরহ জীবন ও যৌবনের কাছে সর্বক্ষণের পাওনা জমা হয়ে গেছে কিন্তু সামাজিক বিধি ও বিধান তার কাছে সহজ্যে কিছু পাওনা মিটিয়ে দেবে না। তবুও তো মহেন্দ্রের চিঠি পড়তে পড়তে বিনোদিনীর চোখ জ্বলে না পাওয়ার বেদনা অন্তরে বিদ্রোহ করে ওঠে। এখানেই তো মানস লীলার সূচনা, তাকেই ঈন্ধন জুগিয়েছে রাজলক্ষ্মীর ঈর্ষা। বিনোদিনী সুকৌশলে মহেন্দ্রকে ঘুরিয়ে নিয়েছে, শুরু করেছে প্রণয়ের-সর্বনাশা খেলা। সেখানে আশা নেহাৎ বালিকা তার বোধের বাইরে বিনোদিনীর প্রেম-পটুতার নির্মম খেলা। সম্ভবত মহেন্দ্র-বিনোদিনীর সম্পর্কের পরিণতি বিষয়ে রাজলক্ষ্মীরও কোনো স্পষ্ট ধারণা ছিল না। একারণে মহেন্দ্রের পরিণতি ও সংসারের ভাঙনের বিনোদিনীকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে তিরস্কার করেছেন। সেখানে বিনোদিনী স্পষ্টতই মনোলোকের গোপন চাহিদা সম্পর্কে জানিয়ে দিয়েছে “সে কথা ঠিক পিসীমা, কেহ কাহাকেও জানো না। নিজের মনও কি সবাই জানে। তুমি কখনও তোমার ছেলের মন ভোলাইতে চাহ নাই? একবার ঠাওর করিয়া দেখ দেখি।” এতদিন রাজলক্ষ্মী সংসারকে দেখছিলেন ঈর্ষার মুদিত চোখে, পূর্ণায়ত দৃষ্টি ছিল না।

‘চোখের বালি’ উপন্যাসের মূল কাহিনিতে মনস্তত্ব যে জটিলতা সৃষ্টি করেছে তা মূলত বিনোদিনী কেন্দ্রিক, কিছুটা হলেও মহেন্দ্রকে ঘিরে আবর্তিত। তবে দেবতা ও মানব সর্বজায়গায় বিশেষরূপে প্রশ্রয় প্রাপ্ত মহেন্দ্রর মনোলোকের গঠন অসম্পূর্ণ ও অপরিণত। একারণেই কাকিমার বোনঝিকে প্রথম বিবাহে অসম্মত হয়েও বিহারীকে অপসারিত করে বন্ধুত্বকে অপমানিত করে আঘাত করেও বিবাহের জন্য পণ করেছে। আবার মহেন্দ্রর-আশার দাম্পত্য জীবনকে প্রথম সুখী দম্পতির নিদর্শন বলে মনে হয়েছে, কিন্তু তা যে কতটা ঠুন্‌কো বিনোদিনী এলেই বোঝা গেল। আর বিনোদিনী মহেন্দ্র যথার্থ চিনেছে এবং

স্পষ্ট করে দিয়েছে মহেন্দ্র কাউকে ভালবাসেনি এবং ভালবাসার মত মন মহেন্দ্রের নেই। আত্মপ্রীতিতে মহেন্দ্র এতটা মশগুল অন্যকে ভালবাসা তার পক্ষে সম্ভব নয়। একারণেই বিনোদিনীর হৃদয়লোকে বিহারীর স্থান জেনে অকারণ ঈর্ষা জ্বলেছে, সুরাহার সঠিক পথ সন্ধান করতে পারেনি। আর বিনোদিনী সূক্ষ্ম মনোলীলার আপাত অবলম্বণ মহেন্দ্র হলেও মূল আকর্ষণ বিহারী। বিহারীর ঘৃণা, প্রত্যাখাণও বিনোদিনীকে পিছিয়ে দিতে পারেনি।

মহেন্দ্র-বিনোদিনীর প্রণয়-খেলার কাহিনিতে ঘাত-প্রতিঘাতের নিষ্ঠুরতা আছে, গ্লানিকর হয়ে উঠেছে উভয়ের প্রেমহীন, প্রবাস-জীবন। বিনোদিনীর পায়ে ধরেও মহেন্দ্র প্রণয় ভিক্ষা করেও ব্যর্থ হয়েছে মহেন্দ্র বিনোদিনী কাছে বিদায় প্রার্থনা করে মা ও স্ত্রীর কাছে তথা সংসারের নিশ্চিন্ত-নিরাপদ আশ্রয়ে প্রত্যাবর্তন করতে চেয়েছে। বিনোদিনীর সাধনাও সম্পন্ন হয়েছে বিহারীর বিবাহের স্বীকৃতিকে। হঠাৎ অবাক করে দেয় বিনোদিনী বিবাহের স্বীকৃতিকে। হঠাৎ অবাক করে দেয় বিনোদিনী বিবাহের জন্য আদৌও প্রস্তুত নয় এবং কোনোভাবে বিবাহে সম্মত বিরোধ আপাত-অন্তহিত - কিন্তু মনের অদ্ভূত লীলাকৌশল তার পরেও ভাবনার জোগায় বিনোদিনীর জীবন সাধনার এমন পরিনাম কেন?

উপন্যাসের পরিণামের প্রশ্নেই বলা যায় আধুনিক মানুষের সমস্যা বা জটিলতা এখানেই সে একই সঙ্গে একক মানুষ এবং সমাজেরও একজন। মানবমনের এই দ্বন্দ্ব থেকেই জাত হয়েছে মনোস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েন। ‘চোখের বালি’ উপন্যাসের আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্র-আলোচক বলেছেন - চোখের বালিতে এসে রবীন্দ্রনাথ প্রথম গাহস্থ্য জীবনের জটিলতার ভিতর দিয়ে মানব চরিত্রে সত্যকার অন্তর্দ্বন্দ্ব ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন। উপন্যাসের কাহিনির তা কখনো দাঁত নখে হিংস্র হলেও শেষ পর্যন্ত ভারতীয় বোধে আশ্চর্যভাবে নমনীয়। এখানেই ‘চোখের বালি’ উপন্যাসের মনোস্তাত্ত্বিক বিশেষত্ব।

৩.৫। চোখের বালির ট্র্যাজেডি ভাবনা

সাহিত্যের অঙ্গণে সুপ্রাচীন সৃষ্টি হল ট্রাজেডি। গ্রিক সাহিত্যে খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ-পঞ্চম শতকে ইসকাইলাস, ইউরিপিদিসের হাতে ট্রাজেডি রচনার সূত্রপাত। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে গ্রিক দার্শনিক আরিস্টটল ট্রাজেডিকে সংজ্ঞায়িত করেন এবং আলোচনা করেন। তারপর থেকে

দীর্ঘ কাল ধরে ট্রাজেডি রচনার ধারা অব্যাহত চলছে। এই সূত্র ধরেই শেক্সপিয়র ইংরেজি সাহিত্যে ট্রাজেডি রচনা করে গ্রিক ট্রাজেডিকে নতুন খাতে প্রবাহিত করলেন। এর অনেক পরে গ্রিক এবং শেক্সপিয়রীয় ট্রাজেডির সুত্র অনুসরণ করেই বাংলা সাহিত্যে ও ট্রাজেডি রচনার প্রয়াস দেখা গেল। মধুসুদনের নাটকে, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের পরিণতিতে ট্রাজেডির প্রকাশ ঘটেছে। শেক্সপিয়রের নাটকের মতো বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসে ট্রাজেডি ভাবনার মধ্যে মৃত্যুর বিবিধ রূপ প্রত্যক্ষ করা যায়।

রবীন্দ্রনাথ মানুষের সুখ-দুঃখ, ভালো-মন্দকে নিয়ে মানুষের জীবনের পূর্ণতার ছবি আঁকতে চেয়েছেন। কেননা তাঁর কাছে মানবতাই ছিল মানবজীবনের পূর্ণতার ছবি আঁকতে চেয়েছেন। কেননা তাঁর কাছে মানবতাই ছিল মানবজীবনের সর্বশেষ সত্য। তাঁর অন্তরের বিষন্নতাবোধ থেকে মানব জীবনের সুখ-দুঃখকে দেখেছেন নানাভাবে নানা মাত্রায়। তাঁর উপন্যাসগুলিতে পাশ্চাত্য ট্রাজেডির অন্ধ অনুকরণ বা অনুসরণ নেই, স্বতন্ত্র এবং নিজস্ব পরিকল্পনা অনুসারে ট্রাজেডি পরিকল্পনা করেছেন। 'চোখের বালি' উপন্যাসেও দেখা যায় সামাজিক কিংবা পারিবারিক জীবনবৃত্তে ট্রাজেডি সংঘটিত হয়েছে।

উপন্যাসের শেষে মিলন দৃশ্যের পরিকল্পনাকে গুরুত্ব দিয়েই জনৈক সমালোচক 'চোখের বালি'র কাহিনি প্রসঙ্গে লিখেছেন - "এখানে কাহিনি বিয়োগান্তক নয়, মৃত্যুতে নয়, হত্যায় ও আত্মহত্যায় নয়। জীবনের কোথায় ট্রাজেডি রবীন্দ্রনাথ শুধু সেইটিই দেখিয়েছেন, বাহ্যিক ট্রাজেডি দেখিয়ে কি মঙ্গল সাধিত হবে? রাজলক্ষ্মী, বিনোদিনী, আশা, মহেন্দ্র, বিহারী সকলেরই জীবন বিচ্ছিন্নভাবে বিয়োগান্তক, কিন্তু সমগ্রভাবে সামগ্রিক দৃষ্টিতে? বিনোদিনী যেখানে নিজেকে রক্ষা করল, নিজেকে সংযত করল, সেখানে সে কি মহেন্দ্রকেও রক্ষা ও মোহমুক্ত করল না? মহেন্দ্রের মুক্তিতে কি আশার তপস্যা সার্থক হল না এবং রাজলক্ষ্মীর এবং সর্বোপরি বিহারী? বিনোদিনী আত্মনিবেদন করেছে? ভালোবাসার প্রতিদানে ভালোবাসা পেয়েছে, এর বেশি যদি প্রত্যাশী করত, তবে একদিন সে যা মিথ্যা হয়ে ক্ষণিক বলে প্রত্যাখ্যান করেছে তাকেই সত্য করে তুলত এবং তাতে তার সব কিছু মিথ্যে হয়ে যেত। মহৎ-প্রাণ উপন্যাস-লেখকের এই বৈশিষ্ট্য যে, ক্ষুদ্রকে বৃহৎ সামান্যকে অসামন্য দৃষ্টিতে তাঁরা প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। প্রবৃত্তির আগুনে দগ্ধ

বিনোদিনীর মহত্ত্বটাকেই উজ্জ্বল করে দিয়ে বিনোদিনীকে সমাদরের শ্রদ্ধার পাত্র করে তুলেছেন। বিনোদিনীকে আজ আমরা যত ভালোবাসি এত ভালো কোনো কালেই বাসতাম না। তাই এ কাহিনি বিয়োগান্ত হয়নি।" কিন্তু খুব গভীর ভাবে দেখতে বোঝা যাবে, আপাতদৃষ্টিতে কাহিনি বিয়োগান্ত না হলেও মিলনের গভীরে বিষাদজীর্ণ ট্রাজেডির অতলস্পর্শ রূপ জেগে আছে। যেখানে উপন্যাসের মুখ্য তিনটি চরিত্র বিনোদিনী, বিহারী এবং মহেন্দ্র বাকি জীবন তীব্র মানস-যন্ত্রণা ভোগ করবে। অন্তরের ট্রাজেডি বহন করেই তাদেরকে সংসার জীবন নির্বাহ করতে হবে।

উপন্যাসের কাহিনিতে বিনোদিনীর আবির্ভাব লগ্ন থেকেই তার অন্যান্য ভাবনার সঙ্গে প্রাণশক্তিরও পরিচয় পাওয়া যায়। আর পাঁচজন বাঙালি ঘরের বিধবা নারীর মতো বৈধব্যকে মেনে নিয়ে কৃচ্ছসাধনে দিন কাটায়নি বিনোদিনী, কিংবা জীবনের অপূর্ণ ভোগ বাসনাকে চরিতার্থ করতে অবৈধ সম্পর্কের সামাজিক ব্যভিচারে লিপ্ত হয়নি। বরং সমাজবিধি তীব্র ভাবে অস্বীকার করে তার জিজ্ঞাসা স্পর্ধা ভরে ধ্বনিত হয়েছে - সে কেন জীবনের ভোগের পূর্ণতা থেকে বঞ্চিত থাকবে? আপাতভাবে বিনোদিনী সুন্দরী, শিক্ষিতা, বুদ্ধিমতী, গৃহকর্মনিপুণা বিধবা নারী। আর অন্তরের পরিচয়ে সে জীবনমুখী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যময়ী নারী। তাই জীবনকে বাজী ধরেই প্রণয়ের জীবন- খেলায় মহেন্দ্রের সঙ্গে মেতে উঠতে পারে। তবে আশা-মহেন্দ্রর সুখী দাম্পত্য জীবনের গল্প এবং তাদের সুখ নিজ চক্ষে দেখা ও বিহারী কর্তৃক আশাকে রক্ষার অভূতপূর্ব কৌশল বিনোদিনীর অন্তরে ঈর্ষার জাগরণ ঘটিয়েছে। এখানেই স্পষ্ট একদিকে বিনোদিনীর অতৃপ্ত জীবনপিপাসা, অন্যদিকে তার প্রবল ব্যক্তিত্ব দুই-এর সংমিশ্রণে ঘূর্ণাবর্ত সৃষ্টি হয়েছে, সেই আবর্তে ক্ষত-বিক্ষত নারী-হৃদয় নিয়েই বিনোদিনী শেষ পর্যন্ত ট্র্যাজিক চরিত্র।

বিনোদিনী বিধবা, তার যৌবন ও অন্তরের অতৃপ্ত প্রণয় পিপাসাকে কোনো ভাবে অস্বীকার করা যায় না। তার প্রণয়-বিহীন চিত্ত গভীর ভাবে আলোড়িত। একবার মানস প্রতিহিংসার তীব্রতায় সে উচ্চারণ করেছে – "মহেন্দ্র তাহাকে তাহার সমস্ত জীবনের সার্থকতা হইতে ভ্রষ্ট করিয়াছে।" এজন্যই বিনোদিনী প্রথমে মহেন্দ্রকে অবলম্বন করেছে। কিন্তু বিহারীর ন্যায় সৎ ও আদর্শবান যুবক সামনে আসতেই সংযত হয়েছে প্রকৃত প্রেমের ও পূর্ণতার

স্বাদ পেরেছে বিনোদিনী। হয়তো মহেন্দ্র কিংবা বিহারী দুই পুরুষের মধ্যে একজনকে গেলেই বিনোদিনী পূর্ণ হতে পারত। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি, সে স্বর্গীয় 'বিপিনের বৌ'। এমতাবস্থায় তার উদ্যত চুম্বনও বিহারী ঘৃণাভরে প্রত্যাখান করেছে। আর বিনোদিনীও সেই চুম্বন দান করার উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান পায়নি। বিহারীর অন্তর্ধানও নীরবতা বিনোদিনীকে ব্যাকুল করেছে, তারই সন্ধানে মহেন্দ্রকে অবলম্বন করে ঘর ছেড়েছে। এলাহাবাদের বাসায় বিনোদিণীর প্রার্থনা যেন মঞ্জুর হল - "মন্দকে ভালবাসিয়া একটুখানি মন্দ হও", প্রার্থনায় একদা মুখ ফিরিয়ে নেওয়া বিহারী স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে - সে বিনোদিনীকে বিয়ে করতে চায়। তবু বাস্তবের সংকট কাটল না, বিনোদিনী নিজেই নিজের বাধা অতিক্রম করতে পারল না। তাই অন্তরের তীব্র দাবদাহকে শান্ত করে বিনোদিনী শেষ পর্যন্ত কাশীবাসিনী ! পাশ্চাত্যভাবনায় না হলেও, এটাই তো বিনোদিনীর ট্রাজেডি। যে কারণে 'চোখের বালি' উপন্যাসের পরিণামকেও ট্রাজেডি বলে উল্লেখ করা যায়।

৩.৬। অনুশীলনী

১) রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' উপন্যাসের নামকরণ কতখানি সার্থক - এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করুন।

২) 'চোখের বালি' বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসে অভিনবত্বের সূচনা করেছে এ সম্পর্কে মতামত দিন।

৩) 'চোখের বালি'র কাহিনিকে আকস্মিক বলা কতখানি যুক্তযুক্ত - আলোচনা করুন।

৪) বাংলা উপন্যাসে প্রথম মনস্তত্ত্বের বিচরণ দেখা গেল 'চোখের বালি' উপন্যাসে আপনার যুক্তিগ্রাহ্য বিশ্লেষণ তুলে ধরুন।

৫) 'চোখের বালি'র গল্পকে ভিতর থেকে ধাক্কা দিয়ে দারুণ করে তুলেছে মায়ের ঈর্ষা - আলোচনা করুন।

৬) 'চোখের বালি' কোন্ শ্রেণির বা কোন্ ধরণের উপন্যাস - আলোচনা করুন।

৭) 'চোখের বালি' উপন্যাসের নায়ক কে? মহেন্দ্র না বিহারী? এ সম্পর্কে মতামত উপস্থাপন করুন।

৮) 'চোখের বালি' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র বিনোদিনী - আলোচনা করুন।

৯) 'চোখের বালি'র পরিণামকে ট্রেজেডি বলা যাবে কি? - আলোচনা করুন।

৩.৭। গ্রন্থপঞ্জি

১) আচার্য স্মরণ - রবীন্দ্র উপন্যাসের প্রাসঙ্গিক জিজ্ঞাসা।

২) ঘোষ জ্যোতির্ময় - রবীন্দ্র উপন্যাসের প্রথম পর্যায়।

৩) দাস অমরেশ - রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস : নবমূল্যায়ন।

৪) দাস সজনীকান্ত - রবীন্দ্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য।

৫) দে সত্যব্রত - রবীন্দ্র উপন্যাস সমীক্ষা (১ম খণ্ড)।

৬) দেবনাথ ধীরেন্দ্র - ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ।

৭) বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীকুমার - বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা।

৮) বন্দোপাধ্যায় সুনীলকুমার – উপন্যাসশিল্পী রবীন্দ্রনাথ।

৯) বসু বুদ্ধদেব - রবীন্দ্রনাথ : কথাসাহিত্য।

১০) মজুমদার অর্চনা - রবীন্দ্র উপন্যাস পরিক্রমা।

একক: ৪। চোখের বালি : আঙ্গিক বিচার

বিন্যাসক্রম

৪.১। উদ্দেশ্য

৪.২। চোখের বালি : প্লট নির্মাণ

৪.৩। চোখের বালি : ভাষা প্রসঙ্গ

৪.৪। চোখের বালি : উপমা ও চিত্রকল্পের প্রয়োগ

৪.৫। অনুশীলনী

৪.৬। গ্রন্থপঞ্জি

৪.১। উদ্দেশ্য

রবীন্দ্রনাথ 'মানসী' (১৮৯০) কাব্য রচনাকালেই অনুভব করেছিলেন সাহিত্য ও শিল্প ঘনিষ্ঠ সম্পর্কিত। তাই কবির সঙ্গে শিল্পীর সংযোগে সৃষ্টি-কর্ম সম্পর্কে সচেতন হয়েছেন 'মানসী' কাব্য থেকেই। তিনি 'কবির সঙ্গে শিল্পী' এসে যোগ দেওয়ার গভীর তাৎপর্য উপলব্ধি করেছেন। এই পর্বেই তিনি সৃষ্টি করেছেন বাংলা কথাসাহিত্যের অনন্য সম্পদ গল্পগুচ্ছের গল্পগুলি। এছাড়া তিনি সৃষ্টির লীলাতত্ব এবং এর সাহিত্যের সম্পর্ক অন্বেষণে লিখেছেন- "সৃষ্টিকর্তাকে আমাদের শাস্ত্রে বলেছে লীলাময়। অর্থাৎ তিনি আপনার রসবিচিত্র পরিচয় পাচ্ছেন আপন সৃষ্টিতে মানুষও আপনার মধ্যে থেকে আপনাকে সৃষ্টি করতে করতে নানা ভাবে, নানা রসে আপনাকে পাচ্ছে। মানুষও লীলাময়। মানুষের সাহিত্য আর্টে সেই লীলার ইতিহাস লিখিত অঙ্কিত হয়ে চলেছে।" (সাহিত্যের পথে) কিংবা লিখেছেন - "রসসাহিত্যে বিষয়টা উপাদান, তার রূপটাই চরম। সেইটেই আমাদের ভাষায় এবং সাহিত্যে নূতন শক্তি সার করে, সাধনার নূতন পথ খুলে দেয়।" (সাহিত্যের পথে) 'চোখের বালি'

উপন্যাসের মধ্যে যেন সাধনার নূতন পথে যাত্রা শুরু, অজানা সৃষ্টিকর্মের মধ্যে আত্ম প্রকাশের আনন্দ উত্তাসিত হয়েছে। শিল্পবস্তুর মূল্যায়ন ও তার পরিণতি নিয়েই শিল্পরীতির বিচারের রূপরেখা নির্মিত হয়। এই ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতেই শিল্পরীতির বিচারে রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' উপন্যাস অভিনব সৃষ্টিকর্ম। বাস্তব ও কল্পনার সম্মিলিত প্রয়াসে পরিশীলিত মানসে যে শিল্পকর্ম গড়ে ওঠে তারই তো শৈল্পিক বিচার করা সম্ভব। শিল্পীর মনের মাধুরীর সঙ্গে ভাষা-উপাদানের সংযোগে সৃষ্টি হয় সাহিত্য বিচার করা হয় তার সার্থকতা। আলোচ্য এককের উদ্দেশ্য হল 'চোখের বালি' উপন্যাসের প্লটের গঠন, ভাষার ব্যবহার এবং উপমা চিত্রকল্পাদির প্রয়োগ কতখানি শিল্পরীতির দিক থেকে সার্থক এবং কাহিনিগত বিচারে তা কতখানি গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে তা দেখা। মোটকথা উপন্যাসের শিল্পরীতিতে 'চোখের বালি'র গ্রহণযোগ্যতার-ই যেন অভিনব প্রয়াস - যা শিল্পধর্মের সহায়ক হয়ে উঠেছে।

৪.২। চোখের বালি : প্লট নির্মাণ

উপন্যাস মানুষের বাস্তব জীবনের আখ্যান। আখ্যানটি লেখক যে-কৌশলে উপস্থাপিত করেন তা-ই তার প্লট নির্মাণ পদ্ধতি। 'চোখের বালি' উপন্যাসের গঠন-বৈশিষ্ট্য এখানে আমরা লক্ষ করব। দেখা যাচ্ছে - উপন্যাসটি বিবৃতিমূলক। অর্থাৎ সর্বজ্ঞ ঔপন্যাসিক সমগ্র আখ্যানটি জানেন। তিনি তাঁর নিজের ভাষায়, নিজের বিশ্লেষণ সহ কাহিনি উপস্থাপিত করেছেন। এই বিবৃতির ক্ষেত্রে 'চোখের বালি'-র বিশিষ্টতা হল - লেখকের বিবৃতি ঘটনার বর্ণনা নয়, চরিত্রগুলির মনের অভ্যন্তরের স্রোত ও আবর্ত ব্যাখ্যা করতেই লেখক বেশি আগ্রহী।

কাহিনির গঠন-বিন্যাসে প্রথমে উপক্রমণিকা অংশে উপন্যাসের চরিত্র-সকলের পরিচয় উপস্থাপিত হয়েছে এবং সেইসঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্ক কী এবং সম্পর্ক-বিন্যাস কী হতে পারততা বর্ণিত হয়েছে। যেখানে স্পষ্ট মহেন্দ্র এবং বিহারী উভয়েই বিনোদিনীকে বিবাহের প্রস্তাব প্রত্যাখান করেছে। আর এরপর বিহারীর জন্য নির্বাচিত পাত্রী আশাকে মহেন্দ্র বিবাহ করেছে। আর প্রচ্ছন বেদনা নিয়ে সরে দাঁড়িয়েছে বিহারী। মাতৃত্ব পরাভূত দাম্পত্য প্রণয়ের কাছে, তাই ঈর্ষাকাতর রাজলক্ষ্মীর হাত ধরে বিনোদিনীর আগমন ঘটেছে

মহেন্দ্র-আশার দাম্পত্য জীবনের মাঝখানে। এমন ভাবেই কাহিনির দ্বিতীয় স্তরে জটিলতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং মানসিক সংকট ও সংঘর্ষের সূচনা হয়েছে।

প্রত্যেক ভাষাতেই উপন্যাসের প্রথম যুগে আখ্যান বিবৃত হত ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত ক্রমিক বর্ণনায় সেখানে কিছু কিছু নাটকীয়তাও থাকত। কিন্তু সভ্যতার বিবর্তনে মানুষ হয়ে উঠেছে আত্ম-সচেতন। নিজের ভাবনা, মতামত; নিজের অন্তর-পরিচয় তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ মানুষের সঙ্গে মানুষের সংঘাত আধুনিক কালে প্রধানত ব্যক্তিত্বের তথা মনস্তত্ত্বের সংঘাত। তাই একালের উপন্যাস সমালোচক লিওন ইডেল বলেছেন - আধুনিক উপন্যাস মাত্রেই মন্তাত্ত্বিক উপন্যাস। ‘চোখের বালি' উপন্যাসের বিবৃতিকে আমরা মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ-প্রধান কথন-রীতি বলতে পারি।

উপন্যাসের গঠন কাঠামোতে মধ্যভাগে পয়ত্রিশ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত দেখা যায় ঘটনায়, অঘটনে কাহিনি নাটকীয় অগ্রগতিতে সংঘাতের সূচনা বিন্দুতে উপস্থিত হয়েছে। সেই তীব্র মুহূর্তেই রাজলক্ষ্মী ও বিনোদিনী সম্মুখ সমরে অবতীর্ণা। একদিকে নারীত্বের পূর্ণ অধিকার যাচিয়ে নিতে বিনোদিনীর প্রয়াস, অন্যদিকে কর্তৃত্ব হারানোর ভয় এ দুইএর সংঘাত উপন্যাসে কাহিনিকে স্বতন্ত্র্য মাত্রা দিয়েছে। উন্মত্ত মহেন্দ্রের কণ্ঠে গদগদ উচ্চারণ শোনা যায়- “বিনোদিণী, তবে আমার ভালোবাসা তুমি পায়ে ঠেলিবে না।” আর এর প্রত্যুত্তরে বিনোদিনীর কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে - “মাথায় করিয়া রাখিব। ভালোবাসা আমি জন্মাবধি এত বেশি পাই নাই যে চাইনা বলিয়া ফিরাইয়া দিতে পারি।” বিনোদিনীর মুখে ভালোবাসার কথা এমন স্পষ্ট উচ্চারণ মহেন্দ্রকে উত্তেজিত করেছে, যাকে বলা যায় তার একপ্রকার নবজন্ম। এমন মোহময় পরিস্থিতিতে মহেন্দ্রে মনে হয়েছে তার প্রশস্ত বক্ষে আশা-বিনোদিনী উভয়েই থাকবে, সে দুই চন্দ্র সেবিত গ্রহের ন্যায় জীবন কাটাতে পারবে। তাই বিহারীকে বিনোদিনী যাওয়ার নিমন্ত্রণ জানালে প্রসন্ন চিত্তে গ্রহণ করতে পারেনি। কিন্তু বিনোদিণীর মোহ ত্যাগ করা মহেন্দ্রের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

সংসারের যে কোনো মূল্য চুকিয়ে দিয়ে মহেন্দ্র বিনোদিনীকে কাছে পেতে চায়। আর বিনোদিণীও ক্রুদ্ধা রাজলক্ষ্মীর ভ্রুকুটিকে অগ্রাহ্য করেই রাজলক্ষ্মীর কথার জবাবে জানিয়ে দিয়েছে - “পিসীমা, আমরা মায়াবিনীর জাত ..., ফাঁদ আমিও কতকটা জানিয়া এবং

কতকটা না জানিয়া পাতিয়াছি। ফাঁদ তুমিও কতকটা জানিয়া এবং কতকটা না জানিয়া পাতিয়াছ। আমাদের জাতের ধর্মই এইরূপ - আমরা মায়াবিনী।" এমন তীব্র পরিস্থিতিতেই নাটকীয় মুহুর্তে মহেন্দ্র হাত ধরে বিনোদিনী মহেন্দ্রের সহ্যাত্রী হয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কাহিনি বয়নে স্বতন্ত্র ভাবনার, স্রষ্টা তাই বিনোদিনী কামনা সর্বস্ব রোহিণী নয়, যৌবনের পসরা সাজিয়ে পঙ্কিল জীবনের পথে সে নামতে পারে না। এমন জীবনের পথে পা বাড়িয়েও অন্তরের স্থিরতাকে অবিচল, বিহারীর প্রতি ভালোবাসার আদর্শ থেকে বিচ্যুত নয় বিনোদিনী। তাই গ্রামবাংলার আশ্রয়ে ফিরে এসে প্রতিক্ষণে উৎকর্ণ হয়ে থেকেছে বিহারীর আহ্বান ধ্বনির জন্য। কিন্তু সেই আশা পূরণ হলনা, গ্রাম্য সমাজে কলঙ্কের ডালি মাথায় নিয়েই মহেন্দ্রের হাত ধরেই পশ্চিমে যাত্রা করেছে বিনোদিনী। মহেন্দ্রে কাছে স্পষ্ট নয় বিনোদিনীর মনোলোকে বিহারীর অন্বেষণ। তাই কাহিনির শেষ পর্বে মহেন্দ্র-বিনোদিনীর নিরুদ্দেশ যাত্রা ধীরে ধীরে রোমান্সের পথ থেকে সরে গেছে। শয্যার সতেজ পুষ্প কারও জন্য পড়ে থেকে শুষ্ক হয়েছে, তবু পবিত্রতা ক্ষুন্ন হয়নি। কাহিনির এই সংকট বিন্দুতে উদ্ধত মহেন্দ্র শেষপর্যন্ত দুর্বল, মোহ-নেশা থেকে মুক্ত হৃদয়ে বিনোদিনীর কাছে দয়া প্রার্থনা করেছে যাতে সংসারে ফিরে যেতে পারে।

বিনোদিনী শেষপর্যন্ত মহেন্দ্রের কাছে অধরা স্বর্ণমৃগ। অপমানিত প্রত্যাখ্যানে মহেন্দ্র হতাশায় বেদনায় ম্লান হয়ে প্রত্যাবর্তন করেছে সংসারে। বঙ্কিমি পথে নয়, রবীন্দ্র স্বতন্ত্র গঠন কাঠামো অবলম্বন করেই বিহারীর সঙ্গে বিনোদিনী-মহেন্দ্রকে সংসারে ফিরে আসতে শুধু নয়, বিহারী যথাযোগ্য সামাজিক সম্মান দিয়েই বিনোদিনীকে বিবাহ করতে চেয়েছে। কিন্ত সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছাতেই সম্ভবত বিহারী-বিনোদিনীর মিলন অপূর্ণ থেকে গেছে কাহিনির সমাপ্তি বিন্দু পর্যন্ত। মহেন্দ্রের পত্রে কৌতুকরসের সন্ধানী বিনোদিনীর শেষপর্যন্ত উত্তপ্ত নিশ্বাস শীতল হয়ে গেছে। তার অন্তরের উন্মত্ত প্রেমাকাঙ্ক্ষার রূপ কখনও পত্রে, কখনও কথায় স্পষ্ট হয়েছে। উপন্যাসের গঠন-কাঠামোতে পত্রগুলিও বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে। যা থেকে বিনোদিনীর মানস গঠনের রূপ ও পরিবর্তন স্বরূপ স্পষ্ট হয়েছে।

'চোখের বালি' উপন্যাসের শিল্পি-শৈলীতে চরিত্রেরও প্রাধান্য আছে। প্রতিটি চরিত্র সুচিন্তিত, সুনির্মিত। প্লট আর চরিত্রের আপেক্ষিক গুরুত্বের দ্বন্দ্ব এখানে বড়ো হয়ে ওঠে না। এখানে আখ্যান নির্মিত হয় চরিত্রগুলির ভাবনা ও আচরণের বর্ণনার মধ্যে দিয়েই।

সবশেষে বলা যায়, মনস্তাত্ত্বিক আবর্ত থাকলেও উপন্যাসটি গতিময় ও লক্ষ্যাভিমুখী। উপকাহিনি নেই। ঋজু ও সবল-এর গঠন।

৪.৩। চোখের বালি : ভাষা প্রসঙ্গ

রবীন্দ্রনাথ গদ্যশিল্পী হিসেবে সার্থক, তা শুধু প্রবন্ধের জন্য নয়, উপন্যাসের ভাষার ক্ষেত্রেও তাঁর দান যথেষ্ট। বলা হয়, উপন্যাসের ক্ষেত্রেও বাকনির্মিতির সার্থকতা বিশেষভাবে প্রোজ্জ্বল। সম্ভবত ভাষার দিকে ঈঙ্গিত রেখেই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন - "আর মাত্র এই একটি করণেও (অর্থাৎ ভাষার জন্যে) রবীন্দ্রনাথের উপ্যানাস বার বার পরম আনন্দেই পড়া চলে।" (কথাকোবিদ রবীন্দ্রনাথ) এর সঙ্গে সাযুজ্য রেখেই বলা চলে রবীন্দ্র-উপন্যাসের ভাষার শিল্পকৃতিতে ক্রমবিকাশ লক্ষ করা যায়। এ ব্যাপারে স্পষ্ট চোখে পড়ার বিষয় 'ঘরে- বাইরে' (১৯১৬) উপন্যাসের পূর্ব পর্যন্ত সকল উপন্যাসেই সাধুভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। পরবর্তী উপন্যাসগুলিতে চলিত ভাষার ব্যবহার দেখা যায়। 'চতুরঙ্গ' কে বলা যায় দুই স্তরের মধ্যবর্তী উপন্যাস। কেননা 'চতুরঙ্গ' সাধুভাষায় রচিত উপন্যাস হলেও 'সবুজ পত্র'-র ভাষারীতির প্রভাব কিংবা পরবতী স্তরের প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে উপন্যাসটিতে। তাঁর উপন্যাসগুলির ভাষাগত বৈশিষ্ট্য হল - ভাষার স্বচ্ছন্দ প্রবহমানতা। ধ্বনিমাধুর্যের দিক থেকে বিশেষভাবে সার্থক। বাস্তব জগৎ ও সংসারের বাহ্যিক ঘটনাবলীর বর্ণনায় সার্থক শব্দচয়ন ও প্রয়োজন মতো শব্দগঠনের বিশেষ সার্থকতা দেখা যায় রবীন্দ্র-উপন্যাসে।

রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' উপন্যাসের ভাষারীতিতে বর্ণনার মাধুর্য বিশেষভাবে পাঠককে আকৃষ্ট করে। বিনোদিনী-কেন্দ্রিক উপন্যাসে বিনোদিনীর অনুভূতি প্রকাশের দিকগুলি বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মতো। মহেন্দ্রে চিঠি পাঠ করে বিনোদিনীর অচরিতার্থ প্রেমাকাঙ্ক্ষার আভাস ফুটে উঠেছে - "চিঠির মধ্যে বিনোদিনী কি রস পাইল তাহা

বিনোদিনীই জানে। কিন্তু তাহা কৌতূকরস নহে। বার বার করিয়া পড়িতে পড়িতে তাহার দুই চক্ষু মধ্যাহ্নের বালুকার মতো জ্বলিতে লাগিল, তাহার নিশ্বাস মরুভূমির বাতাসে উত্তপ্ত হইয়াউঠিল।” এরপরই পুনরায় বিনোদিনী হৃদয়াকাঙ্ক্ষার পরোক্ষ-পরিতৃপ্তির মধ্যে মনস্তত্ত্বের অন্তত লীলা ও টানাপোড়েনের ভাষাগত রূপ - “তাহার শিরায় শিরায় আগুন ধরিয়া গেল। সে যেদিকে চায় তাহার চোখে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বর্ষণ হইতে থাকে। এমন সুখের ঘরকন্না এমন সোহাগের স্বামী। এ ঘরকে যে আমি রাজার রাজত্ব, এ স্বামীকে যে আমি পায়ের দাস করিয়া রাখিতে পারিতাম। তখন কি এই ঘরের এ-দশা, এ-মানুষের এই ছিরি থাকিত। আমার জায়গায় কিনা এই কচি খুকি, এই খেলার পুতুল।” এই ভাষার মধ্যে মানসিক চিন্তাক্রমের অভিব্যক্তিটি নিখুঁত ফুটে উঠেছে।

বিনোদিনীর ক্রমপ্রকাশের অভ্যিবক্তিটি ভাষারূপের মাধ্যমে সুন্দর ভাবে ব্যঞ্জিত হয়েছে। বিনোদিনীর সংসার সংহারমূতির প্রকাশ ভাষায় প্রকাশিত – “ক্রুদ্ধা মাধুকরী যাহাকে সম্মুখে পায় তাহাকেই দংশন করে, ক্ষুব্ধ বিনোদিনী তেমনি তাহার চারিদিকের সমস্ত সংসারটাকে জ্বালাইবার জন্য প্রস্তুত হইল।” আবার বিনোদিণীর ভাবনাতেই মহেন্দ্র দুর্বল লোলুপতা, সংযমহীনতা, কর্তব্যজ্ঞানহীনতা স্পষ্ট ভাষায় উন্মোচিত হয়েছে - “এক সময় মনে করিতে তুমি আশাকে ভালোবাসিতেছ, সেও মিথ্যা; এখন মনে করিতেছ তুমি আমাকে ভালোবাসিতেছ, এ মিথ্যা। তুমি কেবল নিজেকে ভালোবাস।” কিংবা বিনোদিনীকে পটলডাঙার বাসায় নিয়ে তুললে মহেন্দ্রের ভাবনা প্রকাশের ভাষায় বঙ্কিমি অনুষঙ্গ উপলব্ধি করা যায় - “এতদিন সমস্ত পৃথিবীকে ভুলিয়া যে যাহাকে চাহিয়াছিল, আজ তাহাকে পাইয়াছে, আজ উভরের মাঝখানে কোনো বাধা নাই আজ মহেন্দ্রের আনন্দের দিন। কিন্তু কোন বাধা নাই তাহাই সর্বাপেক্ষা বড়ো বাধা, আজ মহেন্দ্র নিজেই নিজের বাধা।” কিংবা আরও লক্ষ্য করা যায় বর্ণনার ভাষারীতি - "এতকষ্ট, এত বিরক্তি, এত চাঞ্চল্য যদি, তবে ও শয্যায় আর বসিয়ো না, মহেন্দ্র। এখানে আসিয়াও যদি মনে না পড়ে সেই সমস্ত পরিপূর্ণ গভীর রাত্রি, সেই সমস্ত সুনিবিড় মধ্যাহ্ন, আত্মহারা কর্মবিস্মৃত ঘণবর্ষার দিন, দক্ষিণ-বায়ু-কম্পিত বসন্তের বিহ্বল সন্ধ্যা, সেই অনন্ত অসীম অসংখ্য অনির্বচনীয় কথাগুলি, তবে এ-বাড়িতে অন্য অনেক ঘর আছে, কিন্তু এই ক্ষুদ্র ঘরটিতে

আর এক মুহূর্তও নহে!" এই বঙ্কিমি ঢং-য়ের মধ্যে 'বসন্তের বিহ্বল সন্ধ্যা' কিংবা 'অনন্ত অসীম অসংখ্য অনির্বচনীয়' এর ন্যায় শব্দচয়নের মধ্যে অমোঘ রাবীন্দ্রিকতা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

উপন্যাসের ভাষায় একধরনের মিশ্রণ কাঙ্ক্ষিত। লেখক নিজের ভাষ্য রচনা করবেন নিজের ভাষায়। কিন্তু যখন চরিত্রের মুখে বাসাবেন সংলাপ তখন তা হবে চরিত্রোচিত। এ ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ খুব পারঙ্গম ছিলেন না কিন্তু তার নিজের ভাষাটি অনবদ্য। আমোঘ ব্যঞ্জনার্ভ। কিন্তু আঠারো-উনিশের বিনোদিনীর ভাষা; পৌঢ়া, স্বল্পবুদ্ধি রাজলক্ষ্মীর ভাষাকে স্বাভাবিকতা দিতে পারেননি তিনি। মেনে নিতে হয় যে আগাগোড়া উপন্যাসের বিবৃতি ও সংলাপ সবই রবীন্দ্রনাথের ভাষা ।

৪.৪। চোখের বালি : উপমা ও চিত্রকল্পের প্রয়োগ

উপন্যাসের নামকরণের মধ্যেই গভীর ব্যঞ্জনা কিংবা অন্যভাবে বলা যায় একধরনের আনুষ্ঠানিকতার দিক ফুটে উঠেছে। যেখানে সম্পর্ক পাতানোর মধ্যে গভীর তাৎপর্য সন্ধান করা যায়। যখন সর্বগুণে গুণান্বিতা গ্রাম্য যুবতী সুন্দরী বিধবা সংসার-অনভিজ্ঞ অপটু আশালতার সঙ্গে ভালোবাসার সম্পর্কের কথা বলেছে তখন আনন্দ উপচিয়ে পড়েছে। সখিত্ব পাতানোর জন্য সরলা আশালতা গলাজল বকুলফুল প্রভৃতি ভালো ভালো জিনিসের নাম করলেও ওগুলোকে পুরনো বলে নস্যাৎ করেছে বিনোদিনী এবং হাসতে হাসতে 'চোখের বালি' বলে নিজেদের নাম ঠিক করেছে। এখানেই নামের কিংবা সখিত্ব পাতানোতেই উপমার প্রয়োগ দেখা যায়। বিনোদিনীর ব্যক্তিত্বের কাছে আশা সর্বদা হীনম্মন্যতায় ভুগেছে। যে কারণে লেখকও সমগ্র উপন্যাসে অসম সখিত্বকে বিস্মৃত হননি। সখিত্বের 'চোখের বালি' সম্পর্কের মধ্যে অসাধারণ আলংকারিক ব্যঞ্জনা আছে। কথাটির 'বিপ্রতীপতা' হল, লোকজ্ঞানে কেউই চোখে বালি পড়াটাকে পছন্দ করতে পারে না। তাতে চোখের স্বাভাবিক ক্রিয়াতে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে এবং অস্বস্তিকর যন্ত্রণা হয়। আর এই অনাহূত উপদ্রব দীর্ঘস্থায়ী হলে দৃষ্টিশক্তির পক্ষেও ক্ষতিকারক হয়। উপন্যাসে 'চোখের বালি' কথাটি বিনোদিণী একটি প্রচ্ছন্ন চ্যালেঞ্জ মহেন্দ্র-আশার অনাহত দাম্পত্য-জীবনে।

'চোখের বালি' কথাটির মধ্যে অন্তর্নিহিত বিপ্রতীপতা ছিল তা হল বিনোদিনীর অন্তরের সুপ্ত ঈর্ষা। এ প্রসঙ্গে বিনোদিনীর দৃষ্টি সম্পর্কে উপন্যাসে উল্লেখিত হয়েছে - "কিন্তু লঙ্কামরিচের স্বাদটা যে কী, তাহা বিনোদিনীই বুঝিতেছিল কেবল সঙ্গে তার তরকারি ছিল না। তাহার শিরায় শিরায় যেন আগুন ধরিয়া গেল। সে যেদিকে চায়, তাহার চোখে যেন স্ফুলিঙ্গ বর্ষণ হইতে থাকে। এমন সুখের ঘরকন্না এমন সোহাগের স্বামী। আমার জায়গায় কিনা এই কচি খুকি, এই খেলার পুতুল।" আর এমন ভাবনার পাশাপাশি দ্বিচারী আচরণ বিনোদিনী আশার গলা জড়িয়ে জানতে চেয়েছে - "ভাই চোখের বালি, বলো না ভাই, কাল তোমাদের কী কথা হইল ভাই...।' এখানেই উপন্যাসের মূল ব্যঞ্জনা প্রকাশের সূচনা মনের সংসারের কারখানা ঘরের অভিনব খেলা। যেখানে 'ঘটনা পরম্পরার বিবরণ নয়, বিশ্লেষণ করে তাদের আঁতের কথা বের করে দেখানো।'

মহেন্দ্র-আশার দাম্পত্য জীবনে বিনোদিনীর আগমনে বিপরীত বার্তা প্রবাহিত হয়েছে পাঠকের কাছে খুব স্পষ্ট, কিন্তু আশার কাছে নয়। কিন্তু আরেক জনের কাছেও কিছুটা স্পষ্ট কিছুটা অস্পষ্ট ছিল, সে হল বিহারী। উপন্যাসের ১৭ সংখ্যক পরিচ্ছেদে দমদমে চড়িভাতি করতে গিয়ে বিনোদিনী সম্পর্কে বিহারীর নতুন ভাবনা প্রসূত হয়েছে। বিনোদিনীর অতীত স্মৃতিচারণা চিত্রকল্পের উদ্ভাসনে স্পষ্ট হয়েছে উপন্যাসে- "ক্ষণে ক্ষণে উষ্ণ মধ্যাহ্নের বাতাস তরু পল্লব মর্মরিত করিয়া চলিয়া গেল, ক্ষণে ক্ষণে দিঘির পাড়ে জাম গাছে ঘনপত্রের মধ্য হইতে কোকিল ডাকিয়া উঠিল। বিনোদিনী তাহার ছেলেবেলাকার কথা বলিতে লাগিল, তাহার বাপ-মায়ের কথা, তাহার বাল্যসখির কথা। বলিতে বলিতে তাহার মাথার কাপড়টুকু খসিয়া পড়িল; বিনোদিনীর মুখে খরযৌবনের যে একটি দীপ্তি সর্বদাই বিরাজ করিত, বাল্যস্মৃতির ছায়া আসিয়া তাহাকে স্নিগ্ধ করিয়া দিল। বিনোদিনীর চক্ষে যে কৌতুকতীব্র কটাক্ষ দেখিয়া তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি বিহারীর মনে এ পর্যন্ত নানাপ্রকার সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল, সেই উজ্জ্বল কৃষ্ণজ্যোতি যখন একটি শান্ত সজল রেখায় ম্লান হইয়া আসিল তখন বিহারী যেন আর একটি মানুষ দেখিতে পাইল। উদ্ভাসিত হল স্রষ্টার দার্শনিক অভিধা - "প্রকৃত আপনাকে মানুষ আপনি ও জানিতে পারে না। অন্তর্যামীই জানেন, অবস্থা বিপাকে যেটা বাহিরে গড়িয়া ওঠে সংসারের কাছে সেইটেই

সত্য।" আর এমন মোহময় আত্ম-আবিষ্কারের স্বপ্নালু পরিস্থিতিতে বিনোদিনীর আত্ম-উন্মোচনের আলংকারিক বিন্যাস উপন্যাসে দেখা যায় - "শুক্লপক্ষের চাঁদ ক্রমে শাখাজাল জড়িত দিকপ্রান্ত হইতে মুক্ত আকাশে আরোহণ করিল। নিস্তব্ধ নিষ্কম্প বাগান ছায়ালোকে খচিত হইয়া উঠিল। আজ এই মায়ামন্ডিত পৃথিবীর মধ্যে বিনোদিনী আপনাকে কী একটা অপূর্বভাবে অনুভব করিল।"

একদা বিনোদিনীর মনে হয়েছিল মহেন্দ্র তাকে তার সমস্ত জীবনের সার্থকতা থেকে ভ্রষ্ট করেছে। মহেন্দ্রের বালিকা স্ত্রী আশাকে ভালোবাসে না বিদ্বেষ করে নিজের কাছেই স্পষ্ট করতে পারেনি। মহেন্দ্র বিনোদিনীর অন্তরে একধরনের জ্বালা ধরিয়েছে, সেই জ্বালা হিংসার না প্রেমের, না দুই-এর মিশ্রণ - তা বিনোদিনী নিজেই ঠিক করতে পারেনি। এমন মানসিক অবস্থার প্রেক্ষিতটুকু উপমিত হয়েছে উপন্যাসে - "কোনো নারীর কি আমার মতো এমন দশা হইয়াছে। আমি মরিতে চাই কি মারিতে চাই তাহা বুঝিতেই পারিলাম না। কিন্তু যে কারণেই বল, দগ্ধ হইতেই হউক বা দগ্ধ করিতেই হউক, মহেন্দ্রকে তাহার একান্ত প্রয়োজন। সে তাহার বিষদিগ্ধ আগ্নিবান জগতে কোথায় মোচন করিবে।" সম্ভবত একারণেই নিজের জীবনের ব্যর্থতার চরম অনুভূতির মুহূর্তে যখন বিহারী আশাকে দেখাশোনার কথা বলেছে তখন 'বিনোদিনীর মুখে হিংসার বিদ্যুৎ খেলিতে লাগিল'। আর বিনোদিনীর জীবন-সংগ্রামে স্ববিরোধিতায় বিরোধাভাসের সন্ধান করা যায় উপ্যাসের কাহিনির অন্তিম লগ্নে। পশ্চিমযাত্রায় বিনোদিনী মহেন্দ্রকে সঙ্গী করলেও অন্তরে ছিল বিহারী। তাই এলাহাবাদের পুষ্পশোভিত ঘর দেখে বিহারী যখন বিমুখ হয়ে চলে যাবার জন্য উদ্যত তখনই বিনোদিনী জানিয়ে দিয়েছে - "এ ঘরে কোনো কলঙ্ক স্পর্শ করে নাই। তুমি এই ঘরে একদিন শয়ন করিয়াছিলে - এ-ঘর তোমার জন্য উৎসর্গ করিয়া রাখিয়াছি - ওই ফুলগুলা তোমারি পূজা করিয়া আজ শুকাইয়া পড়িয়া আছে।" অথচ প্রার্থিত ডাক যখন এল, বিহারী যখন বিনোদিনীকে বিবাহ করার ইচ্ছা প্রকাশ করল তখনই বিনোদিনীর মুখে উচ্চারিত হল - "আমি বিধবা, আমি নিন্দিতা,সমস্ত সমাজের কাছে আমি তোমাকে লাঞ্ছিত করিব, এ কখনো হইতেই পারে না।" এখানে 'হিংসার বিদ্যুৎ' উপমা এবং আত্মনিবেদিত প্রেমের চিত্রকল্প পুষ্পসজ্জিত ঘর - দুইই সুপ্রযুক্ত।

উপন্যাসের কাহিনি উপস্থাপনে রবীন্দ্রনাথ অভিনব ভাবে প্রকাশকরতে ব্যঞ্জনাময় এবং রমণীয় করে তুলেছেন। শ্রতিসুখকর কাব্যময় সুযমার প্রকাশ প্রসঙ্গে দুটি উদাহরণ উপস্থাপন করা যায়। যেমন মহেন্দ্রের প্রতি বিনোদিনীর হৃদয়ের দোলাচলতার রূপ উদ্ভাসিত হয়েছে - "অলস মধ্যাহ্নের উত্তপ্ত হাওয়ায় ঘরের পর্দা উড়িতে লাগিল এবং প্রাচীরের কাছে কল্পমান নারিকেল গাছের অর্থহীন মর্মরশব্দ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। মহেন্দ্রের হৃদপিন্ড ক্রমশই দ্রুততর তালে নাচিতে লাগিল এবং বিনোদিনীর ঘননিশ্বাস সেই তালে মহেন্দ্রের কপালে চুলগুলি কাঁপাইতে থাকিল। কাহারও কণ্ঠ দিয়ে একটি কথা বাহির হইল না।" এখানে 'অলস মধ্যাহ্নের উত্তপ্ত হাওয়া' এবং 'কম্পমান নারিকেল গাছে'র চিত্রকল্প গভীর ব্যঞ্জনাময় হয়ে উঠেছে। সঞ্চারিত করেছে আতপ্ত কামনার আবহ।

রবীন্দ্রনাথের গদ্যরচনাতেও কবিত্বময়তা আত্মপ্রকাশ করেছে বর্ণনার মধ্য দিয়ে এমনই অভিযোগ উপন্যাসের ক্ষেত্রেও শোনা যায়। অনেক ক্ষেত্রে এই অভিযোগকে খারিজ করে ভাষার আলংকারিক কারুকার্য । যেমন 'চোখের বালি' উপন্যাসেও শ্রুতিসুখকর কাব্যিক অভিব্যক্তির প্রকাশ - "সে আজ বিনোদিনীর কলঙ্কপারাবারের মধ্যে তাহার হৃদয় - দেবতাকে বিসর্জন দিল; সেই প্রেমশূন্য রাত্রির অন্ধকারে তাহার কানের মধ্যে, বুকের মধ্যে, মস্তিষ্কের মধ্যে, তাহার সর্বাঙ্গে রক্তস্রোতের মধ্যে, তাহার চারিদিকের সমস্ত সংসারে, তাহার আকাশের নক্ষত্র, তাহার প্রাচীরবেষ্টিত নিভৃত ছাদটিতে, তাহার শয়নগৃহের পরিত্যক্ত বিরহশয্যাতলে একটি ভয়ানক গম্ভীর ব্যাকুলতার সঙ্গে বিসর্জনের বাদ্য বাজিতে লাগিল।" এ ভাবে 'চোখের বালি' উপন্যাসে ব্যঞ্জনাময় ও চিত্রসৌন্দর্যের নিদর্শন উপন্যাসের বর্ণনা মাধুর্যকে প্রকটিত করেছে। যা উপন্যাসের কাহিনিগত বর্ণনার উপভোগ্যতাকে বাড়িয়ে দিয়েছে এবং উপন্যাসে চিত্রকল্পের প্রয়োগকে বিশেষভাবে সার্থক করে তুলেছে।

৪.৫। অনুশীলনী

১) রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' উপন্যাসের প্লট প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।

২) 'চোখের বালি' উপন্যাসের প্লট গঠনে অভিনবত্ব সম্পর্কে আপনার ধারণা ব্যক্ত করুন।

৩) প্লট-গঠনের বৈচিত্র্য উপন্যাসের কাহিনিকে আকর্ষক করে তোলে – 'চোখের বালি' উপন্যাসের ক্ষেত্রে কথাটি কতখানি প্রযোজ্য ?

৪) উপন্যাসের ভাষা উপন্যাসের কাহিনি উপস্থাপনে যথার্থ আকর্ষণ সৃষ্টি করে - এ বিষয়ে অভিমত ব্যক্ত করুন।

৫) 'চোখের বালি' উপন্যাসের ভাষা কবিত্বময় ও ব্যঞ্জনাবাহী - আলোচনা করুন।

৬) 'চোখের বালি' উপন্যাস ভাষারীতির সার্বিক পরিচয় দিন।

৭) 'চোখের বালি' উপন্যাসে উপমা-চিত্রকল্পের প্রয়োগ উপন্যাসের কাহিনিকে গভীর ব্যঞ্জনাময় করেছে আলোচনা করুন।

৮) 'চোখের বালি' উপন্যাসের ভাষায় চিত্রসৌন্দর্য অভিনব ভাবে ব্যক্ত হয় - এ সম্পর্কে অভিমত দিন।

৪.৬। গ্রন্থপঞ্জি

১) আচার্য স্মরণ - রবীন্দ্র উপন্যাসের প্রাসঙ্গিক জিজ্ঞাসা।

২) ঘোষ জ্যোতির্ময় - রবীন্দ্র উপন্যাসের প্রথম পর্যায়।

৩) দাস অমরেশ - রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস : নবমূল্যায়ন।

৪) দাস সজনীকান্ত - রবীন্দ্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য।

৫) দে সত্যব্রত - রবীন্দ্র উপন্যাস সসীক্ষা (১ম খণ্ড)।

৬) দেবনাথ ধীরেন্দ্র - ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ।

৭) বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীকুমার - বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা।

৮) বন্দোপাধ্যায় সুনীলকুমার – উপন্যাসশিল্পী রবীন্দ্রনাথ।

৯) বসু বুদ্ধদেব - রবীন্দ্রনাথ : কথাসাহিত্য।

মন্তব্য

১০) মজুমদার অর্চনা - রবীন্দ্র উপন্যাস পরিক্রমা।

একক: ৫। জীবনস্মৃতি : রচনা প্রসঙ্গে নানা কথা

বিন্যাসক্রম

৫.১। জীবনস্মৃতি রচনার উৎসের অনুসন্ধান

৫.২। জীবনস্মৃতির খসড়া ও পাণ্ডুলিপি প্রসঙ্গ

৫.৩। বিভিন্ন চিঠিপত্রে জীবনস্মৃতি রচনার প্রসঙ্গ

৫.৪। জীবনস্মৃতির ভূমিকা প্রসঙ্গ

৫.৫। জীবনস্মৃতি প্রকাশনা প্রসঙ্গ

৫.৬। অনুশীলনী

৫.৭। গ্রন্থপঞ্জি

৫.১। জীবনস্মৃতি রচনার উৎসের অনুসন্ধান

'জীবনস্মৃতি' রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ জীবনের খন্ডাংশের পরিচিতি। কবি তখন পঞ্চাশ বছরে পদার্পণ করেছেন। তাঁর কবিখ্যাতি সুপ্রতিষ্ঠিত। এই সময় কবির পঞ্চাশ বৎসর পূর্তি উপলক্ষ্যে কবি-সম্বধনার আয়োজন চলছে। জীবনের এই পূর্ণতার অভিযাত্রী কবির জীবন প্রারম্ভের ইতিকথা 'জীবনস্মৃতি' নামে প্রকাশিত হল প্রবাসীতে। প্রবাসীতে ১৩১৮ সালের ভাদ্র মাস থেকে 'জীবনস্মৃতি' প্রকাশিত হতে থাকে। কবি ঠিক কবে এই জীবন বৃত্তান্ত লিখতে শুরু করেন সেটা বলা যায় না। রবীন্দ্র জীবনীকার প্রভাত মুখোপাধ্যায় বলেছেন- "কবি ঠিক কোন্ সময়ে যে এই গ্রন্থখানি লিখিয়াছিলেন বলা যায় না।"

'জীবনস্মৃতি' রচনার কাল সঠিক করে নির্ণয় করা না গেলেও এই অতুলনীয় গ্রন্থখানি রচনার পূর্বে তাঁর জীবনকথা রচনার কিছু কিছু ধারাবাহিকতা অবশ্যই উল্লেখযোগ্য ।

প্রচলিত রীতিতে আত্মজীবনী লেখায় রবীন্দ্রনাথের কুণ্ঠা ছিল। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন- "কবির জীবন মানুষের কী কাজে লাগিবে? তাহাতে স্থায়ী পদার্থ কী আছে? কবির নামের সঙ্গে বাঁধিয়া তাহাকে উচ্চে টাঙাইয়া রাখিলে ক্ষুদ্রকে মহতের সিংহাসনে বসাইয়া লজ্জিত করা হয়।" [কবিজীবনী]

'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি'তে কবি লিখেছেন- "অতি বিশ্বাসযোগ্য তথ্য স্তুপাকার করে তা দিয়ে স্মরণস্তম্ভ হতে পারে। কিন্তু জীবনচরিত হবে কী করে। জীবন চরিত থেকে যদি বিস্মরণধর্মী জীবনটাই বাদ পড়ে তাহলে মৃত চরিত্রের কবরটাকে দিয়ে হবে কী?"

"উৎসর্গ কাব্যের একটি কবিতায় কবি বলেছেন -

'বাহির হইতে দেখো না এমন করে

আমারে দেখো না বাহিরে।

** ** ** ** ** **

কবিরে পাবে না তাহার জীবনচরিতে।'

জীবনচরিত রচনায় কবির অন্তরে যত কুণ্ঠাই থাক, বাইরের তাগাদাও কম ছিল না। আর তাই শেষপর্যন্ত প্রিয়জনের অনুরোধ উপেক্ষা করতে না পেরে কবিকে লিখতে হয়েছে জীবনকথা-জীবনস্মৃতি। অবশ্য আরও একটি প্রসঙ্গ এখানে প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় উল্লেখ্য। **১৩১১** সালে 'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঐ প্রবন্ধে আত্মজীবনী লেখার অক্ষমতার কথা বলে জীবনের বিস্তারিত বর্ণনার পরিবর্তে জীবন বৃত্তান্ত থেকে 'বৃত্তান্ত' অংশটুকু বাদ দিয়ে জীবনকে বড় করে তুলতে চেয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন- "জগতের মধ্যে যাহা অনির্বচনীয়, তাহা কবির হৃদয়-দ্বারে প্রত্যহ বারংবার আঘাত করিয়াছে, ... তবেই কাব্য সফল হইয়াছে এবং সেই সকল কাব্যই কবির প্রকৃত জীবনী। সেই জীবনীর বিষয়ীভূত ব্যক্তিটিকে কাব্য রচয়িতার জীবনের সাধারণ ঘটনাবলীর মধ্যে ধরিবার চেষ্টা বিড়ম্বনা।"

রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্যের বিরূপ সমালোচনা করেন দ্বিজেন্দ্রলাল। বঙ্গদর্শনে 'কাব্যের উপভোগ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য তাঁর দম্ভ ও অহমিকার প্রকাশ বলে মন্তব্য করেছিলেন তিনি। এই অভিযোগের উত্তর বঙ্গদর্শনেই (মাঘ ১৩১৪) দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি লিখেছিলেন- "বিশ্ব-শক্তিকে নিজের জীবনের মধ্যে অনুভব করা অহংকার নহে। বরঞ্চ অহংকারের ঠিক উল্টা। কেননা এই বিশ্বশক্তি কোনো ব্যক্তিবিশেষের বিশেষ সম্পত্তি নহে। তাহা সকলের মধ্যেই কাজ করিতেছে"।

'জীবনস্মৃতি' রচনার পিছনে হয়তো এই আঘাতের সুক্ষ্ম বেদনা কাজ করেছে। জীবনস্মৃতি রচনার আগে অন্তত তিনটি সংক্ষিপ্ত আত্মকথা লেখার খবর আছে।

প্রথমটি ১৩১১ বঙ্গাব্দে হরিমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থের জন্য। এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন- "আমার জীবনবৃত্তান্ত লিখিতে আমি অনুরুদ্ধ হইয়াছি। এখানে আমি অনাবশ্যক বিনয় প্রকাশ করিয়া জায়গা জুড়িব না। কিন্তু গোড়াতেই একথা বলিতেই হইবে আত্মজীবনী লিখিবার বিশেষ ক্ষমতা বিশেষ লোকেরই থাকে। আমার তাহা নাই। না থাকিলেও ক্ষতি নাই কারণ, আমার জীবনের বিস্তারিত ঘটনায় কাহারো কোনো লাভ দেখিনা। সেইজন্য এ স্থলে আমার জীবন বৃত্তান্ত হইতে 'বৃত্তান্তটা' বাদ দিলাম।"

ইতিপূর্বে 'সখা ও সাথী' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীভুবন মোহন রায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপ-চারিতার ভিত্তিতে উল্লিখিত পত্রিকায় ১৩০২ সালের শ্রাবণ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের একটি সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত প্রকাশ করেন। এই জীবন বৃত্তান্তটি প্রকাশের পর কিছু ভুলের উল্লেখ করে সম্পাদীয় দপ্তরে চিঠি লেখেন। সেই চিঠিটি 'রবিবাবুর পত্র' শিরোনামে পত্রিকার ১৩০২ এর ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

রবিবাবুর পত্র – "আধুনিক কালের শাস্ত্র অনুসারে পিন্ডদানের পরিবর্তে জীবন বৃত্তান্ত রচনা প্রচলিত হইয়াছে। কিন্তু অনুরাগী ব্যক্তিগণ যখন তাঁহাদের প্রীতি ভোজনের জীবদ্দশাতেই উক্ত বন্ধুকৃত্য আগে ভাগে সারিয়া রাখিতে চেষ্টা করেন, তখন সজীব সশরীরে তাঁহাদের প্রদত্ত সেই অন্তিম সৎকার গ্রহণ করিতে সঙ্কোচ বোধ হয়। প্রেতলোকের প্রাপ্য ইহলোকেই আদায় করিতে বসিলে মনে হয় ফাঁকি দেওয়া হইতেছে।

ফলতঃ এখনো আমার জীবন আমারই হস্তে আছে। আশা করি আরও কিছুকাল থাকিবে। যখনই ইহার অধিকার ত্যাগ করিব তখন সেই পরিত্যক্ত জীবনটাকে লইয়া যাহার ধর্মে যাহা বলে তিনি তাহাই করিতে পারেন। আপনারা তখন তাহার গুরুত্ব আমি উপলব্ধি করিতে পারি নাই এবং নিশ্চিন্ত চিত্তে সম্মতি দিয়াছিলাম। কিন্তু সম্প্রতি আপনাদের মাসিক পত্রে প্রবন্ধের শিরোভাগে নিজের নাম ছাপার অক্ষরে দেখিয়া সবিশেষ লজ্জা অনুভব করিতেছি। ছাপার কালিতে ম্লান না দেখায় এখন উজ্জ্বল নাম অল্পই আছে। কিন্তু তাহা লইয়া অধিক পরিতাপ করিতে বসিলে অবিনয় প্রকাশ করা হইবে। এক্ষণে কেবল আপনাদের প্রবন্ধের দুই একটা ভ্রম সংশোধন করিয়া বিদায় লইব।”

এরপর এই পত্রে চারটি ভুলের কথা রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন। সেগুলি হল -

১। মাননীয় শ্রীযুক্ত রমেশ চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের শ্রেষ্ঠ কন্যার বিবাহ সভায় নিমন্ত্রিত হইয়া আমার সহিত বঙ্কিমের সাক্ষাৎ হয়। তিনি আমার কোনো নব-প্রকাশিত গ্রন্থ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন এমন সময় কন্যা-কর্তৃপক্ষের কেহ বঙ্কিমের কণ্ঠে পুষ্পমালা পরাইতে আসিলে তিনি তাহা লইয়া স্বহস্তে আমার গলে অর্পণ করিয়াছিলেন। সেখানে দেশের প্রধান লেখকেরা উপস্থিত ছিলেন না এবং মাল্যদানের দ্বারা বঙ্কিম আমাকে অন্যান্য লেখকের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পদ দেন নাই।

২। ড্যালহৌসি পাহাড়ে থাকিতে আমার পিতা অর্ধরাত্রে উঠিয়া বারান্দায় বসিয়া উপাসনা করিতেন। আমাকে তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণ অভ্যাস করিবার জন্য রাত্রি চারিটার সময় উঠাইয়া দিতেন।

৩। শ্রীযুক্ত মধুসূদন বাচস্পতি মহাশয়কে আপনাদের প্রবন্ধে স্মৃতিরত্ন উপাধি দেওয়া হইয়াছে। নিশ্চয়ই সেটা বিস্মৃতিবশতই ঘটিয়াছে।

৪। অভিভাবকগণ যথেষ্ট বাল্যবয়সেই আমাকে স্কুলে দিয়াছিলেন, কিন্তু আমার অপেক্ষা অধিক বয়স্ক সঙ্গীগণ আমার পূর্বেই স্কুলে যাইবার অধিকার প্রাপ্ত হওয়াতে আমি ঈর্ষান্বিত হইয়া প্রভূত শোক প্রকাশ করিয়াছিলাম সে কথা যথার্থ। রবীন্দ্রনাথের জীবন কথা জানবার আগ্রহ দিনে দিনেই বাড়তে থাকে। এদিকে দ্বিজেন্দ্রলালের মন্তব্যের আঘাতে

রবীন্দ্রনাথ ব্যথিত হয়েছেন। এই সময় 'বেঙ্গলী' পত্রিকার সহ-সম্পাদক পদ্মিনীমোহন নিয়োগীর অনুরোধে ২৮ ভাদ্র ১৩১৭ (september 1910) পত্রিকার সংক্ষিপ্ত জীবনকথা লিখে দেন। কিন্তু এটিও প্রকৃত জীবনী হয়ে ওঠেনি।

৫.২। জীবনস্মৃতির খসড়া ও পাণ্ডুলিপি প্রসঙ্গ

আত্মকথা লেখার ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ খুবই সচেতন ছিলেন। এ ব্যাপারে তার দ্বিধা এবং সঙ্কোচ কাটিয়ে উঠতে বেশ সময় লেগেছে । আর সেই জন্যই একাধিক খসড়া রচনা করে বার বার নানা পরিবর্জন ও পরিবর্তন ঘটিয়েছেন।

পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ হিসাবে জীবনস্মৃতি প্রবাসীতে ধারাবাহিক প্রকাশের আগে (১৩১৮) তিনটি সংক্ষিপ্ত আত্মকথা লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের মনে জীবনচরিত লিখবার একটা আগ্রহ ধীরে ধীরে বাসা বাঁধতে থাকে। এ সম্পর্কে 'রবীন্দ্রনাথ চট্টগ্রাম' বইতে প্রতাপ কুমার মুখোপাধ্যায়, যামিনীকান্ত সেনের একটি লেখার উল্লেখ করে দাবি করেছেন, যামিনীকান্তই 'জীবনস্মৃতি'র প্রথম পাঠক ছিলেন। এটি ১৩১৩ সালের ঘটনা - "আপনি যদি আপনার জীবন সম্বন্ধে কিছু লেখেন তবে আপনার কবিতার রসভোগের পক্ষে খুবই সুবিধা হবে।" তিনি খুবই আগ্রহের সঙ্গে শুনলেন এবং আমার সহিত একমত হলেন, মনে হল। এর কিছুকাল পরে তিনি আমাকে হস্তলিখিত একখানি পান্ডুলিপি দিলেন পাঠ করতে। এটিই হচ্ছে তাঁর জীবনস্মৃতি। এটা হল ১৯০৬ সালের আগস্ট মাসের ঘটনা।

এই বিষয়টি সম্পর্কে রবিজীবনীতে প্রশান্ত কুমার পাল কিছু মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন- "কলকাতায় জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের উদ্বোধনী সভায় জাতীয় বিদ্যালয় প্রবন্ধ পাঠের পর তিনি (রবীন্দ্রনাথ) শান্তিনিকেতনে যান ও ২৮ ভাদ্রের (13 sept.) কয়েকদিন আগে পর্যন্ত প্রায় একমাস সেখানেই ছিলেন। সুতরাং যামিনীকান্ত কথিত জীবন বৃত্তান্ত লেখার অনুরোধ ও সেই অনুসারে কিছুদিন পরে হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি পড়তে দেওয়ার ঘটনা কেবল সেই সময়েই ঘটতে পারে। তবে 'এই হল জীবনস্মৃতির উৎপত্তির ইতিহাস'- অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের এই দাবীটি আমাদের একটু অতিরঞ্জিত বলে মনে হয়।" (রবিজীবনী-ষষ্ঠখণ্ড)

'জীবনস্মৃতি'র খসড়াটি লেখার কাল নির্ণয়ে রবিজীবনীর কিছু তথ্য দিয়েছেন। এখানে এ বিষয়ে 'রবিজীবনী'র অংশটি উদ্ধৃত করছি- "এখন প্রশ্ন এই যে এটি কখন লিখিত হয়েছিল? এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া, প্রথম পাণ্ডুলিপির ভূমিকায় প্রথম অনুচ্ছেদটির সঙ্গে 'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থে মুদ্রিত আত্মপরিচয়ের প্রথম দুটি অনুচ্ছেদ মিলিয়ে দেখলে। প্রথম পাণ্ডুলিপির পাঠটি এইরূপ- "আমার জীবন বৃত্তান্ত লিখিতে অনুরোধ আসিয়াছে। সে অনুরোধ পালন করিব বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছি। এখানে অনাবশ্যক বিনয় প্রকাশ করিয়া জায়গা জুড়িব না। কিন্তু নিজের কথা লিখিতে বসিলে যে অহমিকা আসিয়া পড়ে তাহার জন্য পাঠকদের কাছ হইতে ক্ষমা চাই।"

অপর রচনাটির প্রথমাংশ- "আমার জীবন বৃত্তান্ত লিখিতে আমি অনুরুদ্ধ হইয়াছি। এখানে আমি অনাবশ্যক বিনয় প্রকাশ করিয়া জায়গা জুড়িব না কিন্তু ইহাতে যে অহমিকা প্রকাশ পাইবে সেজন্য আমি পাঠকদের কাছে বিশেষ করিয়া কমা প্রার্থনা করি।"

এছাড়াও প্রথম পাণ্ডুলিপিতে তিনি লিখেছেন- "আমার হাতে আমারই রচিত অনেকগুলি পুরাতন চিঠি ফিরিয়া আসিয়াছে - বর্তমান প্রবন্ধে মাঝে মাঝে আমার এই চিঠিগুলি হইতে কোনো কোনো অংশ উদ্ধৃত করিব।"

'রবিজীবনী'র লেখক অনুমান করেছেল হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের অনুরোধেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবন বৃত্তান্ত প্রথম পাণ্ডুলিপিটি লিখতে শুরু করেন। কিন্তু ভূমিকা অংশ লেখার পরে সেটি কেটে দিয়ে অন্যভাবে লিখে বঙ্গবাসী কার্যালয়ে পাঠিয়েছিলেন।

প্রবাসীর পাঠে ভূমিকার ষষ্ঠ অনুচ্ছেদের পর অতিরিক্ত অংশ আছে- "এমনি করিয়া ছবি দেখিয়া প্রতিচ্ছবি আঁকার মতো কিছুদিন জীবনেরস্মৃতি লিখিয়া চলিয়াছিলাম। কিছুদুর পর্যন্ত লিখিতেই কাজের ভিড় আসিয়া পড়িল, লেখা বন্ধ হইয়া গেল।" সুতরাং 'জীবনস্মৃতি'র রচনাকাল নির্ণয় করা সহজসাধ্য নয়।

'জীবনস্মৃতি'র যে একাধিক পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় এটি হয়তো তেমনি একটা প্রাথমিক পাণ্ডুলিপি। এর কয়েক বছর পর **১৩১৮**র **২৩** বৈশাখ রবীন্দ্রনাথ একটি পাণ্ডুলিপি পড়ে শুনিয়েছিলেন শান্তিনিকেতনে । এই প্রসঙ্গে সীতাদেবী লিখেছেন- "তিনি বলিলেন, তার

চেয়ে এক কাজ করি সেটা তোমাদের বেশি interesting লাগবে। আমার লেখা জীবনস্মৃতি তোমাদের পড়ে শোনাই। সকলে মহোৎসাহে 'জীবনস্মৃতি' শুনিতে প্রস্তুত হইলাম। সেদিন ‘জীবনস্মৃতির' অনেকখানিই তিনি আমাদের পড়ে শুনাইয়াছিলেন। যতদূর মনে পড়ে এই বইখানি প্রকাশিত হইবার সময় কিছু পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হইয়াছিল।” এরপর ২৫ বৈশাখেও আরও খানিকটা অংশ পড়া হয়েছিল।

দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপি

দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপির সূচনা নিম্নলিখিতভাবে-

“এই লেখাটি জীবনী নহে। ইহা কেবল অতীতের স্মৃতিমাত্র। এই স্মৃতিতে অনেক বড়ো ঘটনা ছোটো এবং ছোটো ঘটনা বড়ো হইয়া উঠিয়াছে সন্দেহ নাই। যেখানে ফাঁকা ছিল না সেখানেও হয়তো ফাঁক পড়িয়াছে, যেখানে ফাঁক ছিল সেখানটাও হয়তো ভরা দেখাইতেছে। পৃথিবীর, স্তর যেরূপ পর্যায়ে সৃষ্টি হইয়াছিল আজ সর্বত্র সেরূপ পর্যায়ে রক্ষিত হয় নাই। অনেক উলটপালট হইয়া গিয়াছে। আমার স্মৃতিতে জীবনের স্তরপর্যায়, আজ হয়তো সকল জায়গায় ঠিক পরে পরে প্রকাশ পাইতেছে না, কোথাও হয়তো আগেকার কথা পরে, পরের কথা আগে আসিয়া পড়িয়াছে। অতএব ইহাতে জীবনের পুনরাবৃত্ত বলা চলে না। - ইহা স্মৃতির ছবি।

ইহার মধ্যে অত্যন্ত যথাযথ সংবাদ কেহ প্রত্যাশা করিবেন না-অতীত জীবন মনের মধ্যে যে রূপ ধারণ করিয়া উঠিয়াছে এই লেখায় সেই মূর্তিটি দেখা যাইবে।

জীবনস্মৃতির দ্বিতীয় পান্ডুলিপিতে তাঁর এই স্মৃতিমূলক রচনাটির স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট করেই বলেছেন বাস্তব জীবনের স্তর নির্ভর আলোচনা এখানে নেই। তাই জীবনস্মৃতিকে প্রচলিত অর্থে জীবনী বলা যাবেনা। পঞ্চাশ বছর পার হয়ে এসে রবীন্দ্রনাথ পিছন ফিরে তাকিয়েছেন। বিগত পঁচিশটি বছরের খণ্ড স্মৃতিগুলিকে রসাবরণে মন্ডিত করে পরিবেশন করেছেন। জীবন স্মৃতিতে অতীতের বিচিত্র বর্ণের ফুলগুলিকে নিয়ে তিনি মালা গেঁথেছেন। বিভিন্ন ফুলের রূপ ও গন্ধের মতোই জীবন স্মৃতির খণ্ড চিত্রগুলি মাধুর্যে ভরা। পরবর্তীকালে ‘ছেলেবেলা’-র ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন - “এই বইটির

বিষয়বস্তুর কিছু কিছু অংশ পাওয়া যাবে জীবনস্মৃতিতে, কিন্তু তার স্বাদ আলাদা। সরোবরের সঙ্গে ঝরনার তফাতের মতো। সে হল কাহিনি এ হল কাকলি; সেটা দেখা দিচ্ছে ঝুড়িতে এটা দেখা দিচ্ছে গাছে।"

রবীন্দ্র-জীবনের পচিশটি বছরের নানা ঘটনার কৌতুকী-পরিবেশনে পাঠকের চিত্তহরণ করেছে। অন্য দিকে সরস বাকভঙ্গিমার মধ্যে ফল্গুধারার মতো প্রবাহিত হয়েছে একটি বিশেষ কালের ইতিহাস চেতনা। একাধিক ব্যক্তি পরিচয়ে রবীন্দ্র-জীঝনের সঙ্গে যুক্ত মানুষগুলি ভূমিকা সদার্থক হয়ে উঠেছে।

৫.৩। বিভিন্ন চিঠিপত্রে জীবনস্মৃতি রচনার প্রসঙ্গ

"অতি বিশ্বাসযোগ্য তথ্য স্তুপাকার করে তা দিয়ে স্মরণ স্তম্ভ হতে পারে কিন্তু জীবন চরিত হবে কী করে? জীবন চরিত থেকে যদি বিস্মরণধর্মী জীবনটাই বাদ পড়ে তাহলে মৃত চরিত্রের কবরটাকে নিয়ে হবে কী?" [পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি]

চারুচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ে সঙ্গে পত্রালাপ- "আসল কথা হচ্ছে এই যে, তুমি ইহকাল পরকাল সকল দিক সম্পূর্ণ বিবেচনা না করে এই প্রস্তাবটি করেছ, না, সম্পাদকীয় দুর্মুখ লোভে সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে এই দুঃসাহসিকতায় প্রবৃত্ত হচ্ছে, তা আমি নিশ্চয় বুঝতে পারছি নে বলে কিছু স্থির করতে পারছি নে। তোমার বয়স অল্প, হঠকারিতাই, তোমার পক্ষে স্বাভাবিক ও শোভন : অতএব এ সম্বন্ধে রামানন্দবাবুর মত কী, তা না জেনে তোমাদের মাসিক পাত্রের black and white-এ আমার জীবনটার একগালে চুন ও একগালে কালী লেপন করতে পারব না। পঞ্চাশ পেরলে লোকে প্রগলভ হবার অধিকার লাভ করে, কিন্তু তবু সাদাচুল ও শ্বেতশ্মশ্রুতেও অহমিকা একেবারে সম্পূর্ণ শুভ্র করে তুলতে পাবে না।" ৬ জ্যেষ্ঠ ১৩১৮ [চিঠিপত্র - ১৪]

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত অনুরোধের উত্তরে কবি লেখেন- "আমার জীবনস্মৃতি বাহির করিবার পক্ষে আপনার অনুরোধ ছাড়াও আর একটি কারণ ঘটিয়াছে। আমার বিদ্যালয়ের কোনো অত্যুৎসাহী শিক্ষক আমার এ লেখা নকল করিয়া মফঃস্বলে কোনো সভায় আমার জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে পাঠ করিতে পাঠাইয়াছেন। প্রকাশ না করিবার জন্য

তিনি অনুরোধ করিয়াছেন কিন্তু ইহার অযথা ব্যবহার হওয়ার আশঙ্কা যখন আছে তখন বিকৃতি লাভের পূর্বেই ওটাকে ছাপার অক্ষরে ধ্রুব করিয়া রাখা ভাল।" ৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮ [চিঠিপত্র--১২]

"জীবনস্মৃতি কপি করিতে দিলাম। কিন্তু আমার মনে হয় অজিতের লেখার প্রথম কিস্তি বাহির হইয়া গেলে এই প্রবন্ধে প্রকাশ হওয়া উচিত। অজিত আমার যদি পাঠকের মনে কৌতূহল জাগ্রত হয় তবে এ লেখাটা তাঁহারা ঠিকভাবে গ্রহণ - করিত পারিবেন এবং অজিতেরই লেখার অনুবৃত্তি রূপে এই জীবনস্মৃতির উপযোগিতা কতকটা পরিমাণে আছে।

জীবনস্মৃতি অনেকটা পরিবর্ধিত ও পরিবর্তিত হইতেছে- সমস্তটাই আবার নূতন করিয়া লিখিতে হইতেছে। ... যদি কোনোখানে লেশমাত্র অহমিকা বা অনাবশ্যক প্রগলভতা প্রকাশ হইয়া থাকে তাহা নির্মম ভাবে কাটিয়া দিবেন। নিজের কথা বলিবার সময় কথার ওজন থাকে না। যেসব বৃত্তান্তকে অত্যন্ত ঔৎসুক্যজনক মন বলিয়া বোধ করি তাহা সাধারণের কাছে তুচ্ছ ও বিরক্তিকর হইতে পারে।" ১৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮ [চিঠিপত্র-১২]

একই তারিখে চারুচন্দ্রকে লিখেছেন- "তোমার হাতেই জীবন সমর্পণ করা গেল, রামানন্দবাবুকে লিখছি"।

এর কয়েকদিন পরে আবার লিখেছেন- "জীবনস্মৃতি তোমাদের হাতে পূর্বেই সমর্পণ করেছি। ভূমিকাটি আগাগোড়া বদলে দিয়েছি বোধহয় দেখেছ__জিনিসটাকে সাধারণ পাঠকের সুখপাঠ্য করবার চেষ্টা করেছি-অর্থাৎ আমার জীবন বলে একটা বিশেষ গন্ধ যাতে প্রবল হয়ে না ওঠে তার জন্য আমার চেষ্টার ত্রুটি হয়নি-আমারও বিশ্বাস ওতে বিশুদ্ধ সাহিত্যের সৌরভ ফুটে উঠেছে কিন্তু আপরিতোষাদ বিদুসাং ইত্যাদি।" জুন ১৯১১ [চিঠিপত্র-১৪]

কবিকে (সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত) আমার জীবনীটা পড়িয়ে দিয়ো। সে ওতিন্মাদক সম্পাদক শ্রেণীর নহে সুতরাং তার হৃদয় কোমল- অতএব সে ওটা পড়িয়া কিরূপ বিচার করে জানিতে ইচ্ছা করি। ২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮[চিঠিপত্র-১৪]

জীবনস্মৃতিটা নিয়ে পড়েছি-ওটাও সাফসোফ করে দিচ্ছি-খুব মনোযোগ করে দেখলুম, এ রচনাটা সাহিত্যে চলবার মতো হয়েছে-নইলে কিছুতেই আমি দিতুম না। ২৯ আষাঢ় ১৩১৮ [চিঠিপত্র- ১৪]

জীবন স্মৃতির প্রুফ না হউক ফাইলটা আমার কাছে পাঠাইবেন। কেননা কিছু কিছু বাড়ানো চলিতেছে। আপনি যদি 'জীবনস্মৃতি'র সমস্ত কপি আমার কাছে রেজিস্ট্রি করিয়া পাঠান তবে তাহার উপর শেষ ছবির পোঁচ দিয়া সমস্তটা সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারি। ৮ ফাল্গুন ১৩১৮ [চিঠিপত্র- ১২]

আবার লিখছেন-

'জীবনস্মৃতি'র শেষের কথাগুলো মোটামুটি ভাবে লিখিয়া ফেলিতে ইচ্ছা আছে। কিন্তু মেয়াদ ফুরাইয়া আসিল-ছুটি আর ত বাকি নাই। এই কয়দিনের মধ্যে কতটুকুই বা লিখিতে পারিব? ১৩ ফাল্গুন ১৩১৮[চিঠিপত্র ১২]

কয়েকদিন পরে প্রিয়ম্বদা দেবীকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন- "আমার যেটুকু বলবার আছে, জীবনস্মৃতিতে বলেছি- এই অংশকে ছাপাবার সময় আরও কিছু কিছু যোগ করে দেওয়া যাবে।" ২৫ ফাল্গুন ১৩১৮ [রবীন্দ্রনাথ]

৫.৪। জীবনস্মৃতির ভূমিকা প্রসঙ্গ

জীবনস্মৃতিকে কোনো মতেই জীবনে নিষ্প্রাণ তথ্য জর্জরিত জীবনী করে তুলতে চাননি রবীন্দ্রনাথ। আর সেই জন্যই বার বার তিনি রচনাটির পরিবর্তন, পরিবর্ধন এবং পরিমার্জন করেছেন। এ থেকে বোঝা যায় জীবনস্মৃতিকে তিনি কোনোমতেই 'অতি বিশ্বাসযোগ্য তথা স্তূপাকার করে তাকে 'স্মরণ স্তম্ভ করে তুলতে চান নি, জীবনচরিত থেকে তিনি 'বিস্মরণ ধর্মী' জীবনটাকে বাদ দিতে চান নি।

তাই বার বার সচেতন ভাবেই রচনাটির পরিবর্তন পরিমার্জন করেছেন। তার এই বিশেষ ধ্যানধারণার কিছুটা পরিচয় মেলে ভূমিকাতে। এ বিষয়ে চারুচন্দ্রকে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "ভূমিকাটি আগাগোড়া বদলে দিয়েছি"। কবির এই বক্তব্যের সমর্থন মেলে

জীবনস্মৃতির প্রথম ও দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপিতে সম্পূর্ণ দুটি পৃথক ভূমিকা বা সূচনা। মুদ্রিত ভূমিকাংশটির সঙ্গে মিলিয়ে পড়লেই এই পার্থক্য ধরা পড়বে।

জীবনস্মৃতির প্রচলিত সংস্করণের সূচনায় রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য আছে নিম্নরূপ- “স্মৃতির পটে জীবনের ছবি কে আঁকিয়া যায় জানি না। কিন্তু যেই আঁকুক, সে ছবিই আঁকে; অর্থাৎ যাহা, কিছু ঘটিতেছে তাহার অবিকল নকল করিবার জন্য সে তুলি হাতে বসিয়া নাই। সে আপনার অভিরুচি অনুসারে কত কী বাদ দেয়। কত কী রাখে। কত বড়োকে ছোটো করে, ছোটোকে বড়ো করিয়া তোলে। সে আগের জিনিসকে পাছে ও পাছের জিনিসকে আগে সাজাইতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে না। বস্তুত, তাহার কাজই ছবি আঁকা, ইতিহাস লেখা নয়।

এই স্মৃতিচিত্রগুলিও সেইরূপ সাহিত্যের সামগ্রী। ইহাকে জীবন বৃত্তান্ত লিখিবার চেষ্টা হিসাবে গণ্য করিলে ভুল করা হইবে। সে হিসাবে এ লেখা নিতান্ত অসম্পূর্ণ এবং অনাবশ্যক।”

অন্যদিকে প্রথম পাণুলিপির ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন- “আমার জীবন বৃত্তান্ত লিখিতে অনুরোধ আসিয়াছে। সে অনুরোধ পালণ করিব বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছি। এখানে অনাবশ্যক বিনয় প্রকাশ করিয়া জায়গা জুড়িব না। কিন্তু নিজের কথা লিখিতে বসিলে যে-অহমিকা আসিয়া পড়ে তাহার জন্য পাঠকের কাছ হইতে ক্ষমা চাই।”

দ্বিতীয় খসড়া পান্ডুলিপিতে আবার বদল হল কবির আত্মকথন। এবার তিনি লিখলেন- “এই লেখাটি জীবনী নহে। ইহা কেবল অতীতের স্মৃতি মাত্র। এই স্মৃতিতে অনেক বড়ো ঘটনা ছোটো এবং ছোটো ঘটনা বড়ো হইয়া উঠিয়াছে। সন্দেহ নাই যেখানে ফাঁক ছিল না সেখানেও হয়তো ফাঁকা পড়িয়াছে, যেখানে ফাঁক ছিল সেখানটাও হয়তো ভরা দেখাইতেছে। পৃথিবীর স্তর যেরূপ পর্যায়ে সৃষ্ট হইয়াছিল, আজ সর্বত্র সেরূপ পর্যায়ে সর্বত্র রক্ষিত হয় নাই। অনেক স্থানে উলট পালট হইয়া গিয়াছে। আমার স্মৃতিতে জীবনের কোথাও হয়তো আগেকার কথা পরে, পরের কথা আগে আসিয়া পড়িয়াছে। অতএব ইহাকে জীবনের পুনরাবৃত্ত বলা চলে না - ইহা স্মৃতির ছবি। ইহার মধ্যে অত্যন্ত যথাযথ

সংবাদ কেহ প্রত্যাশা করিবেন না-অতীত জীবন মনের মধ্যে যে-রূপ ধারণ করিয়া উঠিয়াছে এই লেখায় সেই মূর্তিটি দেখা যাইবে।

৫.৫। জীবনস্মৃতি প্রকাশনা প্রসঙ্গ

জীবনস্মৃতি প্রকাশিত হয় ১৩১৯ বঙ্গাব্দের ৯ শ্রাবণ (২৫ জুলাই ১৯১২)। প্রচ্ছদে ছিল নন্দলাল বসুর আঁকা পদ্মফুলের পাপড়ি-খসার একটি ছবি। এই একই ছবি ছিন্নপত্রের প্রচ্ছদেও ব্যবহার করা হয়।

প্রথম প্রকাশের সময় এই বইটির বিশেষ দ্রষ্টব্য ছিল ২৪টি আর্ট প্লেট। একটি ছাড়া অন্যগুলি গগনেন্দ্রনাথের আঁকা। প্রবেশক বা মুখপাতের ছবিটি ছিল কিশোর কবি রবীন্দ্রনাথের মুখচ্ছবির জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আঁকা একটি স্কেচ। বিদেশ থেকে রবীন্দ্রনাথ চারুচন্দ্রকে লিখেছিলেন- "জীবনস্মৃতিতে গগনের ছবিগুলি ভারি চমৎকার হয়েছে। এঁরা সেগুলোর খুব প্রশংসা করেছেন।"

রবীন্দ্রনাথের মুখাকৃতি ছাড়া পরবর্তী মুদ্রণগুলিতে এই ছবিগুলি আর পাওয়া যায় না। তবে অনেক পরে চতুর্থ সংস্করণে (জ্যৈষ্ঠ-মাঘ ১৩৬৮) এগুলি পুনমুদ্রিত হয়েছিল। প্রথম সংস্করণের কয়েকটি মুদ্রণে পর ১৩৫০ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণে জীবনস্মৃতির একটি গ্রন্থপরিচয় যুক্ত সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ওই বছরের ফাল্গুনে বিশ্বভারতীর রচনাবলীতে জীবনস্মৃতি অন্তর্ভুক্ত হয়।

১৩৫৪ জ্যৈষ্ঠের পুনমুরণে (প্রকৃতপক্ষে পৃথক সংস্করণে) গ্রন্থপরিচয়টি বহুল পরিমাণে বাড়ানো হয়। ১৩৬০ জ্যৈষ্ঠের পুনর্মুদ্রণে বলা হয়- "এখন হইতে জীবনস্মৃতির প্রকাশ দুইরূপ হইল। সুলভ সংস্করণে বিস্তৃত গ্রন্থপরিচয় বা উল্লেখপঞ্জী দেওয়া হইল না। ইহা দ্বারা মূল গ্রন্থে, বংশ তালিকা, এবং তথ্যপঞ্জী, এগুলি উভয় সংস্করণেই অভিন্ন।"

৫.৬। অনুশীলনী

১। রবীন্দ্রনাথের আত্মজীবনী 'জীবনস্মৃতি' রচনার উৎস সম্পর্কে আলোচনা করুন।

২। রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি রচনার খসড়া ও পাণ্ডুলিপি প্রসঙ্গে আলোচনা করুন।

৩। রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন চিঠিপত্রের মধ্য দিয়ে কিভাবে তাঁর আত্মজীবনী 'জীবনস্মৃতি' রচনা প্রসঙ্গের উল্লেখ পাওয়া যায় সে সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৪। জীবনস্মৃতি গ্রন্থের ভূমিকা এবং প্রকাশনা প্রসঙ্গ সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৫.৭। গ্রন্থপঞ্জি

১। রবীন্দ্রবিচিত্রা - প্রমথনাথ বিশী।

২। আত্মজীবনী : জীবনী ও রবীন্দ্রনাথ - শিশির কুমার দাশ।

৩। আমার রবীন্দ্রনাথ - পূর্ণেন্দু পত্রী।

৪। স্মৃতির ছবি জীবনস্মৃতি - স্মরণ আচার্য।

একক:৬। রবীন্দ্র জীবন পর্বের নানান অভিজ্ঞতার পরিচয়

বিন্যাসক্রম

৬.১। শিক্ষাজীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা

৬.২। বাল্য জীবনের অভিজ্ঞতা

৬.৩। পিতার সান্নিধ্য ও বাহির যাত্রা

৬.৪। কাব্যচর্চার সূচনা

৬.৫। বিভিন্ন গ্রন্থ্ প্রকাশ

৬.৬। সংগীত চর্চার সূচনা

৬.৭। স্বাদেশিকতা প্রসঙ্গ

৬.৮। অনুশীলনী

৬.৯। গ্রন্থপঞ্জি

৬.১। শিক্ষাজীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা

জীবন স্মৃতির সূচনা রবীন্দ্রনাথের শিক্ষারম্ভের ইতিকথা দিয়ে। শিক্ষারম্ভের যে চিত্রটি রবীন্দ্রনাথ তুলে ধরেছেন, সেটির অনেকটাই কল্পনার মাধুর্যে উজ্জ্বল। কারণ প্রায় সাড়ে চার দশকের স্মৃতি স্বাভাবিক কারণেই কিছু মলিন হয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার স্পর্শে অতীত দিনের স্মৃতিগুলি আশ্চর্য রূপে সজীব হয়ে উঠেছে।

উনিশ শতকে, প্রাথমিক পর্বে শিক্ষা সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার একটা ছবি যেমন চিনে নিতে ভুল হয়না আমাদের। অতীতের আলো-আধারি পথ ধরেই শিক্ষাজীবনের সূচনার

বিবরণটি দিয়েছেন তিনি। তিনটি বালক একসঙ্গে মানুষ হয়েছিলেন। কবে তাদের গুরুমহাশয়ের কাছে পড়া শুরু হয়েছিল তার সঠিক কাল লেখকের জানা নেই। এইটুকু তার মনে নড়ে। এই বাক্যটির প্রভাব শিশুমনে কত প্রবল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল তা একটি বাক্যে অসাধারণ ব্যঞ্জনায় প্রকাশ করেছেন রবীন্দ্রনাথ।

তাঁর কথায়- "আমার জীবনে এইটই আদি কবির প্রথম কবিতা"। মিল এবং ছন্দোময় অনুভবের সূচনা এখান থেকেই- "রবীন্দ্রনাথের বাল্যস্মৃতির মণিকোঠায় একটি নাম উজ্জ্বল হয়ে আছে, সে নামটি কৈলাস মুখুজ্জে। তাঁর কৌতুকপ্রিয়তা শিশুমনকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল-লোকটি ভারি রসিক। মৃত্যুর পরেও কৌতুকপ্রিয়তা কমেনি। প্ল্যানচেটে তাঁর কাছে জানতে চাওয়া হয়, সে এখন যেখানে আছে সেখানকার ব্যবস্থাদি কেমন। উত্তরে সে জানায়- 'আমি মরিয়া যাহা জানিয়াছি, আপনারা বাঁচিয়াই তাহা ফাঁকি দিয়া জানিতে চান? সেটি হইবে না।'

রবীন্দ্রজীবনে এই মানুষটির অবদান তুচ্ছ নয়। কৈলাস মুখুজ্জে দ্রুতবেগে ছড়া বলে বালকের মনোরঞ্জন করত। দ্রুত-উচ্চারিত অনর্গল শব্দচ্ছটা এবং ছন্দের দোলা রবীন্দ্রনাথের স্পর্শকাতর মনকে আচ্ছন্ন করত। তাই তিনি লিখেছেন- "আর মনে পড়ে, বৃষ্টি পড়ে টপুর টুপুর নদেয় এল বাণ। ওই ছড়াটি যেন শৈশবের মেঘদূত।"

এরপর ইস্কুলে যাওয়ার সূচনা। দাদা এবং বয়োজ্যেষ্ঠ ভাগিনেয় সত্য নিয়মিত স্কুলে যেতে শুরু করেছে। তারা ইস্কুল পথের কাহিনি অতিরঞ্জিত করে বলত। তাই রবীন্দ্রনাথের ঘরে আর মন টেকে না। ইস্কুল যাওয়ার জন্য উচ্চস্বরে কানা ছাড়া তাঁর আর কিছুই করার ছিল না। সেই সময় তাঁর শিক্ষক একটি সারগর্ভ কথা বলেছিলেন, যা দীর্ঘ দিন পরেও তাঁর মনে ছিল- 'এখন ইস্কুলে যাবার জন্য যেমন কাঁদিতেই, না যাইবার জন্য ইহার চেয়ে অনেক বেশি কাঁদিতে হইবে।'

শিক্ষকের এই উক্তিটিকে রবীন্দ্রনাথ অব্যর্থ ভবিষ্যদ্বাণী বলেছেন। কান্নার জোরেই অকালে ভর্তি হলেন ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে। গৌরমোহন আঢ্যের স্থাপিত বিদ্যালয়, ১৮২৩ এই বিদ্যালয়ে তাঁর শিক্ষালাভের অভিজ্ঞতা থেকে শাসন প্রণালীর বিষয়টিই বেশি মনে আছে।

এই ভাবেই সূচনা হল রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাজীবন। চাকরদের মহলে প্রচলিত বইগুলি দিয়েই তাঁর সাহিত্য চর্চার সূত্রপাত।

এই অনুচ্ছেদ কৌতুকর ঘটনার সরস বর্ণনা আছে। সত্যর ভয় দেখানো পুলিশম্যানের ডাক, মায়ের কাছে আশ্রয় প্রভৃতির কথা অতি নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে তুলে ধরেছেন লেখক। রামায়ণের করুণ বর্ণনা বালক রবীন্দ্রনাথকে কতখানি বিচলিত করেছিল সে কথাও বলতে ভোলেননি লেখক।

নর্মাল স্কুল

ওরিয়েন্টাল সেমিনারি পড়বার সময় বালক মনের এক বিচিত্র বালক মনের এক বিচিত্র খেয়ালের বর্ণনা দিয়েছেন জীবনস্মৃতিতে। ওরিয়েন্টাল সেমিনারির শিক্ষকদের অশালীন ব্যবহার এবং পীড়ন বালকের মনে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। বারান্দার রেলিংগুলোকে নিয়ে তিনি একটা ক্লাশ খুলেছিলেন। ভালোমানুষ রেলিং দুষ্টু রেলিং প্রভৃতিদের ভালো করেই চিনতেন বালক শিক্ষক। আর এই নীরব ক্লাশটির উপর ভয়ংকর মাস্টারি করে তৃপ্তি লাভ করেছেন তিনি। রবীন্দ্রনাথের কথায়- “শিক্ষাদান ব্যাপারের মধ্যে যে সমস্ত অবিচার অধৈর্য, ক্রোধ, পক্ষপাতপরতা ছিল অন্যান্য বিষয়ের চেয়ে সেটা অতি সহজেই আয়ত্ব করিয়া লইয়াছিলাম।

ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে বেশিদিন থাকেন নি রবীন্দ্রনাথ। তারপর এলেন নর্মাল স্কুলে (১৮৫৫ সালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের তত্বাবধানে স্থাপিত হয়)। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাজীবনে এই স্কুলের অভিজ্ঞতা আদৌ সুখকর হয়নি।

নানা বিদ্যার আয়োজন

রবীন্দ্রনাথ তথাকথিত ডিগ্রিধারী উচ্চশিক্ষিত ছিলেন না। কিন্তু বাল্যকালেই নির্ধারিত পাঠক্রমের বাইরে নানাবিধ শিক্ষায় তিনি শিক্ষিত হয়েছেন। এ বিষয়ে নানা বিদ্যার আয়োজন শিরোনামের পরিচ্ছেদটিতে তিনি বাল্যকালের বহুবিধ শিক্ষার এক অতি মনোজ্ঞ বিবরণ দিয়েছেন। বিচিত্র বিষয়ে শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রধান উৎসাহ দাতা ছিলেন তাঁর মেজদাদা। (হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর , দেবেন্দ্রনাথের তৃতীয় পুত্র)

নর্মাল স্কুলের শিক্ষক নীলকমল ঘোষাল ছিলেন রবীন্দ্রনাথের গৃহশিক্ষক। এই শিক্ষকটি সম্পর্কে তাঁর কৌতুককর উক্তিটি উল্লেখ্য- 'তাঁহাকে মানুষজন্মধারী একটি ছিপছিপে বেতের মতো বোধ হইত।'' এই শিক্ষকের কাছেই রবীন্দ্রনাথ 'চারুপাঠ', 'বস্তুবিচার', 'প্রাণিবৃতান্ত' ছাড়াও মাইকেলের 'মেঘনাদ বধ' কাব্যের পাঠ নিয়েছিলেন।

এখানেই শেষ নয়। স্কুল থেকে ফিরে ড্রয়িং এবং জিমনাস্টিক। সন্ধে অঘোরবাবুর কাছে ইংরেজি পড়া। রবিবার সকালে বিষ্ণুবাবুর কাছে গান শিক্ষা (বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্তী)।

প্রকৃতি বিজ্ঞান শিক্ষা দিতেন সীতানাথ দত্ত। নানা পরীক্ষায় তিনি বিষয়টিকে আকর্ষণীয় করে তুলতেন। তাঁর শিক্ষাপ্রণালী বালক রবীন্দ্রনাথের কাছে বিশেষ ঔৎসুক্যজনক ছিল।

এ ছাড়াও ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলের একটি ছাত্রের কাছে অস্থিবিদ্যা শিখতে হত তাঁকে (তার দিয়া জোড়া একটি নরকঙ্কাল কিনিয়া আনিয়া আমাদের ইস্কুলঘরে লটকাইয়া দেওয়া হইল) [গল্পগুচ্ছের 'কঙ্কাল' গল্পটি স্মরণীয়]। হেরম্ব তত্ত্বরত্ন মুগ্ধ বোধের সূত্র মুখস্ত করাতেন। মেডিকেল কলেজের ছাত্র অঘোরবাবু সন্ধ্যায় পড়াতে আসতেন। এই সময়টি ভাষা শিক্ষার উপযুক্ত সময় বলে রবীন্দ্রনাথের মনে হয়নি।

বাংলা শিক্ষার অবসান

ছাত্রবৃত্তি ক্লাসের এক ক্লাস নীচে বাংলা পড়া চলছে। কিন্তু এর মধ্যেই ক্লাসের বাংলা পাঠ্য বিষয় ছাড়িয়ে অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছেন পড়ুয়ারা। অক্ষয়কুমার দত্তের পদার্থবিদ্যা শেষ হয়েছে, শেষ হয়েছে মেঘনাদবধ কাব্য। মেঘনাদবধ কাব্য বালক রবীন্দ্রনাথের কাছে খুব পীড়াদায়ক হয়েছিল।

এই সময় নর্মাল স্কুলের পালা শেষ হল। একটি কৌতুকর ঘটনার মধ্যে দিয়েই তাঁর বাংলা শিক্ষার অবসান ঘটেছিল। কিশোরী মোহন মিত্রের লেখা রবীন্দ্রনাথের পিতামহের (দ্বারকানাথ ঠাকুর) একখানি জীবনী পড়তে চেয়েছিলেন বিদ্যালয়ের কোনো একজন শিক্ষক। ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ রবীন্দ্রনাথের পিতৃদেবের কাছে বইখানি চাইতে গিয়েছিল। এই সময় তার মনে হল, সকলে সচরাচর যে ভাষায় কথা বলে সে ভাবায় তাঁর কাছে কথা বলা চলবে না। সেইজন্য সে 'সাধু গৌড়ীয় ভাষায় এমন অনিন্দনীয় রীতিতে বাক্য

বিন্যাস' করেছিল। নীলকমল পণ্ডিত মশাই বিদায় নিলেন। যাবার আগে বলে গেলেন- 'তোমাদের যাহা শিখাইয়াছি ভবিষ্যতে তাহার মূল্য বুঝিতে পারিবে'। সেদিনের সেই বাংলা পাঠ যে রবীন্দ্রনাথের জীবনে যথেষ্ট কার্যকরী হয়েছিল সে কথা অকুণ্ঠ চিত্তে স্বীকার করেছেন রবীন্দ্রনাথ। চারিদিকে যখন ইংরেজি পড়বার ধুম, তখন সাহস করে বাংলা শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন সেজদাদা।

নর্মাল স্কুল ছেড়ে একটি ফিরিঙ্গি স্কুল বেঙ্গল একাডেমিতে [ডিকরূজ সাহের স্কুল] ভর্তি হলেন রবীন্দ্রনাথ। এই স্কুলে পড়বার সময় যথেষ্ট স্বাধীনতা পেয়েছিলেন তিনি। তাছাড়া এই স্কুলের ছেলেরা দুবৃত্ত ছিলনা। ছোটো স্কুল, আয়ত্ত অল্প। তাই যেহেতু রবীন্দ্রনাথ মাসে মাসে নিয়মিত বেতন দিয়ে দিতেন সেহেতু অধ্যক্ষ তাঁর উপর সন্তুষ্ট ছিলেন।

স্কুলের পরিবেশ রবীন্দ্রনাথকে যথেষ্ট পীড়িত করেছে। স্কুলের ঘরগুলিকে তাঁর মনে হয়েছে নির্মম পাহারাওয়ালার মতো আর এই পরিবেশ থেকে পলায়নের পথ খুঁজেছেন তিনি।

ঘরের পড়া

কোনোমতেই ইস্কুলের চার দেয়ালের মধ্যে বেঁধে রাখা গেল না রবীন্দ্রনাথকে জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য বাড়ির শিক্ষক। তিনি কুমারসম্ভব কাব্যখানির বাংলা অনুবাদ পড়াতে শুরু করলেন- এছাড়াও ম্যাকবেথ বাংলায় মানে করে দিতেন। সেই সঙ্গেই চলল ম্যাকবেথের তর্জমা। এই ভাবেই বইটির অনুবাদ শেষ হল।

রামসর্বস্ব (রামসর্বস্ব ভট্টাচার্য - হেড পণ্ডিত মেট্রোপলিটান ইন্সটিটিউশন) সংস্কৃত পড়াবার ভার নিয়েছিলেন। তিনি শকুন্তলা পড়ালেন। রামসর্বস্ব পণ্ডিতমশায় ম্যাকবেথ অনুবাদ শোনাবার জন্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কাছে নিয়ে গেলেন। বিদ্যাসাগর বালক রবীন্দ্রনাথকে উৎসাহই দিয়েছিলেন। সেখানে রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন। রাজকৃষ্ণবাবু নাটকের ডাইনীর সংলাপগুলি ভাষা ও ছন্দের কিছু বিশেষত্ব থাকা উচিত বলে মন্তব্য করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের বাল্যকালে শিশুসাহিত্যের বিশেষ প্রচার ছিল না। বাংলার সমস্ত অপাঠ্য বই এর মধ্যেই তিনি শেষ করেছিলেন। এই বইগুলির যা বুঝতেন বা যা বুঝতেন না সবই তাঁর মনের উপর কাজ করে যেত।

দীনবন্ধু মিত্রের 'জামাইবারিক' প্রসহনটি যখন প্রকাশিত হয় (১৮৭২) তখন সেটি পড়বার বয়স রবীন্দ্রনাথের হয়নি। কিন্তু নানা কৌশলে বইখানি সংগ্রহ করে গড়ে ফেললেন তিনি। এজন্য অবশ্য আত্মীয়ার ভৎর্সনা যথেষ্ট কঠোর হয়নি।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র 'বিবিধার্থ-সংগ্রহ' (মাসিকপত্র ১৮৫১) নামে একখানি ছবিওয়ালা বই প্রকাশ করেছিলেন। পরম আগ্রহে তিনি বইখানি পড়েছিলেন। এই জাতীয় বই বাংলায় প্রকাশিত হয়নি বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। প্রসঙ্গতঃ তিনি বিলাতের চেম্বার্স জার্নাল কাসলস ম্যাগাজিন, স্ট্রান্ড ম্যাগাজিন প্রভৃতির নাম উল্লেখ করেছেন।

এরপর আর একটি ছোটো কাগজের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় হল। সেখানির নাম 'অবোধ বন্ধু' প্রকাশ ১৮৬৩। এই পত্রিকাখানিতেই রবীন্দ্রনাথ প্রথম বিহারীলাল চক্রবর্তীর কবিতা পড়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন- "তাঁহার সেইসব কবিতা সরল বাঁশির সুরে আমার মনের মধ্যে মাঠের ও বনের গানবাজাইয়া তুলিত।"

অবোধ বন্ধুতেই তিনি বিলাতি পৌলবর্জিনী গল্প পড়ে চোখের জল ফেলেছিলেন। শুরু হল সাহিত্যের নতুন অধ্যায় - "বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন (প্রকাশ ১৮৭২ এপ্রিল) আসিয়া বাঙালির হৃদয় একেবারে লুঠ করিয়া লইল। বঙ্গদর্শন রবীন্দ্রনাথের জীবনে যে কী অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করেছিল তার বিস্তৃত বিবরণ আছে এই অধ্যায়ে। 'বিষবৃক্ষ' চন্দ্রশেখর প্রভৃতি পড়ার এক আশ্চর্য অনুভূতির সবিস্তার বর্ণনা জীবনস্মৃতিতে আছে।

এছাড়াও সারদাচরণ মিত্র ও অক্ষয় সরকারের 'প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ' রবীন্দ্রনাথের আর একটি লোভের সামগ্রী ছিল। বিদ্যাপতির মৈথিলী পদগুলির অস্পষ্টতা তাঁর কাছে বিশেষ আকর্ষনীয় বিষয় হয়েছিল। দুরূহ শব্দগুলি তিনি ছোটো বাঁধানো খাতায় নোট করে রাখতেন।

৬.২। বাল্য জীবনের অভিজ্ঞতা

জীবনস্মৃতির কয়েকটি পরিচ্ছেদে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বাল্যজীবনের স্মৃতিরোমন্থন করেছেন। ঠাকুর পরিবার নানা কারণেই নানা দিক থেকে ছিল স্বতন্ত্র। তার আভিজাত্য ও ঐতিহ্যের কিছুটা পরিচয় মিলবে রবীন্দ্রনাথ কথিত বাল্য অভিজ্ঞতার মধ্যে। পরবর্তীকালে রবীন্দ্র কবিমানস গঠনের অনেক উপাদানের সন্ধান, তাঁর বাল্য অভিজ্ঞতার মধ্যে নিহিত।

ঘর ও বাহির

জীবনস্মৃতির ঘর ও বাহির অধ্যায়টিতে ভেসে উঠেছে বাল্যজীবনের অনেক জলছবি। একদিকে বালক রবীন্দ্রনাথের প্রাত্যহিক জীবনযাপনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা অন্যদিকে বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে প্রকৃতির সঙ্গে অনুভবের গভীর মেলবন্ধনের ইতিকথা । ঘর ও বাহির অংশটির মূলকথা এটি।

অতীতচারি রবীন্দ্রনাথ বলেছেন- "ছেলেবেলার দিকে যখন তাকানো যায় তখন সবচেয়ে এই কথাটা মনে পড়ে যে, তখন জগৎটা এবং জীবনটা রহস্যে পরিপূর্ণ।" বাল্যের এই রহস্যময় জীবনের পাপড়িগুলি একে একে মেলে ধরেছেন এই অধ্যায়টিতে।

রবীন্দ্রনাথের বাল্যজীবন কেটেছে একান্তই সাদাসিধে ভাবে। সেখানে ভোগবিলাসের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেবার কথা কেউ চিন্তা করেনি। চাকরদের শাসনের অধীনেই বাল্যকাল কেটেছে রবীন্দ্রনাথের, কিন্তু সেজন্য কোনো ক্ষোভ ছিলনা বালকের মনে। তাই তিনি বলেছেন- "অনাদর একটা মস্ত স্বাধীনতা-সেই স্বাধীনতায় আমাদের মন মুক্ত ছিল।"

শৌখিনতা দূরে থাক- কাপড় চোপড়ের যা ব্যবস্থা আজকের দিনের বালকের পক্ষে তা সম্মানহানিকর। বালক রবীন্দ্রনাথের শুধু একটিই দুঃখ ছিল বাড়ির দরজি নেয়ামত খালিফা তাঁদের জামায় পকেট যোজনায় কার্পণ্য দেখিয়েছিল। জুতো এক জোড়া ছিল। কিন্তু পা ও জুতা কোনো সময়েই একসঙ্গে থাকত না।

বড়োদের জীবনযাত্রার বিভিন্ন বিষয় থেকে ছোটোরা ছিল অনেক দূরে। রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছেন-"তাঁহার আভাস পাইতাম নাগাল পাইতাম না"। ঠাকুরবাড়ির বালকেরা সেদিন

অল্পেই সন্তুষ্ট ছিল। যা কিছু তারা পেত তার শেষ বিন্দু রসটুকু উপভোগ করতে তারা ছাড়ত না।

চাকরদের মহলেই বালকদের দিন কাটত। বালকদের দেখাশোনার জন্য একজন চাকর ছিল তার নাম শ্যাম। সে রবীন্দ্রনাথকে একটি নির্দিষ্ট স্থানে বসিয়ে চারিদিকে গণ্ডি কেটে দিত। বলে দিত গণ্ডির বাইরে গেলেই বিষম বিপদ। গণ্ডি পার হলে কি সর্বনাশ হয় রামায়ণে সীতার ঘটনাটি তাঁর জানা ছিল। তাই সে গণ্ডিটাকে অবিশ্বাস করতে পারেনি।

বালক রবীন্দ্রনাথের ঘরের জানলার নীচে একটি ঘাটবাঁধানো পুকুর ছিল। এই পুকুরটির চারপাশের চিত্রটি রবীন্দ্রনাথ কথার আলপনায় এঁকেছেন। সেই সঙ্গে পুকুরে স্নান করতে আসা প্রতিবেশীদের সজীব চিত্র আমাদের বিস্মিত করে।

প্রতিটি স্নান্‌থীর স্নানের নিখুঁত বর্ণনা বালকের পর্যবেক্ষণ শক্তির আশ্চর্য উদাহরণ। স্নানপর্ব শেষ হলে নির্জন ঘাটের বটগাছটি বালকের মনকে অধিকার করে নিত। এ বটগাছের ঝুরির অন্ধকারের মধ্যে একটি কুহকের পরিবেশ রচনা করত। বটগাছটি নিয়ে একটি কবিতাও লিখেছিলেন তিনি। এই বটগাছটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ নিজের জীবনের মিল খুঁজে পান। তাই তিনি লিখেছেন- "সেই বালক আজ বাড়িয়া উঠিয়া নিজের চারিদিক হইতে নানাপ্রকার ঝুরি নামাইয়া দিয়া বিপুল জটিলতার মধ্যে সুদিন দুর্দিনের ছায়া রৌদ্রপাত গণনা করিতেছে"।

ঠাকুর পরিবারের বালকদের-বাইরে যাওয়া বারণ ছিল। এমনকি বাড়ির ভিতরে তাদের অবাধ যাতায়াতের সুযোগ ছিলনা। বাইরের পৃথিবীর রূপ, গন্ধ, শব্দ সমস্তই আড়াল-আবডাল থেকে দেখত তারা। আর সেইজন্য বাহির ও ভিতরের মিলনের একটি প্রবল আকাঙ্খা তাদের মনে বাসা বেঁধে ছিল। রবীন্দ্রনাথের কথায়- "সে ছিল মুক্ত, আমি ছিলাম বদ্ধ - মিলনের উপায় ছিল না, সেই জন্যই প্রণয়ের আকর্ষণ ছিল প্রবল। কিন্তু আজ সেই খড়ির গণ্ডি মুছিয়া গেছে। কিন্তু গণ্ডি তবু ঘোচে নাই"। এই বিশেষ অনুভবটি 'দুই পাখি' কবিতায় কাব্যরূপ লাভ করেছে।

একটু বড়ো হবার পর চাকরের শাসন কিছুটা শিথিল হয়েছে, ঠিক এমনই দিনে বাড়িতে নববধূর আগমন। অবকাশের সঙ্গী হিসাবে তাঁর কাছ যথেষ্ট প্রশ্রয় পেয়েছিলেন তিনি। মধ্যাহ্নে ছাতের নির্জনতায় প্রকৃতি ও পরিবেশ স্বপ্নময় অনুভূতি দিয়ে দেখেছেন। সেই বিচিত্র রূপ ও শব্দের বাইরের জগৎ বালক রবীন্দ্রনাথের মনকে উদাস করে দিত।

রবীন্দ্রনাথের পিতৃদেব প্রায়ই বেড়াতে যেতেন। তার তেতলার বন্ধ ঘরে ঢুকে কোনো এক রহস্যের স্বাদ অনুভব করতেন বালক রবীন্দ্রনাথ- "একে তো অনেকদিনের বন্ধ করা ঘর, নিষিদ্ধ প্রবেশ, সে ঘরে যেন একটা রহস্যের ঘন গন্ধ ছিল"। তেতালার ঘরে জলের ব্যবস্থা ছিল। ঝাঁঝরি খুলে দিয়ে স্নান করে মনের সাধ মেটাতেন তিনি। এর মধ্যে ছিল মুক্তির স্বাদ। "সে-স্নান আরামের জন্য নহে, কেবলমাত্র ইচ্ছাটাকে লাগাম ছাড়িয়া দিবার জন্য।"

বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ সহজ ছিলনা আর সেইজন্যই সেটি বালকের কাছে আনন্দের কারণ ছিল। কারণ- 'উপকরণ প্রচুর থাকিলে মনটা কুঁড়ে হইয়া পড়ে, সে কেবলই বাহিরের উপরেই সম্পূর্ণ বরতে দিয়া থাকে, ভুলিয়া যায়, আনন্দের ভোজে বাহিরের চেয়ে অন্তরের অনুষ্ঠানটাই গুরুতর।' যে শিশু প্রচুর খেলনা পায় তার খেলাটাই মাটি হয়ে যায়। গুণদাদার (গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর) বাগান থেকে পাথর চুরি করে এনে একটা নকল পাহাড় তৈরি করে অভিনব খেলার আয়োজন করেছিলেন তিনি। কিন্তু গুরুজনেরা তাঁর এই সৃষ্টির কোনো মূল্য দেয়নি। অতীত দিনের এক আনন্দকর স্মৃতিতে মগ্ন হয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। জীবনস্মৃতির ছন্দে ছন্দে সেই বিশেষ আনন্দ অনুভূতিটি প্রকাশ পেয়েছে। আর সেই সঙ্গে বালোকোচিত বিস্ময় ও কৌতুহলের বিবরণ পাঠকের কাছে বিশেষ উপভোগ্য বস্তু।

পৃথিবীর উপরের তলাটা দেখা যায় কিন্তু তার ভিতরের তলাটা সম্পর্কে কৌতূহলের শেষ নেই। মাঘোৎসবে ঝাড় লাগাবার জন্য থাম লাগানো হত। আর সেইজন্য মাটি খোঁড়া। মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে অনেক নীচে। তার তলাতেই আছে রাজপুত্র বা পাত্রের পাতালপুর যাত্রার পথ। আর একটু খুঁড়িলেই হয়-কিন্তু সেইটুকু আর কোনো দিনই খোঁড়া হলনা, এরপর আকাশের ঠিকানা। পণ্ডিতমশাই বলেছিলেন- সিঁড়ির পর সিঁড়ি লাগিয়ে উপরে

উঠলে কোথাও মাথা ঠেকবে না। তাই বালক কেবলই সুর চড়িয়ে বলতে থাকে- আরো সিঁড়ি আরও সিঁড়ি। কিন্তু পরে বুঝলেন সিঁড়ির সংখ্যা বাড়িয়ে কোনো লাভ নেই।

ভৃত্যরাজ তন্ত্র

ঠাকুর পরিবারের পারিবারিক ব্যবস্থাদি, বিশেষ করে বালকদের জীবনযাত্রা প্রণালী ছিল স্বতন্ত্র। সেই বিশেষ ব্যবস্থা ও পরিবেশের কথা সরসভঙ্গীতে তুলে ধরেছেন 'ভৃত্য রাজকতন্ত্রের' অংশটুকুতে।

এ বিষয়ে বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ইতিহাসের দাসরাজাদের রাজত্বকালের কথা উল্লেখ করেছেন। দাস রাজাদের রাজত্বকালের মতো তাদের বাল্যকাল কেটেছে হাতে, প্রহৃত হতে হয়েছে বারবার। এই প্রহৃত হবার ব্যাপারটিকে সংস্কারের ধর্ম বলেই মেনে নিয়েছিলেন তিনি। এই প্রসঙ্গে একটি শাশ্বত উপলব্ধির কথা বলেছেন তিনি- "বড়ো যে সে মারে, ছোটো যে সে মার খায়। ইহার বিপরীত কথাটা, অর্থাৎ ছোটো যে সেই মারে, বড়ো যে সেই মার খায়-শিখিতে বিলম্ব হইয়াছে।" মার থেকে কাঁদলে প্রহারকর্তা সেটিকে শিষ্টাচার মনে করত না।

বালকদের প্রতি ভৃত্যদেব এই নির্মম ব্যবহারের কারণ আজ খুঁজে পেয়েছেন তিনি। ভৃত্যদের উপরেই বালকদের সম্পূর্ণ ভার ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। বিপত্তি সেখানেই- 'সম্পূর্ণ ভার জিনিসটা বড় অসহ্য' একটি সুন্দর উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটি বুঝিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। ঘোড়াকে মাটিতে চলতে না দিয়ে তাকে যদি কাঁধে করে বেড়াতে হয়, তাহলে যে বেচারা কাঁধে করে তার মেজাজ ঠিক থাকে না। মজুরির লোভে সে কাঁধে করে বটে কিন্তু ঘোড়া-বেচারার উপর পদে পদে শোধ নেয়।

বাল্যকালের শাসনকর্তাদের মধ্যে একজনের স্মৃতি রবীন্দ্রনাথের মনে এখনো জাগরুক- তার নাম-ঈশ্বর। সে আগে গ্রামে গুরুগিরি করত। সে ছিল আচার-নিষ্ঠ, গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। তাছাড়া সে ছিল শুচিবায়ুগ্রস্থ। স্নানের সময় দুই হাত দিয়ে পুকুরের উপরের জল কাটিয়ে দ্রুতগতিতে ডুব দিত। জলে স্থলে আকাশে, লোকব্যবহারে রন্ধ্রে রান্ধ্রে অসংখ্য দোষ-সেগুলিকে কাটিয়ে চলাই ছিল তার সাধনা।

সে চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলত যা গুরুজনদের কাছে একান্তই হাস্যকর ছিল। বরানগরকে সে বলত বরাহনগর। 'অমুক লোক বসে আছেন' না বলে বলত 'অপেক্ষা করছেন'।

এই মানুষটির বাক্য-বিন্যাসের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ অনাগত দিনের ভাষার পরিবর্তনের ইঙ্গিতটি দেখতে পেয়েছিলেন।

সন্ধ্যাবেলায় বালকদের সংযত রাখবার জন্য সে রামায়ণ মহাভারত পড়ে শোনাত। বালকেরা হাঁ করে সেই কাহিনি শুনত। ধীরে ধীরে রাত বাড়ত, বালকদের জেগে থাকার মেয়াদ কমে আসত। তখন হঠাৎ পিতার অনুচর কিশোরী চাটুজ্যে (কিশোরীনাথ চট্টোপাধ্যায়) পাঁচালি গান করে বাকি অংশটুকু পুরণ করে দিতেন। তার গানে অনুপ্রাসের ঝকমকি শ্রোতাদের মুগ্ধ করত। কোনো কোনো দিন পুরাণ পাঠের তর্কেও সমাধান করে দিত ঈশ্বর। ঈশ্বরের একটি দুর্বলতা ছিল সে আফিম খেত। আর তার ফলে বালকদের জন্য বরাদ্দ দুধ টুকুতে ভাগ বসাতে সে দ্বিধা করত না।

ঠিক এমন ঘটনা ঘটত জলখাবারের ব্যাপারে। বরাদ্দ লুচির দুচারখানি মাত্র তাদের পাতে পড়ত। তারপর জিজ্ঞাসা করত আর দিতে হবে কিনা। বালকেরা জানত কোন উত্তরটি ঈশ্বরের কাছে সদুত্তর বলে মনে হবে তাই দ্বিতীয়বার লুচি চাইবার ইচ্ছা তাদের হত না। বাজার থেকে বালকদের জন্য বরাদ্দমতো জলখাবার কিনবার পয়সা পেত ঈশ্বর। বলাবাহুল্য সস্তা জিনিসের ফরমাশ করলেই সে খুশি হবে। তাই মুড়ি কিংবা ছোলাসিদ্ধ চিনেবাদাম ভাজা এই সামান্য ক-টি আহার্য্য বস্তুই তারা চাইত।

বাড়ির আবহাওয়া

সাহিত্যের পরিবেশের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের বাল্যকাল কেটেছে। বৈকঠখানা বাড়িতে আলো জ্বলে, লোকজনের যাতায়াত, গাড়ি ঘোড়া ইত্যাদি সবই দূর থেকে দেখেছেন। তিনি তাই বলেছেন- 'আমার চিত্তজগৎ হইতে বহুদূরের আলো' সেদিনের ঠাকুরবাড়ির সাংস্কৃতিক চর্চার পরিচয় দিতে গিয়ে ঠাকুর পরিবারের কয়েকজন সংস্কৃতি-মনস্ক প্রতিভাধর ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ, বাড়ির আবহাওয়া পরিচ্ছেদটিতে।

প্রথমেই তাঁর খুড়তুত ভাই গণেন্দ্রনাথের [গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪১-৬৯) দেবেন্দ্রনাথের অনুজ গিরীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র] কথা। রামনারায়ণ তর্করত্নকে দিয়ে 'নবনাটক' (১৯৬৬) লিখিয়ে বাড়িতে অভিনয় করাচ্ছেন। সাহিত্য ও ললিতকলায় তাঁর উৎসাহের সীমা ছিল না। বেশ-ভূষায়, কাব্যে-গানে, চিত্রনাট্যে ধর্মে স্বাদেশিকতায় তাঁর মধ্যে একটি সর্বাঙ্গসুন্দর জাতীয়তার আদর্শ প্রকাশ পেয়েছিল। ইতিহাস চর্চায় তাঁর প্রবল অনুরাগ ছিল। তাঁর রচিত ব্রাহ্মসঙ্গীতগুলিও সার্থক ও সুন্দর। 'লজ্জায় ভারতযশ গাহিব কী করে' গানটি হিন্দুমেলায় গাওয়া হত।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন- "বহু মানবকে মিলাইয়া এক-একটি প্রতিষ্ঠান রচনা করিয়া তোলা বিশেষ প্রতিভার কাজ"। তাঁর 'গুণদাদা' ছিলেন তেমনি একজন প্রতিভাধর মানুষ। সকলকে আপন করে নেবার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল তার। "সৌন্দর্যবোধ ও গুণগ্রাহিতায় তাঁহার নধর শরীর-মনটি কেমন করিতে থাকিত।" তাঁর ঘরেই বড়দাদার লেখা কিম্ভূত কৌতুকনাট্য রিহার্সাল হত। সেই সঙ্গে চলত অট্টহাস্য আর গান। এছাড়াও ছিল অক্ষয় মজুমদারের উদ্দাম নৃত্য। বারান্দার জানলায় দাঁড়িয়ে প্রবল ঔৎসুক্যের সঙ্গে এই দৃশ্য দেখতেন। রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর গুণদাদার অপার স্নেহ ছিল। এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন তিনি। তাঁদের তিনজনের মধ্যে সত্য পড়াশোনায় সবচেয়ে ভালো ছিল। রবীন্দ্রনাথ ইস্কুলে কোনো দিন প্রাইজ পান নি। কেবল সচ্চরিত্রের জন্য ছন্দমালা বইটি পুরস্কার পেয়েছিলেন। সত্য ভালোভাবে পাস করে একটা প্রাইজ পেয়েছিল। এই খবরটি পরম উৎসাহে রবীন্দ্রনাথ গুণদাদাকে জানান। গুণদাদা তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন সে কি প্রাইজ পায়নি। উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন- "না আমি পাই নাই, সত্য পাইয়াছে।" এই কথাটি শুনে গুণদাদা খুব খুশি হয়েছিলেন। নিজে প্রাইজ না পেয়ে অন্যের প্রাইজ পাওয়ার খবর আনন্দের সঙ্গে বলাটাকে তিনি এটি সদ্গুণের পরিচয় বলে মনে করেছিলেন।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি মন্তব্য বিশেষভাবে উল্লেখ্য। তিনি বলেছেন- 'ছেলেদের দান করা ভালো কিন্তু পুরস্কার দান করা ভালো নহে-ছেলেরা বাহিরের দিকে তাকাইবে, আপনার দিকে তাকাইবে না, ইহাই তাহাদের পক্ষে স্বাস্থ্যকর'।

শৌখীন গুণদাদার কাছে স্নেহের প্রশ্রয় পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর কাছে তিনি ভারতবর্ষের ইতিহাসের গল্প শুনেছিলেন। একদিকে ভারতবর্ষের নূতন ইতিহাস গড়ে উঠেছে, কিন্তু অন্যদিকে মানুষের অন্তরে বেদনা প্রচ্ছন্ন ছিল। বাল্যকালেই এই দুই বিপরীত জীবনচিত্র রবীন্দ্রনাথের ভাবনাকে বিচলিত করেছিল।

একদিন রবীন্দ্রনাথের গোপন খাতাটির সন্ধান পান গুণদাদা। প্রথম কাব্য পাঠকের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন_"এক-একদিন কবিত্বের মধ্যে ছেলেমানুষির মাত্রা এত অতিশয় থাকিত, যে তিনি হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিতেন। বাল্যের কবিতা রচনার ক্ষেত্রে শব্দঘটিত বিভ্রাটের সরস কাহিনি লিখেছেন তিনি। নিকটের সঙ্গে পকেট শব্দটি যুক্ত করায় কেমন হাস্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল তা তাঁর বর্ণনা থেকেই জানা যায়।

এরপর বড়দাদার কাব্য রচনার বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন লেখক। বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'স্বপ্ন প্রয়াণ' লিখছেন। গুণদাদাও এসে বসতেন দক্ষিণের বারান্দায়। "বড়দাদা লিখিতেছেন আর শুনাইতেছেন-আর তাহার ঘন ঘন উচ্চ-হাস্যে বারান্দা কাঁপিয়া উঠিতেছে। বড়দাদার রচনার প্রতি কোনো আসক্তি ছিল না। 'স্বপ্ন প্রয়াণে'র কত পরিত্যক্ত পত্র বাড়িময় ছড়াছড়ি যাইত তাহার ঠিকানা নাই।

সেদিনের কাব্যরসের ভোজে বালক রবীন্দ্রনাথ বঞ্চিত হতেন না। 'স্বপ্ন প্রয়াণে' অনেকটাই বুঝবার মতো দক্ষতা তখন তিনি লাভ করেননি। কিন্তু একটি আনন্দের স্বাদ তাঁর শিরা-উপশিরায় প্রবাহিত হয়ে যেত। তখনকার দিনের মজলিস বলে যে একটি পদার্থ ছিল, তা এখন অবলুপ্ত। আজ নিবিড় সামাজিকতারও একান্ত অভাব। মানুষ আছে কিন্তু সেই বারান্দা, বৈঠকখানা সবই আজ জনশুন্য। তাই পরিণত বয়েসে রবীন্দ্রনাথ ক্ষোভের সঙ্গে মন্তব্য করেছেন- "এত বড়ো সামাজিক কৃপণতার মতো কুশ্রী জিনিস কিছু আছে বলিয়া মনে হয় না"।

৬.৩। পিতার সান্নিধ্য ও বাহির যাত্রা

রবীন্দ্রনাথের বাল্যজীবন কেটেছে 'ভৃত্য রাজকতন্ত্রে'। বাইরের জগতের সঙ্গে তাঁর যেটুকু পরিচয় সবই আড়াল আবডাল থেকে। সেই বন্দি জীবনের সকরুণ উপলব্ধি

পরবর্তীকালের স্মৃতিচারণে সার্থক রস সঞ্চার করেছে। তারপর একদিন চার দেয়ালের লক্ষণের গণ্ডি পার হয়ে বাইরে আসার সুযোগ ঘটল। কিন্তু সত্যিই কি সেদিন যথার্থ মুক্তির স্বাদ পেয়েছিলেন যুবক রবীন্দ্রনাথ? আরও দূরের আহ্বানে সাড়া দিয়ে তারপর বেরিয়ে পড়েছিলেন তিনি। আর এই বাইরে যাওয়ার সুযোগ ঘটেছিল পিতৃদেবের স্নেহের নিমন্ত্রণে। আলোচ্য পরিচ্ছেদগুলিতে সেই কাহিনিই অকপটে বর্ণনা করেছেন তিনি।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন- “বাংলা দেশের পাড়াগাঁটাকে ভালো করিয়া দেখিবার জন্য অনেকদিন হইতে মনে আমার ঔৎসুক্য ছিল।

রবীন্দ্রনাথের এই পল্লী অভিজ্ঞতা লাভের কিছু পরিমাণে পূরণ হবার সুযোগ এল। ডেঙ্গুজ্বরের তাড়ায় বিরাট পরিবারের কিছু অংশ ছাতুবাবুদের বাগানে আশ্রয় নিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ সেই দলে ছিলেন। তাঁর কথায়- “এই প্রথম বাহিরে গেলাম। গঙ্গার তীরভূমির প্রাকৃতিক শোভা সেদিন যুবক কবির মনকে মুগ্ধ করেছিল। গঙ্গার জোয়ারভাটা নানা ধরনের নৌকা গভীর আগ্রহের সঙ্গেই দেখতেন তিনি। পরম বিস্ময়ে তাই তিনি বলেছেন- “প্রত্যহ প্রভাতে ঘুম হইতে উঠিবামাত্র আমার কেমন মনে হইত, যেন দিনটাকে একখানি সোনালিপাড়-দেওয়া নূতন চিঠির মতো পাইলাম” বাইরের জগতের এই অভিজ্ঞতার সঙ্গে বিস্ময় একসূত্রে গাঁথা হয়ে গিয়েছে। তাই তাঁর কথায়, “কড়ি বরগা দেয়ালের জঠরের মধ্য হইতে বাহিরের জগতে যেন নূতন জন্মলাভ করিলাম।”

কিন্তু সেদিন প্রকৃতির মধ্যে সম্পূর্ণ একাত্ম হবার সুযোগ পাননি তিনি। বাইরে এলেও স্বাধীনতা পাননি। তাই ক্ষোভের সঙ্গেই তাঁকে বলতে শুনি- ‘ছিলাম খাঁচায়, এখন বসিয়াছি দাঁড়ে-পায়ে শিখল কাটিল না’। একদিন স্বল্প আচ্ছাদনের অপরাধে তাঁর বড়োদের সঙ্গে বেড়াবার ইচ্ছা ত্যাগ করতে হয়েছিল।

চল্লিশ বছর পর সেই দিনগুলির স্মৃতিচারণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর মনে হয়েছে সেই গাছপালা, বাড়িঘর হয়তো সবই আছে, কিন্তু সে বাগানখানা আজ নেই কারণ সে বাগান কেবল গাছপালা দিয়ে তৈরি নয়। সেদিন সেটি ছিল ‘একটি বালকের নব বিস্ময়ের

আনন্দ দিয়া গড়া'- সেই নববিস্ময়টি হারিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সে বাগানটিও হারিয়ে গিয়েছে।

পিতৃদেবের সান্নিধ্যে

বাল্যকালে পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় নিবিড় ছিল না। কারণ, "আমার জন্মের কয়েক বৎসর পূর্ব হইতেই পিতা প্রায় দেশভ্রমণেই নিযুক্ত ছিলেন।" বাল্যকালে তাঁর পিতৃ-সান্নিধ্যলাভের সুযোগ হয়নি। প্রাত্যহিক জীবনে নৈকট্য না থাকলেও বাল্যে পিতার কিছু কিছু প্রসঙ্গ মধ্য বয়সেও রবীন্দ্রনাথের মনে উজ্জ্বল হয়েছিল।

যেমন যখন দেবেন্দ্রনাথ বাড়ি আসতেন তখন তাঁর সঙ্গে আসত কোনো একজন বিদেশি চাকর। একবার এসেছিল পাঞ্জাবি বালক গেনু। এই গেনুকে ঘিরে বালক রবীন্দ্রনাথের মনে এক অদ্ভুত রোমাঞ্চকর অনুভবের সৃষ্টি হয়েছিল। একে বিদেশি তাতে পাঞ্জাবি। বালকের মনে পাঞ্জাবিদের বীরের জাত বলে বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল তাই তার যথেষ্ট সমাদর- "তাহা রণজিত সিংহের পক্ষেও কম হইত না।"

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন- "ঘরের বদ্ধ খাঁচায় ছিলাম বলিয়া যাহা কিছু বিদেশের, যাহা কিছু দূর দেশের তাহাই আমার মনকে অত্যন্ত টানিয়া লইত।" তাই গাব্রিয়াল য়িহুদি কিংবা 'ঝোলাঝুলিওয়ালা' ময়লা পায়জামা পরা কাবুলিওয়ালাও তাঁর কাছে ভীতিমিশ্রিত রহস্যের বিষয় ছিল।

পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ আর একটি কৌতুক বিষয়টি প্রায়ই আলোচনা হত। দেবেন্দ্রনাথ তখন পাহাড়ে ছিলেন (১৮৬৮--১৮৭০)। রুশীয়েরা কবে ধূমকেতুর মতো এসে পড়বে-এ জন্য দেবেন্দ্রপত্নী যথেষ্ট উদ্বেগ বোধ করতেন। বালক রবীন্দ্রনাথকে তিনি বলেছিলেন- "রাশিয়ানদের খবর দিয়া কর্তাকে একখানা চিঠি লেখো তো"। মহানন্দ মুনসির সহায়তায় যথাবিহিত পাঠে বালক একখানি চিঠি লিখেছিলেন। 'পিতার কাছে সেই আমার প্রথম চিঠি।'

চিঠিটির উত্তর পেয়েছিলেন পত্রলেখক। দেবেন্দ্রনাথ লিখেছিলেন- "ভয় করিবার কোনো কারণ নাই, রাশিয়ানকে তিনি স্বয়ং তাড়াইয়া দিবেন।" উৎসাহবশে আরও কিছু চিঠি লিখেছিলেন তিনি কিন্তু তাঁর কোনোটাই হিমাচলের শিখর পর্যন্ত পৌঁছে নাই।

এরপর পিতা এলেন তিনজনকে উপনয়ন দেবার জন্য। একাজের জন্য বেদান্ত-বাগীশের সহায়তায় উপনয়নের জন্য বৈদিক মন্ত্র সংকলন করলেন। যথাসম্ভব প্রাচীন বৈদিক পদ্ধতি অনুসরণ করেই উপনয়ন হল। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন- "মাথা মুড়াইয়া, বীর বৌলি পরিয়া আমরা তিন বটু তেতালার ঘরে তিন দিনের জন্য আবদ্ধ হইলাম।" বলা বাহুল্য ঋষি বালকদের সঙ্গে কঠোর সংযমে এ তিন বালকের দিন কাটেনি।

নতুন ব্রাহ্মণ হবার পর থেকেই গায়ত্রী মন্ত্রটি জপ করার দিকে প্রবল উৎসাহ দেখা দিল। তাছাড়াও বাল্যকালেই রবীন্দ্রনাথের মনে একটি গভীর আবেগময়তার সৃষ্টি হয়েছিল যার সবটুকু বুদ্ধি নির্ভর ছিলনা। তিনি বলেছেন শিক্ষার সকলের চেয়ে বড়ো অঙ্গটা বুঝাইয়া দেওয়া নহে, মনের মধ্যে ঘা দেওয়া।

বড়দাদার 'মেঘদূত' আবৃত্তির আবেগময় ছন্দ উচ্চারণ বালকের মনে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। তাঁর বাল্য স্মৃতিতে আছে 'Old Curiosity Shop' গীতগোবিন্দ প্রভৃতি। বিশেষ করে গীতগোবিন্দের ভাষা ও ছন্দ কবির কল্পনাকে আছন্ন করেছিল। "গদ্য রীতিতে সেই বইখানি ছাপানো ছিল বলিয়া জয়দেবের বিচিত্র আনন্দের কাজ ছিল।"

অন্যদিকে "আমাদের পড়িবার ঘরে শানবাঁধানে মেজের এক কোণ বসিয়া গায়ত্রী জপ করিতে করিতে সহসা আমার দুই চোখ ভরিয়া কেবলই জল পড়িতে লাগিল... অন্তরের অন্তঃপুরে সে কাজ চলিতেছে বুদ্ধির ক্ষেত্রে সকল সময়ে তাহার খবর আসিয়া পৌঁছায় না।"

হিমালয় যাত্রা

'পিতৃদেব' পরিচ্ছেদে পিতৃদেবের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের রূপরেখাটি তুলে ধরেছেন। ওই পরিচ্ছেদে তাঁর সঙ্গে পিতার মানসিক দূরত্বের প্রসঙ্গ এসেছে। আভিজাত্য ও গাম্ভীর্যের পরিমন্ডলের বাতাবরণের মধ্যে বালক রবীন্দ্রনাথের প্রবেশাধিকার সহজ ছিল না। কিন্তু

পরবর্তী 'হিমালয় যাত্রা' পরিচ্ছেদটিতে পিতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নিবিড়তর পরিচয়ের একটি বর্ণময় চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। এই পরিচ্ছেদটিতে এমন কতকগুলি সূত্র আছে যা রবীন্দ্রনাথের জীবন ও ব্যক্তিত্ব গঠনের মূল উপাদান হিসাবে গ্রহণ করা যায়। নিয়মশৃঙ্খলা, সংযম, কষ্টসহিষ্ণুতা আত্মমর্যাদাবোধ, ব্যক্তিস্বাধীনতা প্রভৃতি মানবিক গুণগুলি কিশোর বয়সে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পিতৃ সাহচর্যেই লাভ করেছিলেন। এই পরিচ্ছেদে সেই বিষয়গুলি বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রকাশ পেয়েছে।

পিতার সঙ্গে তাঁর বাইরে যাওয়া মাত্র বারো বছর বয়েসে (১৮৭৩)। এই প্রথম তাঁর বন্দি জীবনের অবসান।

উপনয়ন পর্ব শেষ হবার পর নেড়ামাথায় ইস্কুলে যাবার দুশ্চিন্তায় যখন তাঁর দিন কাটছে ঠিক তখনই পিতার ঘরে তাঁর ডাক এল। তাঁর সামনে প্রশ্ন - "তাহার সঙ্গে হিমালয় যাইতে চাই কিনা।" আর তার উত্তরে - "চাই" এই কথাটা যদি চীৎকার করিয়া আকাশ ফাটাইয়া বলিতে পারিতাম। এই ভাবেই শুরু হল বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে কিশোর রবীন্দ্রনাথের পরিচয়ের মুখবন্ধ।

একটি অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য চিন্তা ছিল পিতা দেবেন্দ্রনাথ চরিত্রের। শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতার প্রতি তাঁর ছিল সজাগ দৃষ্টি। প্রসঙ্গটির পরিচয় মেলে টুপি পরা এবং খোলার কৌতুককর কাহিনিতে। বাইরে যাওয়ার বিশেষ পোষাক তৈরি হয়েছিল তাঁর জন্য। তার মধ্যে ছিল জরির কাজ করা গোল মখমলের টুপি। নেড়া মাথার উপর ওই টুপি পরায় রবীন্দ্রনাথের আপত্তি ছিল। সুযোগ পেলেই টুপিটি খুলে রাখতেন। কিন্তু পিতার দৃষ্টি এড়াইত না। তাঁর দৃষ্টিশাসনে অনতিবিলম্বে টুপিটিকে যথাস্থানে বসাতে হত।

কোনো কাজই যেমন তেমন করে করবার পক্ষপাতী ছিলেন না দেবেন্দ্রনাথ । তাঁর প্রতি এবং অন্যের প্রতি কর্তব্যগুলিও তাঁর সুনির্দিষ্ট ছিল। তাঁর সংকল্পগুলিও সর্বদা পূর্ব নির্ধারিত থাকত। কাজ শেষ হলে প্রত্যেকের বর্ণনা মিলিয়ে নিয়ে কাজের মূল্যায়ন করতেন। তাঁর সংকল্পে, চিন্তায়, আচরণে ও অনুষ্ঠানে তিল মাত্র শৈথিল্য থাকত না।

আর সেইজন্যই হিমালয় যাত্রার আগে যতদিন তাঁর কাছে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ততদিন একদিকে প্রচুর স্বাধীনতা পেয়েছিলেন অন্যদিকে সমস্ত আচরণ অলঙ্ঘ রূপে নির্দিষ্ট ছিল। তাই ছুটি এবং নিয়ম দুই মেরুর ব্যবধান ছিল।

হিমালয় যাত্রার আগে কিছুদিন বোলপুরে কেটেছে রবীন্দ্রনাথের । কিছুদিন আগে বাবা ও মা'র সঙ্গে সত্য (ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়) সেখানে গিয়েছিল। এই সত্যের কাছেই ভ্রমণ বৃত্তান্ত সম্পর্কে কিছু রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা কথা শুনেছিলেন তিনি। যেমন শুনেছিলেন ও দক্ষতা না থাকলে রেলগাড়িতে চড়া ভয়ংকর সংকট। পা ফসকে গেলে আর রক্ষা নেই। কিন্তু যেদিন সত্যই তিনি গাড়িতে চড়লেন সেদিন দেখলেন কোথাও কোনো বিপদের আভাস নেই। চলমান রেলগাড়িতে বসে প্রকৃতির অপূর্ব সৌন্দর্য উপভোগ করেছিলেন তিনি। বোলপুরে এসে এক নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করলেন কিশোর রবীন্দ্রনাথ (বাংলা ১২৭৯, ফাল্গুন)।

বোলপুরেই বাংলার পল্লী প্রকৃতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রথম পরিচয়। ‘ছায়াছন্ন গ্রামগুলি রেলগাড়ির দুই ধারে দুই ছবির ঝরনার মতো বেগে ছুটিতে লাগিল’। শহরের ছেলে কোনোদিন ধানের খেত দেখেননি। সত্যর কাছে গ্রামজীবন সম্পর্কে অনেক আজগুবি গল্প শুনেছিলেন। কিন্তু বোলপুরের মরুপ্রান্তরের মধ্যে কোথাও ধানের খেত দেখতে পেলেন না তিনি।

কিন্তু বোলপুরের স্বতন্ত্র পরিবেশ ও প্রকৃতি তাকে নতুন অভিজ্ঞতা এনে দিল চাকরদের শাসকহীন কিশোর রবীন্দ্রনাথের অবাধ বিচরণ। পিতাও কোনো শাসনের গণ্ডি রচনা করেন নি। বোলপুরের প্রাকৃতিক পরিবেশের বর্ণনা দিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন- “বোলপুরের মাঠের মধ্যে স্থানে স্থানে বর্ষার জলধারায় বালি-মাটি ক্ষয় করিয়া, প্রান্তরতল হইতে নিম্নে, লাল কাঁকর ও নীলপ্রকার পাথরে খচিত ছোটো ছোটো শৈলমালা গুহাগহ্বর, নদী-উপনদী রচনা করিয়া, বালখিল্যদের দেশের ভূ-বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়াছে।”

এখানে কিশোর রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন অবাধ মুক্তির স্বাদ। খোয়াই থেকে আচল ভরে পাথর সংগ্রহ করে আনতেন তিনি। পিতার কাছে তাঁর এই অধ্যাবসায় তুচ্ছতা পায়নি বরং উৎসাহ পেয়েছে। এই বালকোচিত খেলায় তিনি যথেষ্ট উৎসাহ দিয়েছেন।

বোলপুর বাস কালে কিশোর রবীন্দ্রনাথের অবাধ স্বাধীনতায় দিন কেটেছে। তিনি বলেছেন- “যদিচ আমি নিতান্ত ছোট ছিলাম, কিন্তু পিতা কখনো আমাকে যথেচ্ছ বিহারে নিষেধ করিতেন না।” পিতৃদেবের উপসনা স্কুলটিকে পাথর-ঘটিত করবার ব্যাপারেও দেবেন্দ্রনাথ যথেষ্ট উৎসাহ দিয়েছিলেন। এমনি আরও অনেক ছোটখাটো ছেলেমানুষীকে প্রশ্রয় দিতে দ্বিধা করেননি আপাত-গম্ভীর দেবেন্দ্রনাথ।

বাল্যকালেই রবীন্দ্রনাথ পিতার যথেষ্ট আস্থাভাজন হয়েছিলেন। পয়সার হিসাব রাখা কিংবা সোনার ঘড়িতে দম দেবার ভার তিনি অনায়াসে বালকের উপর দিয়েছিলেন। বড়ো বয়সেও টাকাকড়ির হিসাব রাখার দায়িত্ব রবীন্দ্রনাথের উপরেই ছিল। “তখন তিনি পার্কস্ট্রিটের বাড়িতে থাকিতেন। প্রতিমাসের দোসরা - তেসরা আমাকে হিসাব পড়িয়া শুনাইতে হইত।” দেবেন্দ্রনাথের স্মরণশক্তি ও ধারণাশক্তি অসাধারণ ছিল। অপ্রত্যক্ষ জিনিসগুলিকেও তিনি মনের মধ্যে সম্পূর্ণ আঁকিয়া নিতে পারতেন।

এই সময় ছিন্নভিন্ন নীল খাতাটির পরিবর্তে তিনি একখানা বাঁধানো লেটস ডায়ারি জোগাড় করেছিলেন। এই খাতাটিকে অবলম্বন করেই তাঁর কবি জীবনের সূচনা- “বোলপুরে যখন কবিতা লিখিতাম তখন বাগানের প্রান্তে একটি শিশু নারিকেল গাছের তলার মাটিতে পা ছড়াইয়া বসিয়া খাতা ভরাইতে ভালোবাসিতাম।

এই সময় লিখেছিলেন- ‘পৃথ্বীরাজের পরাজয়’ (পরে প্রকাশিত রুদ্রচন্দ্র নাটিকা)। এই কাব্য রচনার প্রথম প্রয়াস এবং সেই লেটস ডায়ারি কোথায় হারিয়ে গেছে তার ঠিকানা নেই। আর একটি ঘটনার উল্লেখ এই প্রসঙ্গে আছে। ঘটনাটিতে পিতা দেবেন্দ্রনাথের আভিজাত্য ও সত্য নিষ্ঠার উজ্জ্বল পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে।

বোলপুর থেকে অমৃতসর যাত্রার পথে একজন টিকিট পরীক্ষক টিকিট দেখতে চান। রবীন্দ্রনাথের জন্য হাফ টিকিট। টিকিট পরীক্ষকের মনে রবীন্দ্রনাথের বয়স সম্পর্কে সন্দেহ দেখা দিল। পথে স্টেশন মাস্টার জিজ্ঞাসা করলেন ছেলেটির বয়স কি বারো বছরের বেশি নয়। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন এগারো রবীন্দ্রনাথ বলছেন- বয়সের চেয়ে নিশ্চয়ই আমার বৃদ্ধি কিছু বেশি হইয়াছিল। স্টেশন মাস্টার এবার তার জন্য পুরা ভাড়া দাবি করলেন। পিতা বাক্স থেকে নোট বার করে দিলেন। ভাড়ার বাকি অবশিষ্ট টাকাটা

তিনি প্ল্যাটফর্মের উপর ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। "টাকা বাঁচাইবার জন্য পিতা যে মিথ্যা বলিবেন, এ সন্দেহের ক্ষুদ্রতা তাহার মাথা হেঁট করিয়া দিল।"

এরপর গুরুদরবারের গায়ক প্রসঙ্গ। গুরুদরবারের একজনকে বাসায় এনে ভজন গান শুনেছিলেন দেবেন্দ্রনাথ তারপর দলে দলে গান শোনাবার উমেদাররা এসে হাজির। সে এক চরম বিড়ম্বনা।

সন্ধ্যায় পিতা বাগানের সম্মুখে বারান্দায় এসে বসলে তাঁকে ব্রাহ্মসংগীত শোনাতেন রবীন্দ্রনাথ। সেই মাধুর্যময় স্মৃতিটি উল্লেখ করে জীবনস্মৃতিতে লিখেছেন- "তিনি নিস্তব্ধ হইয়া নতশিরে কোলের উপর দুই হাত জোড় করিয়া শুনিতেছেন - সেই সন্ধ্যাবেলাটির ছবি আজও মনে পড়িতেছে।"

রবীন্দ্রনাথ রচিত ব্রাহ্মসংগীত দেবেন্দ্রনাথের মনে গভীর অনুভবের সৃষ্টি করেছিল। হারমোনিয়মে জ্যোতিদাদার সঙ্গে একাধিকবার গানগুলি গাইতে হয়েছে তাঁকে। গানের শেষে দেবেন্দ্রনাথ বলেছেন- "দেশের রাজা যদি দেশের ভাষা জানিত ও সাহিত্যের আদর বুঝিত, তবে কবিকে তো তাহারা পুরস্কার দিত।

পুরস্কার হিসাবে একখানি পাঁচশো টাকার চেক তিনি দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথকে। পাঠ্যবইগুলির মধ্যে বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিনের জীবন বৃত্তান্ত বইটির কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেছেন তিনি। যদিও ফ্র্যাঙ্কলিনের ঘোরতর সাংসারিক বিজ্ঞতা কিশোর রবীন্দ্রনাথের বিরক্তির কারণ হয়েছিল।

পিতার সঙ্গে বসবাসকালে রবীন্দ্রনাথকে সংস্কৃতিচর্চায় বিশেষ মন দিতে হয়েছিল। 'ঋজুপাঠ' (বিদ্যাসাগর প্রণীত) 'উপক্রমণিকা' ইত্যাদি তাঁর অবশ্য পাঠ্য ছিল। দশ-বারো খণ্ড গিবনের রোমের ইতিহাস। অনিচ্ছা স্বত্বেও পড়তে হয়েছে তাঁকে।

শুরু হল হিমালয় যাত্রা। যাত্রাপথের দুই ধারের প্রকৃতির অপূর্ব শোভা ও বৈচিত্র্য দু'চোখ ভরে দেখেছেন তিনি- সমস্ত দিন আমার দুই চোখের বিরাম ছিল না-পাছে কিছু একটা এড়াইয়া যায়, এই আমার ভয়। এই যাত্রার প্রকৃতির অপূর্ব বর্ণনা জীবনস্মৃতি এই অধ্যায়ের সম্পদ।

দেবেন্দ্রনাথ তাঁর ছোটো ক্যাশবাক্সটির দায়িত্ব দিয়েছিলেন এই বালকের উপর। এই দায়িত্ব অনায়াসেই কিশোরী চাটুর্জ্যের (কিশোরীনাথ চট্টোপাধ্যায়-দেবেন্দ্রনাথের অনুচর) হাতে দেওয়া যেত। আসলে বাল্যকাল থেকেই দায়িত্ব সচেতন করে তোলবার জন্যই দেবেন্দ্রনাথ এই দায়িত্বটি বালকের উপর দিয়েছিলেন। বক্রোটায় তাঁদের বাসা ছিল পাহাড়ের সর্বোচ্চ চূড়ায়। সেখানে দেবেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথকে গ্রহতারকা চেনাতেন এবং জ্যোতিষ্ক সম্পর্কে আলোচনা করতেন।

বৈশাখ মাস। কিন্তু শীত অত্যন্ত প্রবল। এই ব্যবস্থাতেও বিপদের আশঙ্কায় পাহাড়ে বেড়াতে কোনো বাধা দেননি দেবেন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ একলা লৌহফলক বিশিষ্ট লাঠি নিয়ে পর্বতের জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতেন। হিমালয় প্রবাসের দিনগুলি কঠোর জীবনচর্চায় কেটেছে রবীন্দ্রনাথের।

কখনো অন্ধকার সম্পূর্ণ দূর হয়নি। পিতৃদেব জাগিয়ে দিতেন বালককে। এ সময়টিতে তার 'নরঃ নরৌ নরা' মুখস্থ করার সময়। তারপর পিতা-পুত্রের ভ্রমণ। দ্রুত চলমান পিতার সঙ্গে হন্টন প্রতিযোগিতায় পেরে উঠতেন না তিনি।

আর একটি গুরুতর বিষয়, সেই দারুণ ঠান্ডায় বরফগলা জলে স্নান। ঠান্ডা জলে একটু গরম মেশাবার সাহস ছিলনা ভৃত্যদের। পিতার অভ্যাস অনুসরণ করে দুধ খাওয়াতে তার যথেষ্ট আপত্তি ছিল। আহারের পর আবার একবার পড়তে বসা। কিন্তু এই সময় প্রত্যুত্তর নষ্ট ঘুম তাকে তাড়িত করত। অবস্থা বুঝে ছুটি দিতেন পিতৃদেব।

দুপুরবেলা লাঠি হাতে এক পাহাড় থেকে অন্য পাহাড়ে হেঁটে বেড়াতেন তিনি। এ ব্যাপারে পিতা কোনোদিন উদ্বেগ প্রকাশ করেন নি। প্রকৃতপক্ষে পুত্রের স্বাতন্ত্র্যে বাধা দিতে চাননি পিতা। পিতার আদর্শনিষ্ঠা রবীন্দ্রনাথকে প্রভূত পরিমাণে প্রভাবিত করেছিল। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন- "যাহা কর্তব্য তাহা আমরা অন্তরের সঙ্গে করিব, এ জন্য তিনি অপেক্ষা করিতেন। সত্যকে শোভনকে আমরা বাহিরের দিক হইতে লইব, হইাতে তাঁহার মন তৃপ্তি পাইত না - তিনি জানিতেন, সত্যকে ভালোবাসিতে না পারিলে সত্যকে গ্রহণ করাই হয়না।

যৌবনারম্ভে রবীন্দ্রনাথের খেয়াল হয়েছিল গোরুর গাড়িতে গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে পেশোয়ার পর্যন্ত যাবেন। যদিও এ প্রস্তাব কেউই অনুমোদন করেনি। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ বলেছিলেন- ‘এ তো খুব ভালো কথা, রেলের ভ্রমণকে কি ভ্রমণ বলে?’

রবীন্দ্রনাথ যখন আদি ব্রাহ্মসমাজের সেক্রেটারি হয়েছিলেন তখন তিনি সমাজে কিছু নতুন নিয়ম চালু করতে চেয়েছিলেন এবং দেবেন্দ্রনাথ বিনাদ্বিধায় সে কাজকে অনুমোদন করেছিলেন।

এই প্রখর ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন পিতা দেবেন্দ্রনাথকে এই সময় একান্ত বন্ধুর মতোই পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বাড়ির গল্প, বড়দাদা, মেজদাদার চিঠিপড়া প্রভৃতিতে তিনি পিতার একান্ত ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন। কোনো কোনো বিষয়ে কিছু কিছু প্রতিবাদ করবার সাহসও দেখিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু পিতা ধৈর্যের সঙ্গে এসব প্রতিবাদ সহ্য করতেন। নানা কৌতুককর গল্পের মধ্যেই পিতা পুত্রের দিন কেটেছে। কয়েক মাস পরে পিতৃদেব তাঁর অনুচর কিশোরী চাটুজ্যের সঙ্গে তাঁকে কলকাতায় পাঠিয়ে দিলেন।

প্রত্যাবর্তনের পরে

কিছুদিন অনাবিল পিতৃ সহচর্য লাভের পর রবীন্দ্রনাথ ফিলে এলেন কলকাতায়। অতিপরিচিত পরিবেশে । পুরোনো দিনের শাসন আজ আর নেই। এখন অধিকার প্রশস্থ। এবার চাকরদের ঘর ছেড়ে মায়ের ঘরের সভায়। সেই সঙ্গে বাড়ির কনিষ্ঠ বধূ কাদম্বরী দেবীর স্নেহনির্ঝর। সেদিনের সেই সুখস্মৃতি দীর্ঘদিন পরেও রবীন্দ্রনাথের মনে এক উজ্জ্বল অনুভব হয়ে স্থায়ী আসন পেয়েছে। এ এক অভিনব মানসিক উপলব্ধি। ইস্কুল নেই মাস্টার নেই, জোর করে কেউ কিছু করায় না, খেলাধুলাও ইছামত। কেবল ছোটদিদির (বর্ণকুমারী দেবী) বেণী দুলিয়ে ঘুরে বেড়ানোটা ওর পক্ষে বেদনাদায়ক ছিল। নববধূ (কাদম্বরীদেবী) এই সংসারে প্রবেশের পরেই আবহাওয়াটার পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল। এই নবাগতা মানুষটির সঙ্গে ভাব করবার প্রবল ইচ্ছা থাকলেও চারিদিকের বাধায় তা সম্ভব হয়নি।

বাল্যজীবনের ফেলা আসা দিনগুলির ছবি নিপুণ হাতে এঁকে রেখেছেন রবীন্দ্রনাথ সেই টিমটিমে লণ্ঠন, অন্ধকার সিঁড়ির ধাপ, দাসীদের প্রদীপের সলিতা পাকানো, এমন অজস্র ছবি মনের মধ্যে আঁকা হয়ে গিয়েছিল।

এরপর একদিন অল্পপরিচিত কল্পনা জড়িত অন্তঃপুরে বহু দিনের প্রত্যাশিত আদর পেলেন তিনি। বাড়ির সকলকে তাঁর ভ্রমণের গল্প বলে আনন্দ দিয়েছেন। এই সব বর্ণনায় অনেক সময় কল্পনার রঙ লাগিয়েছেন তিনি। এই ভাবেই ছাতের উপর মাতার বায়ুসেবন সভায় প্রধান বক্তার পদ পেয়েছিলেন। মা'র কাছে যশস্বী হবার লোভ সেদিন ছাড়তে পারেননি তিনি। কাব্য ব্যাকরণের কাব্যালংকার অংশের কবিতা মুখস্ত বলে মাকে বিস্মিত করে দিতেন তিনি। পিতার অনুচর কিশোরী চাটুজ্যে এক সময় পাঁচালি দলের গায়ক ছিলেন। তাঁর কাছে প্রশংসা পেয়ে একদিন মনে হয়েছিল- "পাঁচালির দলে ভিড়িয়া দেশ-দেশান্তরে গান গাহিয়া বেড়ানোটা মহা একটা সৌভাগ্য।" মার সান্ধ্য আসরে ঐ গানগুলি গেয়ে সকলকে মুগ্ধ করে দিতেন।

আমেদাবাদ

মেজদাদার ইচ্ছায় এবং পিতার সম্মতিতে রবীন্দ্রনাথের আমেদাবাদ যাত্রা (১৮৭৮)। এটা হল বিলাতে ব্যারিস্টারি পড়তে যাওয়ার প্রস্তুতি। জ্ঞানদানন্দিনী দেবী এবং ছেলেরা (সুরেন্দ্রনাথ, ইন্দিরা দেবী ও কবীন্দ্র) তখন ইংলন্ডে। শাহিবাগের জনশূন্য বাড়িতে এক অদ্ভূত স্বপ্নময়তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের দিন কেটেছে আমেদাবাদে। বাড়ির পাশেই ক্ষীণস্বচ্ছ স্রোতা সবরমতী নদী। জনশূন্য বাড়িতে একা একাই ঘুরে বেড়াতেন তিনি। দেয়ালের খোপে খোপে ছিল অজস্র বই। এই বইগুলির মধ্যে ছিল টেনিশনের কাব্যগ্রন্থ আর শ্রীরামপুরে ছাপা পুরাতন সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থ। সংস্কৃত কবিতাগুলির ধ্বনি ও ছন্দ কিশোর কবির মনকে আলোড়িত করত। শুক্লপক্ষের গভীর রাত্রে নদীর দিকে ঘুরে বেড়াতেন তিনি এখানেই তিনি নিজের সুরে প্রথম গানটি রচনা করেছিলেন (সর্ব প্রথম গান 'নীরব রজনী দেখো মগ্ন জোছনায়'-ভগ্নহৃদয়) এছাড়াও লিখেছিলেন অনেকগুলি গান- 'বলি ও আমার গোলাপ বালা' গানটি। ইংরেজিতে কাঁচা তাই ডিকশনারি নিয়ে ইংরেজি বইগুলি পড়তেন তিনি।

বিলাত

কিছুদিন আমেদাবাদে এবং বোম্বইয়ে কাটিয়ে বিলাত যাত্রা (বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ 'ছেলেবেলা'- অধ্যায় ১৩)। বিলাত যাত্রার বিবরণ তিনি লিখতে শুরু করেন 'বিলাত যাত্রার পত্র'। (যুরোপ-যাত্রা কোন বঙ্গীয় যুবকের পত্র ভারতী, ১২২৬)। ইংরাজি ১৮৭৮, ২০ সেপ্টেম্বর 'পুনা' স্টিমারে যাত্রা। ছেলেবেলা থেকে বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কোনো পরিচয় ছিল না হঠাৎ সতেরো বছর বয়সে বিলাতের জলসমুদ্রের মধ্যে পড়ে হাবুডুবু খাবার আশঙ্কা ছিল। কিন্তু সেই সময় মেজো বউঠাকরুণী ছেলেদের নিয়ে ব্রাইটনে বাস করছিলেন। তাই অচেনা জগতের ধাক্কাটা সেদিন তিনি সামলে উঠতে পেরেছিলেন।

বিলাত প্রবাসের অভিজ্ঞতা সুখ দুঃখ মেশানো। এই পরিচ্ছেদটিতে রবীন্দ্রনাথ অতীত দিনের স্মৃতিরোমন্থন করে কয়েকটি খন্ডচিত্র রচনা করেছেন। বিদেশ প্রবাসে বিচিত্র ঘটনা এবং মানুষের মুখোমুখি হয়েছিলেন তিনি। সেই অভিজ্ঞতার ঝুলি থেকে তিনি আমাদের উপহার দিয়েছেন কয়েকটি সজীব চিত্র।

কোন কোনো ঘটনা কৌতুকের স্নিগ্ধতায় উপভোগ্য আবার কোনোটিতে লেগেছে বেদনা করুণ অনুভূতির স্পর্শ।

শীতকাল। চারিদিকে বরফ পড়ছে। আগুনের তপ্ততায় শীতের কবল থেকে বাঁচবার চেষ্টা। বরফ পড়ার খবর পেয়ে বাইরে এসে দেখলেন এক নতুন পৃথিবী। দেখলেন, শুভ্রকার নিশ্চল তপস্বী যেন গভীর ধ্যানের আবরণে আবৃত। এ এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা- "এমন আশ্চর্য বিরাট সৌন্দর্য আর কখনো দেখি নাই।"

বিলাতে আসার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল পড়াশোনা করে ব্যারিস্টার হওয়া। এই জন্য ব্রাইটনে একটি পাবলিক স্কুলে ভর্তি হলেন। বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ প্রথমেই তাঁর মুখের দিকে চেয়ে বলেছিলেন- 'বাহবা তোমার মাথাটা তো বেশ চমৎকার'। এই কথাটির মধ্যে বিশেষ ইঙ্গিত ছিল। অধ্যক্ষ মহাশয় বোঝাতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের ললাট এবং মুখশ্রী পৃথিবীর অন্য অনেকের সঙ্গে তুলনায় মধ্যম শ্রেণির বলে গণ্য হতে পারে। ব্রাইটনে ছাত্ররা তার সঙ্গে কোনোদিন রূঢ় ব্যবহার করেনি। কিন্ত, এই স্কুলে রবীন্দ্রনাথের বেশিদিন

পড়া হয়নি। তারকনাথ পালিত স্যোর তারকনাথ পালিত--১৮৪১--১৯১৪) তখন ইংলন্ডে ছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন এইভাবে কিছু হবে না। এই অবস্থায় তিনি কিশোর রবীন্দ্রনাথকে লন্ডনে এনে একটা বাসায় একা ছেড়ে দিলেন। শীতকাল, বাগানের গাছগুলো বরফে ঢাকা পড়েছে। হাড় কীপানো শীতে তার মনে হল- শীতের লন্ডনের মতো এমন নির্মম স্থান আর কোথাও নাই। এই ভয়ঙ্কর নিরানন্দ পরিবেশে তীর একমাত্র সঙ্গী একটি হারমোনিয়ম। যখন চারিদিক অন্ধকার হয়ে আসত তখন আপন মনে এ যন্ত্রটা বাজাতেন।

আবার লন্ডনে ফিরে গেলেন রবীন্দ্রনাথ। সেখানে ডাক্তার স্কট নামে একজন ভারতবর্ষীয় অতিথির আগমন আশঙ্কায় বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিল। পরে অবশ্য তারা ফিরে এসেছিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই স্কট দম্পতি নিজের ছেলের মতোই ভালোবেসে ছিলেন রবীন্দ্রনাথকে । সাধবী গৃহিণী স্কটের পত্নী সর্বদাই স্বামী সেবায় ব্যস্ত থাকতেন। স্বামীর প্রতি তার যত্নের সীমা ছিলনা। গৃহস্থালির সমস্ত কাজকর্ম শেব করে তিনি পড়াশোনা এবং গানবাজনায় যোগ দিতেন কারণ তিনি মনে করতেন এটাও গৃহিণীর কর্তব্যরই অঙ্গ। এখানে মেয়েদের নিয়ে মাঝে মাঝে টেবিল চালা হত। এ এক বিচিত্র খেলা। টেবিলে হাত দিয়ে বসে থাকা অন্য দিকে টেবিলের দাপাদাপি। যদিও এই খেলায় স্কট গৃহিণীর মনের সম্মতি ছিলনা তথাপি এর ছেলেমানুষী কাণ্ডে তিনি বাধা দিতেন না।

এরপর দেশে ফিরবার ডাক এল। বলাবাহুল্য কিশোর রবীন্দ্রনাথ যথেষ্ট খুশি যথেষ্ট নাড়া দিয়েছিল। এই গৃহটির কথা রবীন্দ্রনাথের মনে চিরদিন জাগ্রত ছিল। তিনি বলেছেন- "লন্ডনে এই গৃহটি এখন আর নাই- সেই ডাক্তার পরিবারের কেহবা পরলোক কেহ বা ইহলোক কোথায় চলিয়া গিয়াছেন তাহার কোনো সংবাদই জানিনা কিন্তু সেই গৃহটি আসার মনের মধ্যে চিরপ্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে।"

৬.৪। কাব্যচর্চার সূচনা

রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন সাত-আট। তার ভাগিনেয় জ্যোতিপ্রকাশ তাঁর চেয়ে কিছু বড়ো (জ্যোতিপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়, ১৮৫৫--১৯১৯) গুণেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ ভগ্নী কাদম্বিনী দেবীর

পুত্র। একদিন দুপুরবেলা সে তার ঘরে রবীন্দ্রনাথকে ডেকে বলল- “তোমাকে পদ্য লিখিতে হইবে। এতদিন পদ্য জিনিসটিকে রবীন্দ্রনাথ ছাপার অক্ষরেই দেখেছেন। নিজে চেষ্টা করেও যে পদ লেখা যায় এটা তাঁর কল্পনাতীত ছিল। প্রথম চেষ্টায় গোটাকয়েক শব্দ জোড়া দিতেই পয়ার হয়ে উঠল। একবার যখন ভয় ভাঙল তখন আর কে ঠেকিয়ে রাখে। কর্মচারীদের কৃপায় একখানা নীল কাগজের খাতা জোগাড় হল। আর সেই খাতায়- স্বহস্তে পেনসিল দিয়া শুরু করিয়া দিলাম। এই প্রসঙ্গে পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের সকৌতুক স্বীকারোক্তি – “হরিণশিশু নূতন শিং বাহির হইবার সময় সে যেমন যেখানে সেখানে গুতা মারিয়া বেড়ায়, নূতন কাব্যোদগম লইয়া আমি সেই রকম উৎপাত আরম্ভ করিলাম।”

রবীন্দ্রনাথের দাদা (সোমেন্দ্রনাথ ঠাকুর) বালক কবির কবিতার শ্রোতা সংগ্রহে অতি উৎসাহী। একদিন ‘ন্যাশনাল পেপারে’র সম্পাদক নবগোপালবাবু বাড়িতে আসায় তাঁকে রবির কবিতা শোনার অনুরোধ জানালেন দাদা। রবীন্দ্রনাথ পদ্মের উপর একটা কবিতা লিখেছিলেন। কবিতাটিতে ‘দ্বিরেফ' শব্দটি ছিল। নবগোপাল বাবু এই শব্দটির মানে জিজ্ঞাসা করলেন। ‘দ্বিরেফ' এবং ‘ভ্রমর’ দুটিই তিন অক্ষরের শব্দ। এখানে ভ্রমর শব্দটা ব্যবহার করলেও কিছু অসুবিধা হত না। কিন্তু এ শব্দটির উপরেই তাঁর বিশেষ আশা-ভরসা ছিল। কিন্তু শব্দটি নবগোপাল-বাবুকে খুশি করতে পারেনি। শব্দটি শুনে হেসে ওঠায় এটাই বোঝা গেল। কিন্তু কিশোর কবির মনে হল- ‘নবগোপালবাবু সমজদার লোক নহেন।'

কাব্যরচনা চর্চা

নীল খাতাটি ‘সরু মোটা অক্ষরে কীটের বাসার মতো’ ভরে উঠল। কিন্তু কালক্রমে সেই খাতাটির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হল সেই খাতায় লেখা কবিতাগুলি মুদ্রণ সৌভাগ্য লাভ করেনি।

কবিতা লেখার ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ যে বাল্যকাল থেকেই যথেষ্ট সচেতন ছিলেন সে কথা নিজেই স্বীকার করেছেন। সাতকড়ি দত্ত (হেডমাস্টার, নর্মাল স্কুল) রবীন্দ্রনাথকে বিশেষ স্নেহ করতেন। তিনি একদিন রবীন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করলেন সে কবিতা লেখে কিনা।

সে যে কবিতা লেখে এ কথা শিক্ষকের কাছে গোপন করেনি এই বথা শুনে তিনি মাঝে মাঝে দুই-একটি পদ দিয়ে সেটি, পূরণ করে আনতে বলতেন। সেই মত তিনি দুটি পদ দিয়েছিলেন পূরণ করে আনবার জন্য।

শিক্ষক মহাশয় লিখেছিলেন- রবিকরে জ্বালাতন আছিল সবাই,

বরষা ভরসা দিল আর ভয় নাই।

রবীন্দ্রনাথ পদ পূরণ করে লিখেছিলেন-

মীনগণ হীন হয়ে ছিল সরোবরে,

এখন তাহারা সুয়ে জলক্রীড়া করে।

এছাড়াও বালক কবি 'আমসত্ত্ব দুধে ফেলি' ... ইত্যাদি একটি ত্রিপদীর কথা উল্লেখ করেছেন।

এরপর গোবিন্দবাবুর প্রসঙ্গ। তিনি ছিলেন সুপারিন্টেডেন্ট। তাঁকে সকলেই ভয় করত। একদিন অত্যাচারে পীড়িত হয়ে তাঁর কাছে আশ্রয় নিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তারপর থেকে গোবিন্দবাবু তাঁকে করুণার চোখে দেখতেন।

তিনি একদিন রবীন্দ্রনাথকে কবিতা লেখার কথা জিজ্ঞাসা করলেন রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিধাহীনভাবে স্বীকৃতি জানাতে দেরি করল না। তিনি তাঁকে উচ্চঅঙ্গের সুনীতি সম্বন্ধে কবিতা লিখে আনতে বলেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ যে আদেশ পালন করেছিলেন বলাবাহুল্য কবিতাটি আদৌ উচ্চমানের ছিল না। এ বিষয়ে কবি নিজেও যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। তাই লিখেছেন - "এই নীতিকবিতাটির প্রশংসা করিবার একটিমাত্র বিষয় আছে-এটি সকাল সকাল হারাইয়া গেছে।" অধিকাংশ ছেলেরাই মনে করেছে কবিতাটি তাঁর নিজের রচনা নয়। অবশ্য এরপর অনেক কবি যশা:প্রাথীর অনৈতিক ভাবে কবিতা রচনার প্রয়াস দেখা পেল।

সাহিত্যের সঙ্গী

হিমালয় থেকে ফিরে আসবার পর যথেষ্ট স্বাধীনতা পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ । চাকরদের শাসন, ইস্কুলের বন্ধন কিছুই রইল না। এমনকি বাড়িতেও শিক্ষকদের তেমন আমল দিতেন না তিনি। তাঁর পূর্বদিনের শিক্ষক জ্ঞানবাবু তাঁকে ‘কুমারসম্ভব’ পড়তে বলেছিলেন। তারপর ব্রজবাবু (সুপারিন্টেডেন্ট) তাঁকে গোল্ডস্মিথের ভিকর অব ওথেক কীলও থেকে তর্জমা করতে দিলেন। কিন্তু কোনোটিতেই তিনি যথেষ্ট সফল হলেন না। ফলে বাড়ির লোকেরা তাঁর হাল ছেড়ে দিল, আর তিনিও কেবল আপনমনে কবিতার খাতা ভরাতে লাগলেন। কিন্তু সেই সময়ের রচনাগুলি আবেগের বহিংপ্রকাশ মাত্র। রবীন্দ্রনাথের কথায়- “যখন শক্তির পরিণতি হয় নাই অথচ বেগ জন্মিয়াছে তখন সে একটা ভারি অন্ধ আন্দোলনের অবস্থা।”

এই প্রসঙ্গে সাহিত্যে বউঠাকুরাণীর প্রবল অনুরাগের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন স্মৃতি রোমন্থনে। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর সাহিত্যচর্চার সঙ্গী।

স্বপনপ্রয়াণ [দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রথম সর্গ, বঙ্গদর্শন ১২৮০, গ্রন্থাকারে প্রকাশ ১৮৭৫] কাব্যখনির প্রতি তাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল। কাব্যখানি রবীন্দ্রনাথেরও খুব ভালো লাগত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন ওই কাব্য তাঁর অনুকরণের অতীত। স্বপ্নপ্রয়াণ সম্পর্কে কিশোর কবির মনে যে অনুভব সৃষ্টি হয়েছিল পরবর্তীকালে সেটি অপূর্ব ভাষায় তিনি প্রকাশ করেছেন। তিনি লিখেছেন- “স্বপ্নপ্রয়াণ যেন একটা রূপকের রাজপ্রাসাদ।”

বিহারীলাল চক্রবর্তীর সারদামঙ্গল বউঠাকুরাণীকে মুগ্ধ করেছিল। তিনি কবিকে মাঝে মাঝে নিয়ন্ত্রণ করে এনে খাওয়াতেন। এছাড়া নিজের হাতে একখানি আসন তৈরি করে তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে বিহারীলাল রচিত ‘সাধের আসন’ কাব্যখানির নাম উল্লেখযোগ্য। (কাব্যখানি ১২৯৫ সালে প্রকাশিত হয়) কবি বিহারীলালের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি গভীর সখ্য সম্পর্ক, গড়ে উঠেছিল।

বিহারীলালের মতো কাব্য লিখবেন এটাই ছিল সেই সময় রবীন্দ্রনাথের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু কিশোর কবি বিহারীলালের মতো কাব্য রচনার সমস্ত প্রয়াস নিরর্থক হয়ে যায় বউঠাকুরাণীর শীতল উৎসাহহীনতায়।

রচনা প্রকাশ

রবীন্দ্রনাথের প্রথম রচনা প্রকাশের সঙ্গে একটি কৌতুককর ঘটনা জড়িয়ে আছে। প্রকাশিত হয় 'জ্ঞানাঙ্কুর' ['জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব' মাসিক পত্র, প্রকাশক যোগেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, কলিকাতা ১২৮২। জ্ঞানাঙ্কুর নামে রাজশাহী থেকে শ্রীকৃষ্ণ দাসের সম্পাদনায় প্রথম প্রকাশ, ১২৭৪] এই জ্ঞানাঙ্কুরেই রবীন্দ্রনাথের প্রথম রচনা প্রকাশিত হয়। জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন- "প্রথম যে গদ্য প্রবন্ধ লিখি তাহাও জ্ঞানাঙ্কুরেই প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধটি ছিল গ্রন্থ সমালোচনা। এই রচনাটির পিছনে একটু ইতিহাস আছে।"

সেই সময় 'ভুবন মোহিনী প্রতিভা' নামে একখানি কবিতার বই প্রকাশিত হয়। বইখানি ভুবন মোহিনী নাম ধারিনী কোনো মহিলার লেখা বলে লোকের ধারনা জন্মেছিল।

রবীন্দ্রনাথের একজন বন্ধুও 'ভুবন মোহিনী'র কবিতায় মুগ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু কবিতাগুলির স্থানে স্থানে ভাব ও ভাষার এমন অসংযম ছিল যে সেগুলি স্ত্রীলোকের লেখা বলে স্বীকার করে নিতে রবীন্দ্রনাথের মন চায়নি। কিন্তু কবিতাগুলির যে স্ত্রীলোকের লেখা এ সম্পর্কে তাঁর বন্ধুটির কোনো সংশয় ছিল না।

এই প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রনাথ 'ভূবনমোহিনী প্রতিভা', 'দুঃখসঙ্গিনী' ও 'অবসর সরোজিনী' তিনখানি বইয়ের সমালোচনা লিখেছিলেন জ্ঞানাঙ্কুরে। অনেক ঘটা করেই প্রবন্ধটি লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। খণ্ডকাব্য গীতিকাব্যের লক্ষণ বিষয়েও বিস্তারিত আলোচনা করেছিলেন এ প্রসঙ্গে। প্রবন্ধটি পাঠ করে বন্ধুটি যথেষ্ট উত্তেজিত হয়েছিলেন এবং বলেছিলেন- "একজন বি. এ. তোমার এই লেখার জবাব লিখিতেছেন" বি. এ. লিখছেন শুনে যথেষ্ট ভীতও হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ । কিন্তু শেষ পর্যন্ত বি. এ. সমালোচক বাল্যকালের পুলিশম্যানটির মতোই দেখা দিলেন না।"

৬.৫। বিভিন্ন গ্রন্থ প্রকাশ

যৌবনারম্ভেই রবীন্দ্রনাথের জীবনের সূচনা জীবনস্মৃতিতে তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলি প্রকাশের বিবরণ দিয়েছেন তিনি। ১৮৮১ থেকে ১৮৮৬-এই পাঁচ বছরে প্রকাশিত আটখানি কাব্যগ্রন্থের প্রকাশকালের কিছু স্মৃতি এবং তথ্য এই প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে। এই কাব্যগ্রন্থগুলি হল। ভানুসিংহের কবিতা (১৮৮৪), ভগ্ন হৃদয় (১৮৮১), বাল্মীকি প্রভিতা (১৮৮১), সন্ধ্যাসংগীত (১৮৮২), প্রভাত সংগীত (১৮৮৩), ছবি ও গান (১৮৮৪), প্রকৃতির প্রতিশোধ (১৮৮৪), কড়ি ও কোমল (১৮৮৬)।

এই তালিকায় একমাত্র ‘প্রকৃতির প্রতিশোধ’ ছাড়া অন্যগুলি কাব্যগ্রন্থ। এবার পৃথকভাবে উল্লিখিত কাব্যগুলি সম্পর্কে রবীন্দ্র স্মৃতিচারণ আলোচনা করা যেতে পারে।

ভানুসিংহের কবিতা

ভানসিংহের কবিতাগুলি রচনার পিছনে একটি কৌতুককর বৃত্তান্ত আছে। অক্ষয় কুমার সরকার এবং সারদাচরণ মিত্র সংকলিত প্রাচীন কাব্যগ্রন্থ পরম আগ্রহে পড়তেন রবীন্দ্রনাথ। এ গ্রন্থের মৈথিলী মিশ্রিত ভাষা তাঁর কাছে দুর্বোধ্য ছিল। কিন্তু প্রাচীন পদকর্তার পদশুলি সম্পর্কে তাঁর যথেষ্ট কৌতূহল ছিল। “গাছের বীজের মধ্যে যে অধর প্রচ্ছন ও মাটির নীচে যে রহস্য অনাবিস্কৃত” তেমনি এই রহস্যময় ভাষার রহস্য-আবারণ ভেদ করবার প্রবল ইচ্ছা। তখন রবীন্দ্রনাথকে পেয়ে বসেছিল।

অক্ষয়বাবুর কাছেই তিনি ইংরাজ বালক কবি চ্যাটার্টনের কথা শুনেছিলেন। তাঁর কাব্যের কথা বিস্তারিত না জানলেও এইটুকু জেনেছিলেন চ্যাটার্টন প্রাচীন কবিদের নকল করে কবিতা লিখেছিলেন। তঁর ফাঁকিটুকু কেউ ধরতে পারেনি। যোলোবছর বয়সে বালক কবি আত্মহত্যা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয় চ্যাটার্টন হবার চেষ্টা শুরু করলেন।

একদিন মেঘ-মেদুর মধ্যাহ্নে বাড়ির ভিতর খাটের উপর উপুড় হয়ে শুয়ে শ্লেটের উপর লিখলেন- 'গহন কুসুমকুঞ্জ মাঝে।' এটি লিখে খুবই খুশি হয়েছিলেন বালক কবি।

কবিতাগুলির দর যাচাইয়ের জন্য একটু ছলনার আশ্রয় নিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ বন্ধুকে লিখেছিলেন লাইব্রেরি খুঁজতে খুঁজতে একটা বহুকালের পুঁথি পাওয়া গিয়েছে। তারপর পদগুলি বন্ধুকে শোনান। বন্ধুটি বিচলিত হয়ে বললেন, এ পুঁথিটি তার চাই। কারণ এমন কবিতা বিদ্যাপতি চন্ডীদাসের হাত দিয়াও বাহির হইতে পারিত না।" রহস্য ছেড়ে রবীন্দ্রনাথ জানালেন এই কবিতাগুলি তারই লেখা। এ খবর জানবার পর বন্ধুটি বলেছিল- 'নিতান্ত মন্দ হয় নাই।' ভানু সিংহের কবিতাগুলি যখন ভারতীতে প্রকাশিত হয় ডা: নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় তখন জার্মানিতে ছিলেন। নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় (ইং ১৫৫২--১৯১০ তাঁর যুরোপ প্রবাসের কাল আনুমানিক ১৮৭৩--৮২) তিনি যুরোগীয় সাহিত্যের সঙ্গে তুলনা করে আমাদের দেশের গীতিকাব্যের উপর একখানি বই লিখেছিলেন (The Yatras; বা The Populer dramas of Bengal) তিনি ভানুসিংহকে প্রচুর সম্মান দিয়েছিলেন।

এই বইখানি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যথেষ্ট উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন না। তিনি বলেছেন- "ভানুসিংহের কবিতা একটু বাজাইয়া বা কষিয়া দেখিলেই তাহার মেকি বাহির হইয়া পড়ে। তাহাতে আমাদের দিপি নহবতের প্রাণ গলানো ঢালা সুর নাই। তাহা আজকালকার সস্তা আর্গিনের বিলাতি টুং টাং মাত্র।" [রবীন্দ্রনাথের বেনামী রচনা 'ভানুসিংহ ঠাকুরের জীবনী'- নবজীবন ১২৯১ শ্রাবণ]

ভগ্নহৃদয়

জীবনস্মৃতিতে 'ভগ্নহৃদয়' কাব্যখানি সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। এই আলোচনা কাব্যকেন্দ্রিক নয়। তৎকালীন যুব-সমাজের উপর পাশ্চাত্য কাব্যের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা, অনেকটাই ইতিহাস নির্ভর একদিক দিয়ে বিচার করলে 'ভগ্নহৃদয়' কাব্যখানির মর্মবাণী যথেষ্ট যুগ-নির্ভর এটি রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘ আলোচনায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

বিলাতে কাব্যখানির সুচনা হলেও দেশে ফিরে রবীন্দ্রনাথ সেখানি সম্পূর্ণ করেন। (১৮৮০ তে রবীন্দ্রনাথ বিলতে হইতে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন।) রচনাটি 'ভগ্নহৃদয়' নামে প্রকাশিত হয়েছিল। (১৮৮১ জুন। কাব্যখানির কিছু অংশ ভারতীতে ছাপা হয়েছিল।)

কাব্যজীবনের সূচনা পর্বের এই কাব্যখানি তখনকার পাঠকদের কাছে অনাদৃত হয়নি। বিশেষ করে কাব্যটি প্রকাশিত হবার কিছুদিন পরে স্বর্গীয় মহারাজ বীরচন্দ্রমানিক্যের মন্ত্রী কবিকে জানিয়েছিলেন কাব্যটি মহারাজের ভালো লেগেছে। (মহারাজের প্রাইভেট সেক্রেটারি রাধারানী ঘোষ) শুধু তাই নয় কবির সাহিত্যসাধনার সফলতাও কামনা করেছিলেন মহারাজা।

আঠারো বছরে লেখা এই কাব্যখানি সম্পর্কে ত্রিশ বছর পরে বিস্তৃত আলোচনা করেছিলেন। আলোচনাটি কিছু অংশ জীবনস্মৃতিতে উদ্ধৃত হয়েছে। কাব্যখানি রচনার পটভূমির পরিচয় দিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন- "ভগ্নহৃদয় যখন লিখতে আরম্ভ করেছিলাম তখন আমার বয়স আঠারো। বাল্যও নয় যৌবনও নয়। বয়সটা এমন একটা সন্ধিস্থলে যেখান থেকে সত্যের অলোকে স্পষ্ট পাবার সুবিধা নেই।" এরপর সেই বিশেষ কালটির বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ এই সময়টিকে লেখক বলেছন 'অত্যন্ত অব্যবস্থার কাল'। চারিদিকে অস্পষ্টতার ঘন ছায়া। এই অবস্থায় আপনাকেও জানা যায় না- বাহিরকেও নয়। এই সময় অসত্য সত্যের অভাবকে অসংযমের দ্বারা পূরণ করবার চেষ্টা করে। শিশুর দাঁত ওঠার সময়ের উত্তেজনা প্রসঙ্গটি উল্লেখ করে কবি বলেছেন- "মনের আবেগগুলারও সেই দশা। যতক্ষণ পর্যন্ত বাহিরের সঙ্গে তাহারা আপন সত্যসম্বন্ধ স্থাপন না করে ততক্ষণ তাহারা ব্যাধির মতো মনকে পীড়া দেয়।"

বাল্মীকিপ্রতিভা

দেশি ও বিলাতি সুরের মেলবন্ধনে 'বাল্মীকিপ্রতিভা'র জন্ম এই গীতিনাট্য খানি যখন রবীন্দ্রনাথ লেখেন তখন তাঁর বয়স কুড়ি বছর। বাল্মীকিপ্রতিভা এবং কালমৃগয়া গীতিনাট্য রচনার পিছনে ছিল তৎকালীন ঠাকুরবাড়ির পরিবেশ এবং দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের

উৎসাহ। যৌবনারম্ভের এই গীতিনাট্যখানি রচনার মধ্য দিয়েই প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও নাট্য-জীবনের সূচনা।

অক্ষয়বাবুর মুখে সেই কবিতাগুলি আবৃত্তি রবীন্দ্রনাথ শুনেছিলেন আর তার ফলে ঐ কাব্যের ছবি ও কবিতাগুলি কবির মনে আয়ার্ল্যান্ড সম্পর্কে একটি মায়ালোকের বাতাবরণ সৃষ্টি করেছিল। রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছা ছিল আইরিশ মেলোডীজ তিনি সুরে শিখবেন এবং অক্ষয়বাবুকে শোনাবেন। কিন্তু তাঁর সে ইচ্ছাপুরণ হয়নি। এই আইরিশ মেলোডীজ বিলাতে গিয়েও শুনেছিলেন। দেশে ফিরে বিলাতি গানের সঙ্গে একসঙ্গে এইসব গান স্বজনসমাজে শুনিয়েছিলেন।

এইভাবে দেশি ও বিলাতি সুরের চর্চার মধ্যে দিয়েই বাল্মীকিপ্রতিভার জন্ম হল। এর সুরগুলি অধিকাংশই দিশি। এই গীতিনাট্যটিতে সংগীতকে নাটকে ব্যবহার করে সফল হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এইখানেই বাল্মীকিপ্রতিভা গীতি-নাট্যের বিশেষত্ব। এই গীতিনাট্যের অনেকগুলি গান বৈঠকি-গান-ভাঙা। আর কিছু গান জ্যোতিরিন্দ্রনাথের গানের সুর বসানো। কয়েকটি গান বিলাতি সুরে রচিত। বাল্মীকিপ্রতিভা পাঠযোগ্য কাব্যগ্রন্থ নয়। এটি সংগীতের নূতন পরীক্ষা। অভিনয়ের সঙ্গে কানে না শুনলে এর স্বাদ গ্রহণ সম্ভব নয়। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, “যুরোপীয় ভাষায় যাহাকে অপেরা বলে বাল্মীকিপ্রতিভা তাহা নহে - ইহা সুরে নাটিকা।” এখানে সংগীত প্রাধান্য লাভ করেনি। নাট্য বিষয়কেই সুর করে অভিনয় করা হয়েছে। স্বতন্ত্র সংগীতের মাধুর্য এখানে নেই।

ঠাকুরবাড়িতে মাঝে মাঝে বিদ্বজ্জন সমাগম নামে সাহিত্যিকদের সম্মেলন হত। এই সম্মেলনে গীতিবাক্য কবিতা আবৃত্তি ইত্যাদি হত। রবীন্দ্রনাথের বিলেত থেকে ফিরবার পর একবার এই সম্মেলন আহুত হয়েছিল ১২৮৭, ১৬ ফাল্গুন শনিবার [১৮৮১]। এই সম্মিলনী উপলক্ষ্যে বাল্মীকিপ্রতিভা রচনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ বাল্মীকি এবং তাঁর ভ্রাতুষ্পত্রী প্রতিভা সুন্দরী দেবী (হেমেন্দ্রনাথের জোষ্ঠ্য কন্যা) যথাক্রমে বাল্মীকি ও সরস্বতীর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন।

সন্ধ্যাসংগীত

‘জীবনস্মৃতি’তে সন্ধ্যাসংগীত প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ নিজের অবরুদ্ধ অবস্থার কথা উল্লেখ করে মোহিতবাবুর সম্পাদিত গ্রন্থাবলীতে এই অবস্থার কবিতাগুলিকে ‘হৃদয়-অরণ্য’ নামে চিহ্নিত করার কথা উল্লেখ করেছেন। প্রভাতসংগীতে ‘পুনর্মিলন’ কবিতাটির ভাববস্তু অনুসারেই ‘হৃদয়-অরণ্য’ নামকরণ করা হয়েছে।

সেই সময় বাইরের জগতের সঙ্গে কবির জীবনের কোনো যোগ ছিলনা । তখন তিনি হৃদয়ের মধ্যেই আবিষ্ট। তখন তিনি কারণহীন আবেগ এবং লক্ষ্যহীন আকাঙ্ক্ষার মধ্যে বিভ্রান্ত। অনেক কবিতা নতুন গ্রন্থাবলী থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। কেবল সন্ধ্যাসংগীতে প্রকাশিত কয়েকটি কবিতাই ‘হৃদয়-অরণ্য’ বিভাগে স্থান পেয়েছিল। সন্ধ্যাসংগীতের কবিতাগুলি রবীন্দ্রনাথের নির্জন অবকাশের রচনা। একাকিত্ব তাঁকে কাব্য রচনার সংস্কার থেকে মুক্তি দিয়েছিল। কবিতার শাসন থেকে মুক্ত হয়ে আপন ইচ্ছায় লেখার চেষ্টা এই সময় কবি কবিতাগুলি লিখেছেন শ্লেটে। শ্লেটে লেখার কারণও মুক্তির লক্ষ্য। এই ভাবেই চলতে থাকে তাঁর খেয়ালের লেখা।

এইভাবে একটি দুটি করে কবিতা লেখবার পর মনের মধ্যে আনন্দের আবেগ সঞ্চার হল। আর তার ফলে যে কবিতাগুলি রচিত হল সেগুলি “যাহা লিখিতেছি এ দেখিতেছি সম্পূর্ণ আমারই।”

প্রভাতসংগীত

প্রভাতসংগীত ১৮৮৩ তে প্রকাশিত হয়। প্রথম প্রকাশের সময় কবিতার সংখ্যা ছিল ২২টি। জীবনস্মৃতির ‘প্রভাত সংগীত’ পরিচ্ছেদে দীর্ঘ দিনের ব্যবধানে তাঁর কাব্য জীবনের সূচনা পর্বের বিষন্নতার কুয়াশায় বিদীর্ণ করে নব জীবনানন্দে উক্ত উত্তরণের ইতিবৃত্তটুকু তুলে ধরেছেন। রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহ অনুধাবনের ক্ষেত্রে এই পরিচ্ছেদে বর্ণিত কবির আত্মপরিচয় টুকু খুবই গুরুত্বপূর্ণ ।

সন্ধ্যা-সংগীতের রচনাকালে রবীন্দ্রনাথ কিছু গদ্যও লিখেছিলেন। সেগুলি নিতান্তই খেয়ালখুশির লেখা। কবির মন তখন একটা ঝোঁকের মুখে চলেছিল। তাই বুক ফুলিয়ে যা ইচ্ছা তাই লিখবার একটা প্রবণতা প্রবল হয়ে উঠেছিল। এই ছোটো ছোটো গদ্য

লেখাগুলো ‘বিবিধ প্রসঙ্গ’ নামে প্রকাশিত হয়েছিল। (প্রকাশ ১৮৮৩) প্রথম সংস্করণের পরেই তার আয়ু শেষ হয়েছে। এই সময় তিনি ‘বউঠাকুরাণীর হাট’ উপন্যাসখানি লিখতে শুরু করেন।

মোহিতবাবু গ্রন্থাবলীতে প্রভাতসংগীতের কবিতাগুলিকে ‘নিষ্ক্রমণ’ নাম দিয়েছিলেন। এর কারণ এই কাব্যখানিতেই হৃদয়ারণ্য থেকে বাইরের বিশ্বে প্রথম আগমনের বার্তা। এই সময় হৃদয়ের সঙ্গে একে একে নানা স্তরে ও ছন্দে বিচিত্রভাবে বিশ্বের সঙ্গে মিলন ঘটেছে। এইভাবে চলার মধ্যে দিয়েই একদিন অসীম ব্যাপ্তির মধ্যে পৌঁছাবে। এই ব্যাপ্তি অনির্দিষ্ট আভাসের ব্যাপ্তি নয়। পরিপূর্ণ সত্যের পরিব্যাপ্তি। শিশুকাল থেকেই রবীন্দ্রনাথের বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় সম্বন্ধ। সকালে জেগে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই পৃথিবীর জীবনোল্লাস তার মনের সঙ্গী হয়ে দেখা দিত। তারপর একদিন যৌবনের প্রথম উন্মেষে খোরাকের দাবি করতে লাগল। বাইরের সঙ্গে যোগাযোগের সহজ যোগটি বাধাগ্রস্থ হল। এইভাবে রুগ্ন হৃদয়ের আবদারে অন্তরের সঙ্গে বাইরের সামঞ্জস্যটি ভেঙে গেল। এই বেদনাই সন্ধ্যাসংগীতে প্রকাশ পেয়েছে। তারপর একদিন হৃদয়ের রুদ্ধ দ্বারটি ভেঙে গেল। যা তিনি হারিয়ে ছিলেন সেটি আবার ফিরে পেলেন। শুধু তাই নয় পরিচয় আরও পূর্ণতর হল। শিশুকালের বিশ্বকে প্রভাত সংগীতে আরও বেশি করে পাওয়া গেল। এই ভাবেই প্রকৃতির সঙ্গে সহজ মিলন বিচ্ছেদ ও পুনর্মিলনে জীবনের প্রথমঅধ্যায়ের পালা শেষ হল।

প্রকৃতির প্রতিশোধ

সুদীর্ঘ, সুবিস্তৃত, রবীন্দ্রসাহিত্যের ধারাটি একটি বিশেষ দার্শনিক ও তাত্ত্বিক ভাবনার উপর প্রতিষ্ঠিত। এই তত্ত্বভাবনার সূচনা হয়েছে যৌবনেই। প্রকৃতির প্রতিশোধ নাট্যকাব্যটিতেই একটি বিশেষ তত্ত্বভাবনা রূপ লাভ করেছিল। প্রকৃতির প্রতিশোধ রচনা ১২৯০, গ্রন্থপ্রকাশ ১২৯১ (১৮৮৪) এই নট্যকাব্যটি কবি লিখেছিলেন কারোয়ারে।

নাট্যকাব্যটির নায়ক সন্ন্যাসী সমস্ত স্নেহের মায়াবন্ধন ছিন্ন করে প্রকৃতির উপরে জয়ী হয়ে বিশুদ্ধ ভাবে অনন্তকে উপলব্ধি করতে চেয়েছিল। অনন্ত সম্পর্ক তাঁর ধারণাটি ছিল

ভ্রান্তিকর। শেষপর্যন্ত একটি বালিকার স্নেহবন্ধনে ধরা দিয়ে সন্ন্যাসী ফিরে আসেন সংসারে। সন্ন্যাসীর উপলব্ধি- 'ক্ষুদ্রকে লইয়াই বৃহৎ সীমাকে লইয়াই অসীম, প্রেমকে লইয়াই মুক্তি।'

কারোয়ারের সমুদ্রবেলা কিশোর কবিকে গভীর আত্মিক চেতনার উপলব্ধিতে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। তিনি বুঝেছিলেন প্রকৃতির সৌন্দর্য কেবল মরীচিকা নয়, তার মধ্যে অসীমের আনন্দের প্রকাশ। বাইরে প্রকৃতি নিয়মের ইন্দ্রজালের মধ্যেই অসীমকে প্রকাশ করছে। এই হৃদয়ের পথ ধরেই সন্ন্যাসী 'সীমা-সিংহাসনের অধিরাজ' অসীমের দরবারে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু একদিন প্রেমের সেতুতে দুই পক্ষের মিলন ঘটে, গৃহীর সঙ্গে সন্ন্যাসীর মিলন ঘটে তখনই সীমায় অসীমে মিলে গিয়ে 'সীমার মিথ্যা তুচ্ছতা' ও 'অসীমের মিথ্যা শূন্যতা' দূর হয়ে যায়।

ছবি ও গান

প্রকৃতির প্রতিশোধের পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ 'ছবি ও গান'। এই কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলি ১৮৮৪-তে প্রকাশিত হয় [এই গ্রন্থের প্রকাশিত ছোটো ছোটো কবিতাগুলি গত বৎসর লিখিত হয়। কেবল শেষ তিনটি কবিতা পূর্বের্বকার লেখা বিজ্ঞাপন, প্রথম সংস্করণ]

রবীন্দ্রনাথ তখন চৌরঙ্গির কাছে সার্কুলার রোডের বাগানবাড়িতে বাস করছেন। [২৩৭ নং লোয়ার সারকুলার রোড-এর বাড়ি সত্যেন্দ্রনাথ ভাড়া নিয়েছিলেন] এই বাড়ির দক্ষিণ দিকে একটা বড়ো বসতি ছিল। যুবক রবীন্দ্রনাথ জানলায় কাছে বিচিত্র গল্পের মতো বোধ হত। এইসব দৃশ্যগুলিকে এক একটি স্বতন্ত্র ছবি হয়ে দেখা দিয়েছিল কবি। নিজের মনের কল্পনা দিয়ে আনন্দ দিয়ে এক একটি করে ছবি রচনা করেছিলেন। এ আর কিছু নয় "এক একটি পারস্ফুট চিত্র আঁকিয়া তুলিবার আকাঙ্ক্ষা"।

এগুলি যদি ছবির বাঁধনে বাঁধতে পারতেন তবে তিনি খুশি হতেন। কবির দুঃখ এই মনের দৃষ্টি এবং সৃষ্টিকে তিনি রেখা ও রং দিয়ে ধরে রাখতে পারেন নি। অপটু হাতে স্পষ্ট রেখার পরিবর্তে রং ছড়িয়ে পড়ত। সেই নবযৌবনের দিনে বিচিত্র রং দিয়ে ছবি আঁকবার চেষ্টা করেছেন তিনি। সেদিনের বাইশ বছরের ছবিগুলিকে আজকের দিনে

মিলাতে গেলে হয়তো কিছু ঝাপসা রং এবং কাঁচা লাইনের পরিচয় মিলবে। কিন্তু তার মধ্যেও একটা কিছু চেহারা অবশ্যই ফুটে উঠবে।

'প্রভাত সংগীতের' পর্ব শেষ হয়ে ছবি ও গান থেকে আবার নতুন পালা শুরু হল। এই নতুন পালাটিতে নিশ্চয় অনেক অপ্রয়োজনীয় জিনিস আছে। গাছের পাতার মতো সেগুলো ঝরে যায়না। "নিতান্ত সামান্য জিনিসকেও বিশেষ করিয়া দেখিবার একটা পালা এই ছবি ও গান-এ আরম্ভ হইয়াছে।"

গানের সুর যেমন সাদা কথাকেও গভীর করে তোলে, তেমনি কোনো একটা সামান্য উপলক্ষ্য হৃদয়ের রসে রসিয়ে তুচ্ছতাকে অস্বীকার করবার প্রয়াস 'ছবি ও গানে', আছে। আর স্পষ্ট করে বললে বলতে হয় মনের তারটা যখন সুরে বাঁধা থাকে তখন বিশ্বসংগীতের ঝংকার সর্বত্রই অনুরণন তোলে। সেদিন কিশোর কবির মনে যে সুর জেগেছিল তাতে কোনো কিছুই তুচ্ছ ছিলনা।

কড়ি ও কোমল

'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থের শেষ রচনা 'কড়ি ও কোমল'। এই রচনাটি ১৮৮৬ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। 'কড়ি ও কোমল' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনের একটি পর্বের সমাপ্তি। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন- "এবারে একটা পালা সাঙ্গ হইয়া গেল"। তিনি আরও লিখেছেন—"মূর্তিকে বিশ্লেষণ করিতে গেলে কেবল মাটিকেই পাওয়া যায়, শিল্পীর আনন্দকে পাওয়া যায় না। অতএব খাসমহলের দরজার কাছে অবধি আসিয়া এইখানেই আমার জীবনস্মৃতির পাঠকদের কাছ হইতে আমি বিদায়গ্রহণ করিলাম"।

কড়ি ও কোমলে যৌবনের উচ্ছ্বাস খানিকটা স্তিমিত। এই সময় দেশজুড়ে চলেছে রাজনৈতিক উদ্দীপনা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এই আবেগ সর্বস্ব রাজনৈতিক আলোড়নে নিজেকে যুক্ত করতে চাননি। বলেছেন- "জীবনের মাঝখানে ঝাঁপ দিয়া পড়িবার পক্ষে আমার সামাজিক অবস্থার বিশেষত্ববশত কোনো বাধা ছিল বলিয়াই যে আমি পীড়াবোধ করিতে ছিলাম, সে-কথা সত্য নহে। প্রকৃতপক্ষে এই সময় স্বদেশবাসীর প্রাণের প্রবল বেগের

অভাব দেখেছেন তিনি। স্নিগ্ধতা কোমলতা সবই আছে। কিন্তু এই বাঁধা পুকুরে স্রোত কোথায়, ঢেউ কই সমৃদ্ধ হইতে কোটালের বান ডাকিয়া আসে কবে।"

এই মৃদু নিশ্চেষ্টতার মধ্যে মধ্যাহ্নতন্দ্রায় নিবিড় অবসাদ। দেশে তখন আত্মশক্তিহীন রাষ্ট্রনৈতিক সভা এবং খবরের কাগজের আন্দোলন প্রভৃতির সঙ্গে কবি মন সায় দেয়নি। চারিদিকের সম্বন্ধে বড়ো একটা অধৈয্য অসন্তোষ রবীন্দ্রনাথকে ক্ষুব্ধ করেছিল। তাই সেদিন তিনি লিখেছিলেন- 'ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুইন' (দুরন্তআশা, মানসী) চারিদিকে সানাই আর কলরব-এই কোলাহল থেকে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে সরিয়ে রেখেছিলেন।

পত্রিকা প্রকাশ

জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ দুখানি পত্রিকার প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। এই পত্রিকা দুখানি 'ভারতী' এবং 'বালক'। এই পত্রিকাতেই তাঁর কিছু বাল্য রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। পত্রিকা দুখানির আলোচনা প্রসঙ্গে সাহিত্য বিষয়ক তথ্য ছাড়াও কিছু কৌতুককর ঘটনার উল্লেখ করেছেন তিনি।

ভারতী

'ভারতী' প্রসঙ্গে প্রথমেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন- "মোটের উপর এই সময়টা আমার পক্ষে একটা উন্মত্ততার সময় ছিল।" উল্লেখ্য, ১৮৭৭ (১২৮৪ শ্রাবণ) জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বড়দাদাকে সম্পাদক করে ভারতী পত্রিকাখানি প্রকাশ করেন। প্রবীণ পৃথিবীতেও যেমন মাঝে মাঝে ভূমিকম্প অগ্নি-উচ্ছাসের মতো ঘটনায় চাপল্যের লক্ষণ দেখা দেয়, ঠিক তেমনি তরুণ বয়েসে উচ্ছ্বাস ও আবেগ প্রবল আকার ধারণ করেছিল।

এই মানসিক উত্তেজনার দিনেই 'ভারতী' পত্রিকার প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথ 'ভারতী' সম্পাদক চক্রের মধ্যে ছিলেন। এর আগেই তিনি মেঘনাদ বধের উপর একটি বিরূপ সমালোচনা লিখেছিলেন। পরবর্তীকালে এই রচনাটি সম্পর্কে লেখকের যথেষ্ট অপ্রসন্নতা ছিল। তাই তিনি মন্তব্য করেছেন – "কাঁচা আমের রসটা অম্লরস – কাঁচা সমালোচনারও

গালিগালাজ..... এই দাম্ভিক সমালোচনাটা দিয়া আমি ভারতীতে প্রথম লেখা আরম্ভ করিলাম।” এরপর ‘কবি কাহিনী’ (ভারতী ১২৮৪, পৌষ-চৈত্র)। এই কাব্যখানিতে লেখকের নিজের অপরিস্ফুটতার ছায়ামূর্তিটা বড়ো হয়ে উঠেছে। সেইজন্য এই কাব্যের নায়ক কবি। সে কবি কেবল লেখকের সত্তাই নয়-লেখক নিজেকে যা মনে করতে এবং ঘোষণা করতে ইচ্ছা করে তারই প্রতিচ্ছবি। রচনাটি যে কবির অপরিণত মনের সৃষ্টি সে কথা স্বীকার করতেও দ্বিধা করেননি রবীন্দ্রনাথ। তিনি বলেছেন, ইহার মধ্যে বিশ্বপ্রেমের ঘটা খুব আছে-তরুণ কবির পক্ষে এইটি বড়ো উপাদেয়, কারণ ইহা শুনিতে খুব বড়ো এবং বলিতে খুব সহজ। নিজের মনের মধ্যে সত্য যখন জাগ্রত হয় নাই পরের মুখের কথাই যখন প্রধান সম্বল, তখন রচনার মধ্যে সরলতা ও সংযম রক্ষা করা সম্ভব নহে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বাল্য রচনাগুলি সম্পর্কে যথেষ্ট অপ্রসন্নতা প্রকাশ করেছেন।

বালক

‘ভারতী’ ছাড়াও আর একখনি মাসিক পত্রের প্রসঙ্গ জীবনস্মৃতিতে উল্লিখিত হয়েছে। এই মাসিক পত্রিকাখানির নাম ‘বালক’। ‘বালক’ প্রকাশের প্রসঙ্গে কিছু কৌতুককর ঘটনার উল্লেখ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। অবশ্য সৃষ্টির ইতিবৃত্তে কিছু মূল্যবান তথ্যও আলোচিত হয়েছে।

‘ছবি ও গান’ এবং ‘কড়ি ও কোমলে’র মধ্যবর্তী পর্বে ‘বালক’ মাসিক পত্রিকা খানি প্রকাশিত হয়েছিল [প্রকাশ ১২৯২ বৈশাখ। সম্পাদিকা জ্ঞানদানন্দিনী দেবী] এক বৎসর চলার পর পত্রিকাখানির অকাল মৃত্যু ঘটে।

সেজবউঠাকুরাণীর ইচ্ছাতেই এই পত্রিকাখানির প্রকাশ। পত্রিকাখানির প্রধান লেখক ছিলেন সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর [দ্বিজেন্দ্রনাথের চতুর্থ পুত্র] এবং বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর [দেবেন্দ্রনাথের চতুর্থ পুত্র বীরেন্দ্রনাথের পুত্র] কিন্তু এই দুজনের লেখায় পত্রিকা চাহিদা পুরণ হয় না। তাই রবীন্দ্রনাথকেও লেখনী ধারণ করতে হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে ‘স্বপ্নে পাওয়া’ একটি গল্পের কথা বলেছেন রবীন্দ্রনাথ ।

রবীন্দ্রনাথ দেওঘরে গিয়েছিলেন রাজনারায়ণ বাবুকে দেখতে। রাত্রের গাড়িতে যথেষ্ট ভিড় থাকায় ঘুম আসছিল না তাঁর। সেই সময় স্বপ্নে দেখলেন কোনো এক মন্দিরের সিঁড়ির উপরে বলির রক্ত চিহ্ন দেখে একটি বালিকা ভয়ার্ত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করছে "বাবা একী ! এ যে রক্ত !" এই স্বপ্নে দেখা ঘটনাটির সঙ্গে ত্রিপুরার রাজা গোবিন্দমাণিক্যের পুরাবৃত্ত যুক্ত করে লিখলেন 'রাজর্ষি' । [বালক, ১২৯২ আষাঢ়-মাঘ, প্রথম ২৬ অধ্যায়। গ্রন্থ প্রকাশ ১২৯৩ (১৮৮৭)]

৬.৬। সংগীত চর্চার সূচনা

গীতচর্চা

রবীন্দ্রনাথের জীবনে জ্যোতিদাদার প্রভাব অসাধারণ। সাহিত্যের শিক্ষায় ভাবের চর্চার তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের প্রধান সহায়। তিনি নিজে যেমন উৎসাহী ছিলেন অন্যকে উৎসাহ দিতে তাঁর কোনো ক্লান্তি ছিলনা। এইটি ছিল তাঁর আনন্দ। তাঁর কাছে রবীন্দ্রনাথ বালক বলে কোনোদিন উপেক্ষিত হননি। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথকে বড় রকম স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। তার রবীন্দ্রনাথের ভিতরের সঙ্কোচটুকু দূর হয়ে গিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের জীবনে এই স্বাধীনতা বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। বাল্যকালে এই স্বাধীনতা না পেলে চিরজীবন একটা পঙ্গুতা থেকে যেত তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন- 'স্বাধীনতার অপব্যয় করিবার যদি অধিকার না থাকে তবে তাহাকে স্বাধীনতাই বলা যায় না।' তাই নানারকম শাসনের মধ্যে দিয়ে কোনো লাভই তাঁর হয়নি। বাল্যের এই শাসন নিপীড়ন তাঁর কাছে নিষ্ফল বেদনা ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

জ্যোতিদাদাই তাঁকে আত্মোপলব্ধির ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। আর তাই পরবর্তী জীবনে মন্দকে ভয় করেননি। আবার ভালো হবার উপদ্রবও তাঁর ছিলনা। দাসত্বের মতো বালাই আর কিছুই নাই।

জ্যোতিদাদা পিয়ানো বাজিয়ে নূতন নূতন সুর তৈরি করতে মেতে ছিলেন। তাঁর অঙ্গুলিনৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে সুরের বর্ষণ হত। রবীন্দ্রনাথ এবং অক্ষয়বাবু সেই সুরগুলিকে কথা দিয়ে বেঁধে রাখতে চেষ্টা করতেন। এই ভাবেই গান বাঁধবার শিক্ষানবিশি

রবীন্দ্রনাথের শিশুকাল থেকে গানচর্চার মধ্যের রবীন্দ্রনাথ বেড়ে উঠেছিলেন। আর তার ফলে অতি সহজেই গান তাঁর সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে প্রবেশ করেছিল। চেষ্টা করে গান আরও করবার, অভ্যাস না হওয়ায় সংগীত বিষয়ে তাঁর শিক্ষা পাকা হয়নি। আর সেইজন্য সংগীত বিদ্যা বলতে যা বোঝায় তার কোনো অধিকার তিনি লাভ করতে পারেননি।

বিলাতি সংগীত

বিলাতি সংগীত পরিচ্ছেদটিতে যুরোপীয় সংগীতের সঙ্গে ভারতীয় সংগীতের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। সেই সঙ্গে যুরোপীয় সংগীত সম্পর্কে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও মতামত উল্লিখিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ব্রাইটনে একজন বিখ্যাত গায়িকার গান শুনতে গিয়েছিলেন। গায়িকার নামটি সম্পর্কে কিছু সংশয় দেখা দিয়েছিল। তিনি দুটি নাম উল্লেখ করেছেন- মাডাম নীলসন অথবা মাডাম আলবানী। এই দুইজন মহিলার কণ্ঠস্বরে রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ হয়েছিলেন। প্রাসঙ্গিক ভাবেই তিনি এ দেশীয় সংগীতের সঙ্গে যুরোপীয় সংগীতের তুলনা করেছেন। আমাদের দেশের বড়ো বড়ো ওস্তাদ গায়কেরা গান গাইবার প্রয়াসটাকে ঢাকিতে গারে না। শ্রোতাদের মধ্যে যাঁরা রসজ্ঞ তাঁরা নিজের মনে নিজের বোধশক্তি দ্বারা গানটাকে খাড়া করে তোলেন। তাই তাঁরা সুকণ্ঠ গায়কের সুললিত গানের ভঙ্গিটিকে অবজ্ঞা করেন। এ যেন মহেশ্বরের বাহ্য দারিদ্রের মতো-তাহাতে তাঁহার ঐশ্বর্য নগ্ন হয়ে দেখা দেয়।

যুরোপে এ ভাবটি নেই। সেখানে বাইরের আয়োজন নিখুঁত হওয়া চাই। আমাদের আসরে আধঘন্টা ধরে তানপুরা আর তবলার হাতুড়ি পেটাকে আমরা কিছু মনে করিনা। কিন্তু যুরোপে যা কিছু প্রকাশিত হয় সবটাই সম্পূর্ণ। আমাদের দেশে যারা প্রকৃত শ্রোতা তারা গানটি শুনেই সন্তুষ্ট থাকে আর যুরোপে শ্রোতারা গান-গাওয়াটাতে শোনে।

ব্রাইটনে গায়িকাটির গান গাওয়াটাকে রবীন্দ্রনাথ সার্কাসের ঘোড়া ছোটানোর সঙ্গে তুলনা করেছেন। এই গানে কণ্ঠনলীর মধ্যে সুরের লীলা কোথাও বাধা পাচ্ছে না। বিস্ময় অনুভব করলেও, এই গানটি রবীন্দ্রনাথের ভালো লাগেনি। কারণ গানের মধ্যে মাঝে মাঝে পাখির ডাকের নকল ছিল। রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছে এ যেন “মনুষ্যকষণ্ঠের প্রকৃতিকে অতিক্রম

করে যাওয়া। এর পরে পুরুষ গায়কদের গান শুনে তিনি আরাম বোধ করেন। বিশেষ করে 'টেনর' গলা যাকে বলে সেটা নিতান্ত পথহারা ঝোড়ো হাওয়ার অশরীর বিলাস নয়, তার মধ্যে রক্ত-মাংসের পরিচয় পাওয়া যায়। ধীরে ধীরে রবীন্দ্রনাথ য়ুরোপীয় সংগীতের রস পেতে থাকেন। কিন্তু তাঁর প্রত্যয় এই যে য়ুরোপের গান এবং আমাদের গানের মহল যেন ভিন্ন, ঠিক এক দরজা দিয়া হৃদয়ে হৃদয়ের একই মহলে যেন তাহারা প্রবেশ করে না।" রবীন্দ্রনাথ বলেছেন- "আমাদের গান জীবনের প্রতিদিনের বেষ্টন অতিক্রম করিয়া যায়। সেই জন্যই তার মধ্যে এত করুণা এবং বৈরাগ্য। সে যেন বিশ্বপ্রকৃতি ও মানব হৃদয়ের একটি অন্তরতম ও অনির্বচনীয় রহস্যের রূপটিকে দেখিয়ে দেবার জন্য নিযুক্ত। সেই রহস্য লোক বড়ো নিভৃত নির্জন গভীর, সেখানে ভোগীর আরাম কুঞ্জ এবং ভক্তের তপোবন রচিত হয়ে আছে।"

য়ুরোগীয় সংগীতকে মর্মস্থানে পৌছেচেন এমন দাবি রবীন্দ্রনাথ করেন নি। কিন্তু য়ুরোপের গান যে তাঁকে যথেষ্ট আকর্ষণ করত এ কথা তিনি স্বীকার করেছেন। রবীন্দ্রনাথ য়ুরোপের সংগীতকে বলেছেন রোমান্টিক। রোমান্টিক বলতে কি বোঝায় সেটা স্পষ্ট করে বোঝানো যায় না। তাঁর কথায়- "রোমান্টিকের দিকটা অবিরাম গতি চাঞ্চল্যের উপর আলো ছায়ায় দ্বন্দ্ব সম্পাতের দিক; - আর একটা দিক বিস্তার যাহা আকাশ নীলিমার নির্নিমেষতা, যাহা সুদূর দিগন্ত রেখার অসীমতার নিস্তব্ধ আভাস।" য়ুরোপের গান রোমান্টিক একথা স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করেছেন রবীন্দ্রনাথ। কারণ মানবজীবনের বিচিত্রতাকে গানের সুরে অনুবাদ করা হয়েছে। আমাদের গানে সে চেষ্টা একেবারে নেই তা নয়-তবে সে চেষ্টা প্রবল ও সফল হয়ে দেখা দেয়নি।

৬.৭। স্বাদেশিকতা প্রসঙ্গ

স্বাদেশিকতা

ঠাকুর পরিবারে বিদেশী প্রথার যথেষ্ট চল ছিল। কিন্তু পরিবারের সকলের মনে স্বদেশাভিমান সদা জাগ্রত ছিল। স্বদেশের প্রতি রবীন্দ্রনাথের পিতা দেবেন্দ্রনাথের আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল। সেই শ্রদ্ধার ভাবটি সকলের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল।

ঠাকুর পরিবারের সহারতায় হিন্দুমেলা নামে একটি মেলার সূচনা হরেছিল [বাংলা ১২৭৩ চৈত্র সংক্রান্তি চৈত্রমেলা নামে প্রথম অনুষ্ঠিত হয়। সম্পাদক- গণেন্দ্রঠাকুর, সহকারী সম্পাদক নবগোপাল মিত্র] স্বদেশপ্রেমের সূচনা এখান থেকেই। রবীন্দ্রনাথের মেজদাদা বিখ্যাত জাতীয় সংগীত 'মিলে সবে ভারত সন্তান' রচনা করেছিলেন [জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের, পুরুষ বিক্রম নাটকের (১৮৭৪) প্রথম অঙ্কে সম্পূর্ণ গানটি যুক্ত করা হয়] এই মেলায় দেশের স্তবগান, দেশানুরাগের কবিতা, দেশি শিল্প ব্যায়াম প্রভিতি প্রদর্শিত হত।

রবীন্দ্রনাথ লর্ড কার্জনের সময়ের দিল্লির দরবার সম্বন্ধে একটি গদ্য-প্রবন্ধ লিখেছিলেন (অত্যুক্তি)। লর্ড লিটনের সময় লিখেছিলেন পদ্যে [১৮৭৭ লিখিত। দ্র. জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্বপ্নময়ী নাটক হিন্দুমেলায় প্রথম কবিতা পাঠ 'হিন্দুমেলা'র উপহার ১৮৭৫। বলাবাহুল্য এই রচনা নিতান্তই বয়সোচিত উত্তেজনা। ফলে পুলিশ কর্তৃপক্ষ বিন্দুমাত্র বিচলিত হয়নি। কারণ ইংরেজ সরকার রুসিয়াকেই ভয় করত, চোদ্দ-পনেরো বছরের বালকের লেখনীকে ভয় করত না। হিন্দুমেলায় গাছের তলায় রবীন্দ্রনাথ যখন কবিতাটি পড়েছিল তখন কবি নবীন সেন সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

অর্বাচীন হলেও রবীন্দ্রনাথ এই সভার সভ্য ছিল। এই কর্মকাণ্ডে লজ্জা ভয় কিছুই ছিল না, এ যেন খ্যাপামির তপ্ত হওয়ায় উড়ে চলা গবর্মেন্টের সন্দিগ্ধতা যদি ভীষণ হয়ে উঠত তবে এই সভার বালকদের বীরত্বের যে প্রহসন অভিনয় করেছিল তা কঠোর ট্র্যাজিডিতে পরিণত হতে পারত। অতীত দিনের এই স্মৃতি আজ রবীন্দ্রনাথের কাছে হাস্যকর বলে মনে হয়।

ভারতবর্ষের সর্বজনীন পরিচ্ছেদ কি হতে পারে এ নিয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নানা নমুনা আরম্ভ করলেন। ধুতিটা কর্মক্ষেত্রের উপযোগী নয় আবার পায়জামাটাও বিজাতীয়। এই দুটিকে মিলিয়ে তিনি "পায়জামার উপর একখণ্ড কাপড় পাট করিয়া একটা কৃত্রিম মালকোঁচা জুড়িয়া দিলেন।" সোলার টুপির সঙ্গে পাগড়ির মিশালে এক অদ্ভুত পদার্থ তৈরি হল। জ্যোতিদাদা অম্লানবদনে এই কাপড় পরিয়া মধ্যাহের প্রখর আলোকে গাড়িতে উঠিতেন। রবিবারে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ শিকার করতে বেরতেন। বহু লোকও এসে জুটত। এই শিকারে রক্তপাতটাই নগণ্য ছিল। আর সেইজন্য হত-আহত পশুপক্ষীর অভাব

কিছুমাত্র অনুভূত হত না। বউঠাকুরাণীর রাশীকৃত লুচি তরকারি সঙ্গে থাকায় কাউকে উপবাস করত হয়নি।

ব্রজবাবু এই অহিংসক শিকারিদের প্রধান উৎসাহ দাতা ছিলেন। তিনি মেট্রোপলিটন কলেজের সুপারিন্টেন্ডেট এবং কিছুকাল রবীন্দ্রনাথের শিক্ষক ছিলেন। লুচির অন্তে ডাবের জল-পানীয়ের অভাব হয়নি। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের শিকারি দলে একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু জমিদার ছিলেন। গঙ্গার ধারে তাঁর একটা বাগান ছিল। সেখানে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিচারে আহার চলত। অপরাহ্নে বিষম ঝড়। সেখানেই গঙ্গার ধারে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে গান শুরু করলেন রবীন্দ্রনাথ। ('আজি উন্মাদ পবনে' বলিয়া 'রবীন্দ্রনাথের গান'-জ্যোতিস্মৃতি) রাজনারায়ণবাবু কণ্ঠে সাতটা সুর বিশুদ্ধ ভাবে খেলত তা নয়-কিন্তু তাঁর তুমুল হাতছাড়া ক্ষীণ-কণ্ঠকে ছাড়িয়ে যেত।

আর একটি উদ্দেশ্য ছিল সভার- স্বদেশী দেশলাই কারখানা স্থাপন করা। সভ্যরা তাঁদের আয়ের দশমাংশ এই সভার জন্য দান করতেন। দেশলাই তৈরিতে কাঠি পাওয়া সমস্যা। যাই হোক, অনেক পরীক্ষার পর বাক্স কয়েক দেশলাই তৈরি হল। এক বাক্সে যে খরচ ছিল তাতে একটা পল্লীর সম্বৎসরে চুলা ধরানো চলত। দেশলাই-এর ব্যাপারে একটু অসুবিধা হয়েছিল- "নিকট অগ্নি শিখা না থাকিলে তাহাদিগকে জ্বালিয়ে তোলা সহজ ছিল না।"

খবর পাওয়া গেল অল্পবয়স্ক ছাত্র কাপড়ের কল তৈরি করতে চায়। কাপড়ের কল সম্পর্কে কারও কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না। এ যন্ত্র তৈরি করতে কিছু দেনা হয়েছিল। সেটা শোধ করা হল। অবশেষে একদিন ব্রজবাবু মাথায় একখানা গামছা বেঁধে জোড়াসাঁকোয় উপস্থিত। বললেন, "আমাদের কলে এই গামছার টুকরা তৈরি হইয়াছে। বলে দুই হাত তুলে তান্ডব নৃত্য।

'স্বাদেশিকতা' প্রসঙ্গে রাজনারায়ণবাবু সম্পর্কে সশ্রদ্ধ পরিচয় দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ ছেলেবেলা থেকেই রাজনারায়ণ বসুর সঙ্গে পরিচয় রবীন্দ্রনাথের। কিন্তু এ বয়সে এই অসাধারণ ব্যক্তিত্বের মানুষটিকে সম্পূর্ণ বুঝতে পারেননি তিনি। তার চরিত্রে যথেষ্ট বৈপরীত্য ছিল। যদিও তিনি বয়েসে প্রধান ছিলেন (চুল দাড়ি প্রায় সম্পূর্ণ পাকিয়াছে।)

তথাপি সকলের চেয়ে ছোটো যে ব্যক্তিত্ব তাঁর সঙ্গেও তাঁর আন্তরিকতায় বাধা হয়নি। প্রচুর পাণ্ডিত্য থাকলেও তিনি ছিলেন সহজ মানুষ। দুঃখ, কষ্ট, অস্বাস্থ্য, বয়সের গাম্ভীর্য কোনোটিই তাঁর হাসির বেগকে ঠেকিয়ে রাখতে পারেনি। তিনি তাঁর জীবনটিকে ঈশ্বরের নিকট নিবেদন করে দিয়েছিলেন। তিনি রিচার্ডসনের প্রিয় ছাত্র ছিলেন। ইংরেজি শিক্ষাতেই তিনি বাল্যকাল থেকে মানুষ। কিন্তু সমস্ত অনভ্যাসের বাধা ঠেলে উৎসাহ এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে প্রবেশ করেছিলেন। দেশের প্রতি তাঁর অনুরাগ তেজদীপ্ত। দেশের সমস্ত খর্বতা, দীনতা, অপমানকে তিনি দগ্ধ করে ফেলতে চাইতেন। তাঁর দীপ্ত চোখ দুটি আর হৃদয়ের উচ্ছ্বাস নিয়ে সকলের সঙ্গে তিনি গাইতেন-

'এক সুত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন।'

তিনি ছিলেন ভগবদ্ভক্ত চিরবালক তাঁর তেজঃপ্রদীপ্ত হাস্যমধুর জীবন রোগে শোকে অপরিম্লান। আমাদের স্মৃতিভান্ডারে তাঁকে সমাদরে রক্ষা করার দায়িত্ব দেশবাসীর।

৬.৮। অনুশীলনী

১। রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি অবলম্বনে তাঁর শিক্ষা জীবনের পরিচয় দিন।

২। জীবনস্মৃতি অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথের বাল্য জীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার পরিচয় দিন।

৩। পিতার সান্নিধ্য এবং তার ফলে বাহির যাত্রা প্রসঙ্গ- রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি অবলম্বনে আলোচনা করুন।

৪। রবীন্দ্রনাথের কাব্য চর্চার সূচনা পর্বের ইতিহাস জীবনস্মৃতি অবলম্বনে আলোচনা করুন।

৫। রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন গ্রন্থ প্রকাশ সম্পর্কে জীবনস্মৃতি গ্রন্থে যে পরিচয় পাওয়া যায় আলোচনা করুন।

৬। রবীন্দ্রনাথের সংগীত চর্চার সূচনা কিভাবে হয়েছিল তার পরিচয় জীবনস্মৃতি গ্রন্থে কিভাবে ফুটে উঠেছে তার বর্ণনা দিন।

৭। রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি গ্রন্থে তাঁর স্বাদেশিকতার কি পরিচয় ফুটে উঠেছে তা আলোচনা করুন।

৬.৯। গ্রন্থপঞ্জি

১। রবীন্দ্রবিচিত্রা - প্রমথনাথ বিশী।

২। আত্মজীবনী : জীবনী ও রবীন্দ্রনাথ - শিশির কুমার দাশ।

৩। আমার রবীন্দ্রনাথ - পূর্ণেন্দু পত্রী।

৪। স্মৃতির ছবি জীবনস্মৃতি - স্মরণ আচার্য।

একক:৭। জীবনস্মৃতি : অভিনব ভাবনায় জীবনকথা

বিন্যাসক্রম

৭.১। জীবনস্মৃতি : ভাবনার অভিনবত্ব

৭.২। ভাষার কারুকার্যতা

৭.৩। শৈলী ভাবনায় অভিনব

৭.৪। অনুশীলনী

৭.৫। গ্রন্থপঞ্জি

৭.১। জীবনস্মৃতি : ভাবনার অভিনবত্ব

আত্মজীবনী লেখার ব্যাপারে চিরদিন অনীহা ছিল রবীন্দ্রনাথের। তাঁর বিশ্বাস ছিল কবির জীবনী ঘটনা নির্ভর বা ইতিহাস নির্ভর হওয়া উচিত নয়। এই তথ্য নির্ভরতা কবি জীবনীতে নিতান্তই অনাবশ্যক ১৯০৪ সালে হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ প্রথম আত্মজীবনী লেখেন। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর এই লেখাটি 'আত্মপরিচয়' প্রবন্ধ সংকলনে মুদ্রিত হয়েছিল। কবি বয়স তখন ৪৩ বছর এই লেখায় তিনি বলেছিলেন: "আমার জীবনবৃত্তান্ত হইতে বৃত্তান্তটা বাদ দিলাম।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন- "আমার জীবনের ঘটনা বিশেষ কিছুই নাই এবং আমার জীবন চরিত্র লিপিবদ্ধ করিবার যোগ্য নহে।"

শুধু চিঠিপত্রে কিংবা পদ্য রচনাতেই নয় কাব্যেও ধ্বনিত হয়েছে তার আত্মকথা বিশেষ চিন্তাটি। কবি বলেছেন-

বাহির হইতে দেখো না এমন করে

আমায় দেখো না বাহিরে

আমায় দেখিতে পাবে না আমার মুখে

কবিরে খুঁজিছ যেথায় সেথা সে নাহিরে।

কবিরে পাবে না তাহার জীবন চরিতে।

এখন প্রশ্ন এই যে আত্মজীবনী লেখায় রবীন্দ্রনাথের এই অনিচ্ছা বা বিমুধীতার কারণ কি? প্রসঙ্গত বলা যায় আত্মজীবনী লেখার ধারাবাহিকতা উনবিংশ শতক থেকে গড়ে উঠেছে। ঊনিশ শতকের অনেক মনীষী তাঁদের আত্মজীবনী লিখেছেন। এমনকি রবীন্দ্রনাথের পিতা দেবেন্দ্রনাথও আত্মজীবনী লিখেছেন [মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী- ১৮৩৫--১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের একটি তথ্য সমৃদ্ধ দলিল] এগুলি জানা সত্বেও রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘদিন আত্মজীবনী লেখার ব্যাপারে উৎসাহিত হননি।

এই ধারাবাহিকতা বিচ্ছিন চিন্তার কারণ। সম্ভবত ঊনিশ শতকে যাঁরা আত্মজীবনী লিখেছেন কেউ যথার্থ অর্থে কবি ছিলেন না। কবি নবীনচন্দ্র সেন লিখেছিলেন 'আমার জীবন'। কিন্তু নবীনচন্দ্র ছিলেন তন্ময়ধর্মী কাব্যধারার কবি। তাই বৃত্তান্ত সর্বত্র আত্মজীবনী লিখতে রবীন্দ্রনাথ কোনো দিনই উৎসাহিত হননি।

রবীন্দ্রনাথ কবি-জীবনীকে সাধারণ মানুষ এমনকি যাঁরা সমাজে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিত্ব, তাঁদের জীবন কথা থেকে স্বতন্ত্র করে দেখতে চান। বিশেষ করে কর্মবীর এবং কবিদের জীবন গঠন ও মানসিকতার মধ্যে কী বিপুল পার্থক্য। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন জীবনচরিত রচনার ক্ষেত্রে দুটি পৃথক পদ্ধতি অনুসরণ করা উচিত। কিংবা যাঁরা মহাপুরুবরা জ্ঞান ও সাধনার মধ্য দিয়ে যাঁরা সর্বজন মান্য তাঁদের জীবনকথায় মানুষের প্রয়োজন আছে। কিন্তু কবিদের ভাব জগতের অনুভব লোকের প্রকৃত পরিচয় সাধারণকে জানানো সম্ভব নয়। কারণ ওই বৃত্তন্তে সাধারণের প্রয়োজন নেই। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন-- "টেনিসনের কথা পড়িয়া তাহাকে তাহা অপেক্ষা অনেক ছোটো করিয়া জানিয়াছি মাত্র।"

রবীন্দ্রনাথ যখন জীবনস্মৃতি লেখেন তখন তাঁর সম্মুখে আত্মজীবনী রচনার একটি অতি পরিচিত এবং সর্বজন অনুসৃত পদ্ধতি ছিল। এই পদ্ধতিটি মূল কথা জীবনের নানা ঘটনার

কালক্রমিক এবং যথাযথ বর্ণনা। প্রসঙ্গতঃ দেশ-কালের পটভূমিও এই সবক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এই জাতীয় রচনায়ও কেবল ব্যক্তির জীবন নয়, সেই মানুষটিকে কেন্দ্র করে তথ্যগুলিকেও কাজে লাগানো হয়। এক্ষেত্রে সমসাময়িক দলিল দস্তাভেজ বিভিন্ন জনের সাক্ষ্য এবং মন্তব্য কাজে লাগানো হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে চিঠিপত্র ডায়েরি প্রভৃতিও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়।

আশ্চর্যের বিষয় রবীন্দ্রনাথ এই পরিচিত রচনারীতি গ্রহণ করেননি। তিনি স্পষ্টই বলেছেন- "কেবল কাব্যের মধ্য দিয়া আমার কাছে আজ আমার জীবনটা যেভাবে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাই যথেষ্ট। সংক্ষেপে লিখিবার চেষ্টা করিব।" (বঙ্গভাষার লেখক)

সৃষ্টির জগতে কোনোদিনই চেনাপথের পথিক ছিলেন না। পূর্বসুরিদের তাঁর কল্পনা গঠন-রীতির চেনা লক্ষণরেখাটি পার হতে তাঁর সময় লাগেনি। কাব্যে নাটকে, উপন্যাসে ছোটোগল্পে কোনো চেনা মডেলের প্রতি দায়বদ্ধতা তাঁর ছিলনা। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি একান্তই রারীন্দ্রিক। জীবনস্মৃতির ক্ষেত্রে এটি একান্ত ভাবেই সত্য।

রবীন্দ্রনাথের আত্মজীবনী মূলক রচনা তিনটি- আত্মপরিচয়, জীবনস্মৃতি এবং ছেলেবেলা। ১৯০৪ সালে হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের অনুরোধ কবি একটি আত্মজীবনী লেখেন। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর এই লেখাটি 'আত্মপরিচয়' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ছেলেবেলা অনেক পরের রচনা।

পদ্মিনী নিয়োগী রবীন্দ্রনাথকে তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখতে অনুরোধ করেন। তাঁর অনুরোধে লেখা জীবনস্মৃতি ১৩১৮ সালের ভাদ্র মাস থেকে প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়। কালানুক্রমিকতার কথা ছেড়ে দিলেও এই তিনখানি জীবন কথা রচনার বিষয়বস্তু । বক্তব্য বিন্যাস এবং উপস্থাপনার মধ্যে মেরু পরিমাণ পার্থক্য রয়েছে।

'আত্মপরিচয়' প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন- "কেবল কাব্যের মধ্য দিয়ে আমারই কাছে আজ আমার জীবনটা যেভাবে প্রকাশ পাইয়াছে তাহাই সংক্ষেপে লিখিবার চেষ্টা করিব।"

তাই 'আত্মপরিচয়' কবি রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সাধনার নিগূঢ় উপলব্ধির ভাবা। তাই 'আত্মপরিচয়'কে রবীন্দ্রনাথের কাব্যগত জীবনচরিত বললেও ভুল হয়না। এটি জীবনী

নয় আত্মজীবনী। এখানে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট করেই বলেছেন- "কেবল কাব্যের মধ্য দিয়া আমার কাছে আজ জীবনটা যেভাবে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাই যথেষ্ট সংক্ষেপে লিখিবার চেষ্টা করিব।" প্রসঙ্গত জীবন-দেবতাকেই তাঁর জীবনের চালিকা শক্তি বলে উল্লেখ করেছেন। ["এই যে কবি, যিনি আমার সমস্ত ভালোমন্দ, আমার সমস্ত অনুকূল ও প্রতিকূল উপকরণ লইয়া আমার জীবনকে রচনা করিয়া চলিয়াছেন, তাহাকেই আমার কাব্যে জীবন দেবতা নাম দিয়াছি।"]

আত্মপরিচয় প্রকাশের পর কিছু বিরূপ সমালোচনাও হয়েছিল দ্বিজেন্দ্রলাল তাই রচনায় লেখকের অহমিকার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছিলেন। তাঁর অভিযোগ রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যসৃষ্টি সম্পর্কে অপৌরুষেয়তা দাবি করেছেন।

'আত্মপরিচয়' লেখার কয়েক বছর পর লেখা হয় 'জীবনস্মৃতি'। 'জীবনস্মৃতি' রচনার সময় হয়তো দ্বিজেন্দ্রলালের সমালোচনার কথা তাঁর মনে ছিল। তাই সম্পূর্ণ নতুন নীতিতে খণ্ড খণ্ড অভিজ্ঞতা এক সূত্রে গেঁথে একটি অভিনব আত্মজীবনীর মডেল তৈরি করলেন তিনি। জীবনস্মৃতিতে ঘটনার ধারাবাহিকতা নেই। ঘটনার পারম্পর্যও রক্ষিত হয়নি। জীবনস্মৃতিতে আছে রবীন্দ্রজীবনের প্রথম পঁচিশ বছরের কথা, অর্থাৎ ১৮৮৬ তে 'কড়ি ও কোমলের' প্রকাশকাল পর্যন্ত।

জীবনস্মৃতির মুখবন্ধে এই রচনাটির মর্মকথা লেখকের কথায় – "স্মৃতির পটে জীবনের ছবি কে আঁকিয়া যায় জানি না। কিন্তু যেই আঁকুক সে ছবিই তাঁকে অর্থাৎ যাহা কিছু ঘটিতেছে তাহার অবিকল নকল রাখিবার জন্য সে তুলি হাতে বসিয়া নাই। সে আপনার অভিরুচি অনুসারে কত কী বাদ দেয় কত কী রাখে।"

জীবনস্মৃতির রচনা শৈলীর প্রধান বৈশিষ্ট্য চিত্ররূপ। একদিন পর একটি ছবির মালা সাজিয়েছেন জীবনস্মৃতিতে। সেখানে স্থানকালের সীমাবদ্ধতায় বাঁধা পড়ে না কল্পনা। সচেতন ভাবেই কালগত অনির্দিষ্টতা বজায় রেখেছেন রবীন্দ্রনাথ। যেমন বললেন- "ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে যখন পড়িতেছিলাম... তখন নর্মাল স্কুলের একটি শিক্ষক ...... আমাদের পড়াইতেন......।" নিদিষ্টতা এড়িয়ে যাবার আশ্চর্য প্রয়াস লক্ষ্য করবার মতো।

৭.২। ভাষার কারুকার্যতা

জীবন স্মৃতি বাংলা সাহিত্যে বোধকরি সবচেয়ে সুখপাঠ্য গ্রন্থ। রবীন্দ্রনাথের মধ্য বয়সে লিখিত এই বইখানি রবীন্দ্র-সাহিত্যের মধ্য-মণির মতো দুলিতেছে। মন্তব্যটি করেছেন বিখ্যাত রবীন্দ্র-সমালোচক প্রমথনাথ বিশী।

এখন প্রশ্ন এই যে জীবনস্মৃতির- এই সুখপাঠ্যতার কারণ কি? কেবল বিষয়বস্তর গুরুত্বের উপরেই কোনো গ্রন্থের সুখপাঠ্যতা নির্ভর করে না বিষয় বস্তু উপস্থাপনার শিল্পসৌন্দর্য ও ভাষার চাতুর্যই গ্রন্থকে সুখপাঠ্য করে তোলে। এ রাতে ভায়ার কারুকার্য এবং শৈলীর শিল্পকৌশল গ্রন্থের স্বাদুতাকে বহুল অংসে বাড়িয়ে দেয়। তাই প্রথমেই জীবনস্মৃতির ভাষার আশ্চর্য সম্মোহন সম্পর্কে কিছু আলোচনা প্রাসঙ্গিক।

কৈশোরে কাব্যচর্চার পাশে পাশে গদ্য চর্চার ও কিছু পরিচয় জীবনস্মৃতিতে আছে। তিনি লিখেছেন- “আমি তখন ভুবন মোহিনী প্রতিভা দুঃখনন্দিনী ও অবসর সরজিনী বই তিনখানি অবলম্বন করিয়া জ্ঞানাঙ্গুরে এক সমালোচনা লিখিলাম। রচনাটির প্রকাশকাল ১২৮৩।” রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ২৬ বৎসর। এরপর লিখলেন- ‘মেঘনাদ বধে’র সমালোচনা (ভারতী ১২৮৪) লেখকের বক্তব্য- “আমি অল্প বয়সের স্পর্ধার বেগে মেঘনাদ বধের একটি তীব্র সমালোচনা লিখিয়াছিলাম।”

বাল্যকালে গুরুজনেরা রবীন্দ্রনাথকে সংস্কৃত ভাষার প্রথম পাঠ দিয়েছিলেন। পিতার আগ্রহে এবং চেষ্টায় তার সংস্কৃতচর্চা যথেষ্টই অগ্রসর হয়েছিল— “পিতা আমাকে একেবারেই ঋজুপাঠ দ্বিতীয়ভাগ পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। এবং তাহার সঙ্গে উপক্রমণিকার শব্দরূপ মুখস্থ করিতে দিলেন।” অন্যদিকে বাংলা সাহিত্যও সেদিন যথেষ্ট পরিপক্কতা লাভ করেনি। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন- “আমার বাল্যকালে বাংলা সাহিত্যের কলেবর কৃশ ছিল। বোধকরি তখন পাঠ্য অপাঠ্য বাংলা বই যে-কটা ছিল সমস্তই আমি শেষ করিয়াছিলাম। কিন্তু, আমাদের বাড়ির দাদারা চিরকাল মাতৃভাষার চর্চা করিয়া আসিয়াছেন। আমার পিতাকে তাহার কোনো নূতন আত্মীয় ইংরেজিতে পত্র লিখিয়াছিলেন, সে পত্রলেখকের নিকটে তখনই ফিরিয়া আসিয়াছিল।”

এই পটভূমিতে রবীন্দ্রনাথের বাংলা রচনার সুত্রপাত। তখনও বাংলা গদ্যের স্বাবলম্বিতা আসে নি। বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্য রীতিই ছিল সেদিন বাংলা গদ্যের আদর্শ। খুব স্বাভাবিক কারণেই সুচনা পর্বের উপন্যাস ও ছোটোগল্পে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিম প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেন নি।

এই সময়ে অর্থাৎ জীবনের মধ্যপর্বে রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি প্রধান গদ্য রচনা প্রকাশিত হয়েছে। এই সব রচনায় বঙ্কিমী ভাষার পদাঙ্ক অনুসরণের চেষ্টা সুস্পষ্ট। বঙ্কিমী ভাষা অনুসরণের প্রধান লক্ষণগুলি হল তৎসম এবং সমাসবহুল শব্দের প্রবণতা। সংলাপ বর্ণনা উভয় ক্ষেত্রেই সাধুক্রিয়া পদের প্রয়োগ ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথের ভাষা বিন্যাসের সাধু গদ্যরীতির একছত্র আধিপত্য । অলঙ্কারের প্রতি দুর্বলতা, দীর্ঘ বাক্য গঠন প্রভৃতি পূর্বসূরীর ধারাবাহিকতা।

এই পর্বে ভাষারীতির এক অভিনব এবং সার্থকতম পরীক্ষা 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' (১৮৮১)। ১৮৭৮ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর সতেরো বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ ইংলন্ড রওনা হন এবং ১৮৮০-র মার্চ মাসে ফিরে আসেন। বিদেশ বাসকালে সেখানকার অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখা পত্রাকারে 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' একটি ব্যতিক্রমী সৃষ্টি। এই ব্যতিক্রমের প্রধান লক্ষণ হল ভাষা। যদিও চলতি গদ্যরীতি তখনও জাতে ওঠেনি, তথাপি চলতি ভাষাতেই রবীন্দ্রনাথ লিখলেন এই পত্রসাহিত্য। এর প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন- "য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র শ্রেণী আগাগোড়া অরক্ষণীয়া নয়। এই স্বপক্ষে একটা কথা আছে সে হচ্ছে এর ভাষা। নিশ্চিত বলতে পারিনে কিন্তু আমার বিশ্বাস রাংলা সাহিত্যে চলতি ভাষায় লেখা বই এই প্রথম।... আমার বিশ্বাস বাংলা চলতি ভাষার সহজ প্রকাশ পটুতার প্রমাণ এই চিঠিগুলির মধ্যে আছে।"

শুধু ভাষার অভিনবত্ব নয়, চলমান দৈনন্দিন জীবনের খণ্ড চিত্রকল্প এই পত্রগুলিতে দেখা গেল। সেদিক থেকে 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র'কে জীবনস্মৃতির পূর্বাভাস বললেও ভুল হয় না।

কাব্য নাটক প্রভৃতির পাশে পাশে চলেছিল গদ্য চর্চা। দীর্ঘ যাট বছর অবিরাম ধারায় তাঁর গদ্যের বিচিত্র উপস্থাপনা। ধীরে ধীরে তিনি গড়ে তুলেছিলেন ভাষার একটি নিজস্ব ভঙ্গীমা। রামমোহন-বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে বাংলা গদ্যের ধারাটিকে পরিণতিমুখী করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সেই উত্তরাধিকারকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দিলেন। বাংলা গদ্যের বিচিত্র রূপ ও গঠন নিয়ে কী বিচিত্র পরীক্ষায় মেতেছিলেন তিনি। বলেছেন- "জানার কথাকে জানানো আর হৃদয়ের কথাকে বোধে জাগানো এছাড়া ভাষার আর একটা খুব বড়ো কাজ আছে। সে হচ্ছে কল্পনাতে রূপ দেওয়া। একদিকে এইটেই সবচেয়ে অদরকারি কাজ আবার একদিকে এইটেই সবচেয়ে মানুষের সবচেয়ে আনন্দ।"

তিনি আরও বলেছেন- "বাংলা ভাষাকে চিনতে হবে ভালো করে। কোথায় তার শক্তি, কোথায় তার দুর্বলতা, দুইই আমাদের জানা চাই।" কত গভীর ভাবে বাংলা ভাষার মর্মমূলে প্রবেশ করে তার স্বরূপ সন্ধান করেছেন রবীন্দ্রনাথ, উল্লিখিত আলোচনায় তাই সহজেই অনুমান করা যায়।

রবীন্দ্র-জীবনের মধ্যপর্বে তাঁর গদ্যরীতির আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটেছে। এই পরিবর্তনের সূচনা গোরা (১৯১০) থেকে। মুখের ভাষার সংলাপ গোরাতেই প্রথম ব্যবহার করেন রবীন্দ্রনাথ। প্রায় সমসাময়িককালে জীবনস্মৃতির ভাষায় অভূতপূর্ব উজ্জ্বলতা এবং স্বাদুতার প্রকাশ ঘটল। এই সময়ের গদ্যে, বিশেষ করে জীবনস্মৃতির গদ্য ঋজুতা ও দাঢ্যে অসাধারণ। গোরা এবং জীবনস্মৃতিতে গদ্যের স্বচ্ছন্দ গতি রবীন্দ্রনাথের গদ্যচর্চার ধারায় এক নূতন পথের দিশারি।

'গোরা' এবং 'জীবনস্মৃতি'র গদ্যে একটি সুনিয়ন্ত্রিত ভারসাম্য রক্ষিত হয়েছে। ঋজুতা এবং পারস্পরিক সমন্বয় এই গদ্যের মূল কাঠামো। জীবনস্মৃতির গদ্যে ভারসাম্যের অন্যতম কারণ হল তৎসম, তদ্ভব এবং দেশি শব্দের একটি সুষ্ঠ রাসায়নিক সংমিশ্রণ।

জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ গদ্যকে ইচ্ছামত ভেঙেছেন গড়েছেন। সমগ্র গ্রন্থখানিতে লেখকের কৌতুকোজ্জ্বল উপস্থিতি লক্ষ্য করার মতো। অনেক গভীর কথাকে স্বচ্ছন্দ ভাষায় প্রকাশ করলেন রবীন্দ্রনাথ। যেমন, "মনে জানিতাম সংসারের ধর্মই এই-বড়ো যে সে মারে, ছোটো যে সে মার খায়। ইহার বিপরীত কথাটা, অর্থাৎ ছোটো যে সেই মারে,

বড়ো যে সেই মার খায় শিখিতে বিস্তর বিলম্ব হইয়াছে।" ভাষার আশ্চর্য কারুকার্যে সেইসব চিত্রগুলি এক মাধুর্যময় মনোহারিত্বের বাতাবরণ রচনা করেছেন।

তারপর মধ্যবয়সে সবুজপত্রের পর্বে আবার চলতি গদ্যরীতিকেই বরণ করে নিয়েছেন তিনি। সাধুগদ্যের চেনামহলে আর তিনি ফিরে যান নি। তখন জীবনের শেষপ্রান্তে লেখা অসাধারণ ভাষণটিও 'সভ্যতার সংকট' লিখেছেন চলিত রীতিতেই। এবিষয়ে তাঁর সহজ সরল বক্তব্য- " 'সভ্যতার সংকট' ভাষার দিক থেকে ভালোই লিখেছি। যদিও অনেক কষ্ট করে, কিন্তু ভাষার ব্যবহারটি আমার আত্মসম্মান রক্ষা করেছে। ভাষা আমার betray করেনি।" [আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ - রানী চন্দ]

৭.৩। শৈলী ভাবনায় অভিনবত্ব

রবীন্দ্রনাথের মানস-পুত্র অমিত (শেষের কবিতা) তার স্বকীয় ভঙ্গিতে বলেছিল- 'ফ্যাশানটা হল মুখোশ আর স্টাইলটা হল মুখশ্রী। ওর মতে যারা সাহিত্যের ওমরাহ দলের, যারা নিজের মন রেখে চলে, স্টাইল তাদেরই। আর যারা আমলা-দলের, দশজনের মন রাখা যাদের ব্যাবসা, ফ্যাশান তাদেরই। বঙ্কিমী স্টাইল বঙ্কিমের লেখা বিষবৃক্ষে, বঙ্কিম তাতে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছেন বঙ্কিমী ফ্যাশান নসিরামের লেখা 'মনোমোহনের মোহনবাগানে'। নসিরাম তাতে বঙ্কিমকে দিয়েছে মাটি করে।

জীবনস্মৃতির শৈলী ভাবনা বা স্টাইল সম্পর্কে আলোচন করতে গিয়ে অমিতের কথাটাই বার বার মনে পড়ছে। যারা নিজের মন রেখে চলে, স্টাইল তাদেরই জীবনস্মৃতির মডেল সম্পর্কে আলোচনায় এই সংজ্ঞাটাই সত্য হয়ে উঠছে।

আত্মকথা বা আত্মচরিত রচনার একটি চির পুরাতন মভেন আছে। সেখানে লেখক তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের নানা ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে থাকেন। প্রসঙ্গতঃ আসে বংশ পরিচয়, আত্মীয় পরিজনদের কথা। অনেক আত্মচরিতেই দেশকালের পটভূমি বিশেষ গুরুত্ব পায়। অনেক ক্ষেত্রের সামাজিক বা রাজনৈতিক ইতিহাস-সন্ধানীদের কাছে এইসব আত্মচরিত বিশেষ মূল্যবান হতে ওঠে। জীবন স্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ সেই চেনা পথে হাঁটেন নি। এখানে তিনি নিজেই একটি মডেল তৈরি করে নিয়েছিলেন। শুধু জীবনস্মৃতি নয়

তাঁর অপর দুটি আত্মকথা, আত্মপরিচয়, আর ছেলেবেলাতেও প্রচলিত ধারাকে অনুসরণ করেন নি।

জীবনস্মৃতির সূচনাতেই তিনি লিখেছেন- "........ মনে করিয়াছিলাম, জীবন বৃত্তান্তের দুই-চারিটা মোটামুটি উপকরণ সংগ্রহ করিয়া ক্ষান্ত হইব। কিন্তু দ্বার খুলিয়া দেখিতে পাইলাম, জীবনেরস্মৃতি জীবনের ইতিহাস নহে- তাহা কোনও এক অদৃশ্য চিত্রকরের সহস্তের রচনা।"

জীবনস্মৃতির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যটি এই কথাটিতেই ধরা পড়েছে। পরিচিত মডেলের ছক ভাষার খেলা রবীন্দ্রনাথের নতুন নয়। উপন্যাসে ঘরে বাইরেতে ছক ভাঙার খেলা শুরু। (যদিও বঙ্কিমচন্দ্রের রজনী উপন্যাসের আত্মকথনমূলক গঠনরীতির প্রাথমিক প্রচেষ্টা, কিন্তু চতুরঙ্গ? আগাগোড়া কাহিনিটাই সাজানো হল নতুন আঙ্গিকে)

সবুজপত্রের যুগে রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, গঠন শৈলীতে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছিল জীবনস্মৃতিতে তারই সূচনা। জীবনস্মৃতির নীতিদীর্ঘ অধ্যায়গুলি নিয়ে গাঁথা হয়েছে একটি বর্ণময় মালা। হালকা মেঘের ভেলার মতোই কাহিনি জুড়ে আছে একটি স্নিগ্ধ - অনুভব- আনন্দময় অভিব্যক্তি।

সচেতন ভাবেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর অতীত প্রসঙ্গে সাল তারিখের অনাবশ্যক বেড়াজাল এড়িয়ে গিয়েছেন। এমনকি ঘটনার কালগত অনিশ্চয়তাও লক্ষ্য করবার বিষয়। এ এমন একটি জীবনকথা যেখানে 'আমি'র ঐতিহাসিক গুরুত্বটুকুকেও ও উপেক্ষা করা হয়েছে। তাই জীবনস্মৃতি রবীন্দ্রনাথ নামক ব্যতির নির্দিষ্ট কালের ইতিহাস নয়। অথচ বংশগত উত্তরাধিকারকে ভিত্তি করেই জীবনীকাররা কোনো প্রসিদ্ধ মানুষের জীবনী লিখে থাকেন।

অতীত দিনের বিস্মৃতিকে স্বীকার করতে তিনি দ্বিধাহীন। বলেছেন- "আমরা তিনটি বালক একসঙ্গে মানুষ হইতেছিলাম। আমরা সঙ্গী দুটি আমার চেরে দুই বছরের বড়ো। শিক্ষা সেই সময় শুরু হইল, কিন্তু সেকথা আমার মনে নাই।" জীবনস্মৃতিতে এমন অনেক ঘটনা আছে যার তথ্য উদ্ঘাটনের সূত্রটুকুও স্মৃতির অতলে। যেমন সে যুগের সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে আলাপের সূত্রপাত, তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিরোধের ঘটনা

অবশ্য ঐতিহাসিক। বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের বিরোধের কাঁটাটি বঙ্কিমচন্দ্রের ঔদার্যেই উৎপাটিত হয়েছিল। কিন্তু যে পত্রখানিতে বঙ্কিমচন্দ্র এই বিরোধের অবসান ঘটিয়ে ছিলেন, সেই মহামূল্যবান পত্রখানি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উদাসীনতা বিস্ময়কর লিখেছেন- "এই বিরোধের অবসানে তিনি একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। আমার দুর্ভাগ্য ক্রমে তাহা হারাইয়া গিয়েছে-যদি থাকিত তবে পাঠকেরা দেখিতে পাইতেন বঙ্কিমবাবু কেমন সম্পূর্ণ ক্ষমার সহিত এই বিরোধের কাঁটাটুকু উৎপাটন করিয়া ফেলিয়াছিলেন।"

জীবনস্মৃতির বিরাট অংশ জুড়ে আছে রোমান্টিক নস্টালজিয়া। অতীত দিলের সুখস্মৃতি। ঐতিহাসিকতা এখানেও একান্তই তুচ্ছ। জীবনস্মৃতি অতীব রোমন্থনের আনন্দময় অভিব্যক্তি। গবেষকের অনুসন্ধান এখানে পথ হারিয়ে ফেলে। যেমন- 'দিদিমা আমার মাতার কোনো এক সম্পর্কে খুড়ি, যে কৃত্তিবাসের রামায়ণ পড়িতেন। সেই মার্বেল কাগজ মন্ডিত কোণছেঁড়া মলাট-ওয়ালা মলিন বইখানি কোলে লইয়া মায়ের ঘরের দ্বারের কাছে পড়িতে বসিয়া গেলাম। সম্মুখে অন্তঃপুরের আঙিনা ঘেরিয়া চৌকোণ বারান্দা। সেই বারান্দায় মেঘাচ্ছন্ন আকাশ হইতে অপরাহ্নের ম্লান আলো আসিয়া পড়িয়াছে। রামায়ণের কোনো একটা করুণ বর্ণনায় আমার চোখ দিয়া জল পড়িতেছে দেখিয়া, দিদিমা জোর করিয়া আমার হাত হইতে বইটি কাড়িয়া লইয়া গেলেন।'

এ এক আশ্চর্য মোহময় অনুভবের ছবি। বর্ণনার ছত্রে ছত্রে ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ চিত্রকল্প। একটি বিষন্ন সন্ধ্যার পটভূমিতে বালক হৃদয়ের বেদনার ছায়াছবি। এখানে বাস্তবতার অনুসন্ধান বৃথা। ঘটনার সত্যাসত্য বিচারের সামান্যতম সুযোগ টুকুও নেই।

তবে ইতিহাসের কিছু কিছু উপকরণ ছড়িয়ে আছে স্মৃতির ভাণ্ডারে। রাজেন্দ্রলাল মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি ব্যক্তি পরিচয় ইতিহাসের ফ্রেমে বাঁধানো। তবু এইসব চরিত্রের পরিচয় স্মৃতি নির্ভর।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য জীবনস্মৃতির প্রথম খসড়ার সঙ্গে পরবতীকালের চূড়ান্ত রূপটিতে রবীন্দ্রনাথ বহু তথ্যভার বর্জন করেছেন। প্রথম খসড়ায় রাশিচক্র, জন্মকাল ইত্যাদি ছিল। স্বীকৃত সংস্করণে সেগুলি সম্পূর্ণ বাদ দিয়েছেন তিনি। তাঁর জীবনের আদি কবিতা বিষয়ে গবেষকদের কৌতুহল যথেষ্ট অথচ প্রথম খসড়ায় তাঁর স্থান হয়নি। কত মানুষ এসেছে

রবীন্দ্রনাথের জীবনে, ঘটেছে কত বিচিত্র ঘটনা, তারই খণ্ডাংশ উজ্জ্বল রূপরেখা এই 'জীবনস্মৃতি'। আরও অনেক কথাই না বলা বাণীর ঘন যামিনীতে হারিয়ে গিয়েছে।

৭.৪। অনুশীলনী

১। রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' রচনায় ভাবনার অভিনবত্বের পরিচয় দিন।

২। রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে কবি জীবনের নানা বিচিত্র রূপকথার যে বর্ণনা পাওয়া যায় তার পরিচয় দিন।

৩। রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থের বিষয়বস্তু সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৪। 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে ভাষার ব্যবহারে যে অভিনবত্ব ফুটে উঠেছে তা আলোচনা করুন।

৫। 'জীবনস্মৃতি'তে শৈলী ভাবনায় অভিনবত্বের পরিচয় পাওয়া যায় আলোচনা করুন।

৭.৫। গ্রন্থপঞ্জি

১। রবীন্দ্রবিচিত্রা - প্রমথনাথ বিশী।

২। আত্মজীবনী : জীবনী ও রবীন্দ্রনাথ - শিশির কুমার দাশ।

৩। আমার রবীন্দ্রনাথ - পূর্ণেন্দু পত্রী।

৪। স্মৃতির ছবি জীবনস্মৃতি - স্মরণ আচার্য।